দাদাঠাকুর রচনা সমগ্র

সম্পাদনা ঃ

জঙ্গীপুর-সংবাদগোষ্ঠী

ভূমিকা ঃ

ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশকের কথা

জীবৎকালেই দাদাঠাকুর কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। অননুকরণীয় স্বাতন্ত্র্য, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, অনমনীয় চরিত্র যেমন একদিকে মানুষ হিসাবে তাঁকে মহামানবের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল—অন্যদিকে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসাধারণ রসিকতাবোধ এবং শব্দের অদ্ভুত পরিহাস-মিশ্র খেলা সে যুগের প্রায় প্রত্যেক স্মরণীয় ব্যক্তিকে বিস্মিত করেছিল। জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবনী অবলম্বনে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল, যার অসাধারণ জনপ্রিয়তা অনেকেই বিস্মৃত হননি। এই চিত্রের মূল চরিত্রাভিনেতা সরকারী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। অথচ যাঁর অনন্য চরিত্র এই জনপ্রিয়তা ও সম্মান লাভের উৎস তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কোন সম্বর্ধনা ও স্বীকৃতি দান করা, তাঁর অমূল্য রচনাসম্ভার প্রকাশে উৎসাহী হওয়া অথবা তাঁর দৃঢ় চরিত্রের আদর্শ সাধারণের মনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে কোন সরকারী প্রচেষ্টা অদ্যাবধি দেখা যায়নি। এটি যুগপৎ ক্ষোভ ও বিস্ময়ের কারণ। এ ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত উদ্যোগও আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি।

এই অসাধারণ মনীষী এবং সাহিত্যব্রতীর কাছে বাঙালীমাত্রই যে মহৎ ঋণে আবদ্ধ সেই ঋণ কিঞ্চিৎ পরিশোধের তাগিদেই দাদাঠাকুরের রচনাসমগ্র অগণিত সাহিত্যরস পিপাসু পাঠকের হাতে তুলে দেবার কাজে ব্রতী হয়েছি। তাঁর সর্বপ্রকার রচনাই এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কারণ তাদের মাধ্যমে যে খাঁটি মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায় তার মূল্য আমাদের কাছে অনেক বেশী। যে নৈতিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কাজে অগ্রসর হয়েছি তাতে সাধারণ পাঠকের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি এবং পাবো বলেই আশা করছি। বাঙালী পাঠকের একটি বিশেষ অভাব আজ পূর্ণ করতে পেরেছি মনে করে আমি গর্বিত ও ধন্য।

"আমার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত। ১২৫ ঘর নিরক্ষর চাষী অব্রাহ্মণ ; আমাকে কেহ বাবাঠাকুর কেহ কাকাঠাকুর —অর্থাৎ যার যা সম্পর্ক মানায় তাই বলে ডাকতো, তবে 'দাদাঠাকুর' বলে ডাকার লোক সংখ্যা খুব বেশী—তাই আমাদের পল্লীতে দাদাঠাকুর বলতে আমাকেই বুঝায়। এমন কি কলকাতার মত শহরেও আমার এই নাম জারী হয়েছে।"

শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(২২শে মে ১৯৬৩)

এতে আছে ঃ

ভূমিকা

॥ ১ ॥

বাঙালী জাতি ক্রমশ হাসবার এবং হাসাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে একথা একটি কবিতায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন দাদাঠাকুর। হয়তো কিছু অনিবার্য কারণ আছে, তবু কথাটি যে কতদূর সত্য তা আজকের সমস্যাপীড়িত বাঙালী এবং সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সামান্য সচেতনতা থাকলেই বোঝা যায়। দাদাঠাকুরের সহাস্য মূর্তি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সাক্ষ্য দিলেও, তিনি অধিকাংশ বাঙালীর সংকীর্ণচেতা মনোভাব দেখে নিজে কতখানি হাসতে পেরেছেন সে সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে; কিন্তু আপামর সাধারণকে যে তিনি নির্ভেজাল হাস্যরসের স্রোতে অবগাহন করবার সুযোগ দিয়েছেন এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

দাদাঠাকুর ছিলেন বাঙালী জাতির বিদূষক এবং খাঁটি বাঙালী। ঈশ্বর গুপ্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে তাঁকে খাঁটি বাঙালী বলেছিলেন, ঠিক সেই অর্থেই দাদাঠাকুর খাঁটি বাঙালী। নিজে খাঁটি ছিলেন বলেই, ঈশ্বর গুপ্তের মতই, যে-কোন মেকি আচরণের প্রতি ছিল তাঁর বিদ্বেষ। কিন্তু সে বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ আঘাত হয়ে বাঙালীর চিত্ত বিক্ষত করেনি, ব্যঙ্গের মধুর আবরণে সকলেরই চিত্ত হরণ করেছে। আঘাত যা পাবার পেয়েছেন তিনি, যন্ত্রণা যা সহ্য করবার করেছেন তিনি—বিনিময়ে উপহার দিয়েছেন অসংগতির মজাটুকু। জীবন-সমুদ্র মন্থন করে নীলকণ্ঠ দাদাঠাকুর বিষের জ্বালায় জর্জর হয়েছিলেন, কিন্তু বাণী ও বাণীশিল্পে যা পরিবেষণ করেছেন তা অমৃত। অন্তরের গভীর বেদনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে দাদাঠাকুরের ব্যঙ্গ-সুনিপুণ বাক্-প্রতিমায়। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়-শিল্পী চার্লি চ্যাপলিনের মতই যেন তাঁর বক্তব্য ছিল—"The minute a thing is over-tragic, it is comic." যদি বাঙালী জাতির এই বিদূষক মানুষকে হাসাবার ক্ষমতা কয়েক মুহূর্তের জন্যও সংবরণ করে নিতেন, বোঝা যেত কি গভীর বিষণ্ণতা তাঁর অন্তরকে দগ্ধ করে চলেছে। জন পামার-এর ভাষাতে বলা চলে—"If this were not so terribly funny, it would be really tragic." সম্ভবত এই বিষণ্ণতা তিনি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন, মানুষের স্বার্থমগ্ন নীচতা এবং তা চাপা দেবার অপদার্থ প্রয়াসের হাস্যকরতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে। এক কথায়, মানব-আচরণের সেই মূল কৌতুকটি তিনি তাঁর চৈতন্যের গভীরে অনুভব করতে পেরেছিলেন, অধ্যাপক পেরি যাকে বলতে চেয়েছেন—"The supreme human paradox."

চিত্তে এবং চরিত্রে মানুষটি অসাধারণ হলেও, কবিতাকে যাঁরা একেবারেই পরম মূল্যে গ্রহণ করতে আগ্রহী, দাদাঠাকুরের সৃষ্টিসম্ভারকে তাঁরা সাধারণভাবে প্রথম শ্রেণীর মনে নাও করতে পারেন। তাঁর অধিকাংশ গদ্য এবং পদ্য রচনাই যে সাময়িক বা topical একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। স্ব-সম্পাদিত সংবাদপত্রের পুষ্টিসাধন করতে গিয়েই অনিবার্যভাবে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে সাংবাদিকতামূলক। তাঁর বেশীর ভাগ গদ্যরচনাই হয়

বিশুদ্ধ সংবাদ, অথবা তাঁর তির্যক মন্তব্যে সরস সংবাদ-সাহিত্য—এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি যে অম্লমধুর কাহিনীগুলি পরিবেষণ করেছেন তা তাঁর মৌলিক রচনা না হলেও স্বতন্ত্র প্রয়োগ-কৌশলে বিশিষ্ট। কবিতায় যাঁরা শব্দ প্রয়োগের ব্যঞ্জনা, আঙ্গিকের কাব্যিক সচেতনতা বা মহৎ হৃদয়ভাবের প্রকাশকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন তাঁরা তাঁর রচনাকে পদ্যজাতীয় বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু ব্যতিক্রমও রয়েছে অনেক। সূক্ষ্মতা বা গভীরতার অভাব তাঁর সমগ্র রচনায় কখনই সাধারণ সত্য নয়। এই ধরণের রচনার একটি প্রধান অংশ সমসাময়িক ঘটনা উপলক্ষ করেই লিখিত, অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলক। সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে সাদা-মাটা ছন্দে রচিত, কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত কবিতার ভাষাভঙ্গীর অনুকরণে রচিত—যাকে প্রচলিত রীতিতে বলা চলে প্যারডি। লক্ষ করবার বিষয়, এই ধরণের ব্যঙ্গাত্মক পদ্য এবং প্যারডি দাদাঠাকুরের সমকালেও একেবারে লেখা হয়নি এমন নয়। দাদাঠাকুরের প্রায় সমবয়সী শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন, পরশুরামের কাহিনীগুলি সচিত্র করার সূত্রে যিনি বিখ্যাত, চিত্রের সঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক ছড়া রচনাতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর 'হাঁচি' বিষয়ক একটি দীর্ঘ পদ্য সে সময়ে কিছুটা জনপ্রিয়ও হয়েছিল, যার শেষাংশ এইরকম:

"যেটা পড়ে অকারণে শব্দ করে'—ফ্যাঁচ্
ওটা বড়ই সর্বনেশে গ্রহফেরের প্যাঁচ !
ঐ হাঁচিটার তুলনায় অন্য কিছু নাই,
যাত্রাকালে 'পড়ে' যদি মেনে চলো ভাই।"

দাদাঠাকুরের চেয়ে বছর পাঁচেকের বয়ঃকনিষ্ঠ ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ও চিত্রাঙ্কন ও ব্যঙ্গকবিতা রচনায়—বিশেষত প্যারডি-জাতীয় কবিতা রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার ভাষাভঙ্গীর অনুকরণে রচিত তাঁর 'মদনভস্মের পর' প্যারডিব একটি অংশ—

"কিশোর সেই দেবতাটিরে নিমেষে করি ভস্মরাশ
না জানি প্রভু মোদের কোন কসুরে,—
লেলিয়ে দিলে বাংলাদেশে, মূর্ত মহা সর্বনাশ--
ঘটকবেশী এ কোন বুড়ো অসুরে!"

কিন্তু কি কারণে, রচনার কোন্ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এবং হাস্যরসসৃষ্টির কোন্ অনন্যতায় দাদাঠাকুর এই সময়ের শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন সে বিচার তাঁর রচনা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই করা যেতে পারে।

দাদাঠাকুর তাঁর পদ্যজাতীয় রচনায় হাস্যরসের ঠিক কোন্ প্রকৃতিকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন, তাত্ত্বিক বিচারের সেই নীরস খুঁটিনাটি সবিস্তারে এখানে বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। যাকে বিশুদ্ধ Humour বলা হয়, দাদাঠাকুরের রচনায় সে জাতীয় সৃষ্টির অভাব নেই, কারণ Humour-এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক স্টিফেন লীকক্ যে 'Kindly contemplation of life'-এর কথা বলেছেন, দাদাঠাকুরের মানসিকতায় তার অভাব ছিল না। আবার মেরেডিথ এই জাতীয় হাস্যরসের মধ্যে যে নৈর্ব্যক্তিকতার উল্লেখ করেছেন সেই দুর্লভ চারিত্র বৈশিষ্ট্যও যে দাদাঠাকুরের ছিল তার বড় প্রমাণ, নিজেকেই ব্যঙ্গের পাত্র হিসাবে নির্বাচন করে রচিত তাঁর কিছু কবিতা।

সাধারণত ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাকে Satire ধরনের রচনা বলা হয়। এই জাতীয় রচনার আবেদন প্রধানত বুদ্ধির কাছে এবং দাদাঠাকুরের রচনা মূলত বুদ্ধিনির্ভর—এই সাদৃশ্যসূত্র থেকে মনে করা যেতে পারে, Satire জাতীয় রচনাও দাদাঠাকুরের অক্লান্ত লেখনী থেকে কম বর্ষিত হয়নি। এই শ্রেণীর রচনায় ব্যঙ্গের পাত্র স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং সে কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি ঝাঁঝালো বিদ্রূপে জ্বালাময়। কিন্তু দাদাঠাকুরের রচনায় উপলক্ষ্য স্পষ্ট হলেও তার ঝাঁঝ অনেক স্তিমিত—জ্বালার পরিবর্তে এক স্নিগ্ধ কৌতুকই তাঁর রচনাকে সরস করে রেখেছে।

wit জাতীয় রচনাও প্রধানত বুদ্ধিনির্ভর, কিন্তু বাক্-চাতুর্যই এই শ্রেণীর রচনার প্রাণ। দাদাঠাকুর পদ্যের আঙ্গিক রচনায় বিশেষ কোন পরীক্ষার পরিচয় না দিলেও বাক্-চাতুর্যকে তাঁর রচনার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছেন। wit জাতীয় রচনার এক প্রধান অবলম্বন pun বা শব্দের খেলা। এই খেলায় দাদাঠাকুরের উৎসাহ ছিল অন্তহীন। একটি শব্দকে অখণ্ড ভাবে বা খণ্ডিত অবস্থায় ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে তা থেকে মননশীল কৌতুকের সৃষ্টিতে তিনি এমন অনায়াস ছিলেন যে এই গুণটি প্রায় তাঁর সহজাত মনে হয়। তাঁর এই খেলার মধ্যে বাংলা শব্দ যেমন ছিল, ইংরেজি বা হিন্দী শব্দেরও অভাব ছিল না—আবার বহু সময়ই বিভিন্ন ভাষার শব্দ সেখানে তালগোল পাকিয়ে এক একটি অভিনব অর্থের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। একটি পুরো বাক্য অর্থান্তরের যে খেলা তিনি কলকাতা বেতারে প্রচার করতেন তার স্মৃতি এখনো কারো কারো মনে জাগ্রত থাকতে পারে! আসলে, দাদাঠাকুরের হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াসকে ঠিক কোন বিশেষ শ্রেণীতে সীমিত রাখা সম্ভব নয়। স্ব-সম্পাদিত 'বোতল পুরাণ' ফেরি প্রসঙ্গে যে কথা তিনি শ্বেতাঙ্গ দুই সার্জেণ্টকে বলে-ছিলেন—'হিউমার স্যাটায়ার উইট/আর ইন মাই পাবলিকেশন', তাঁর সমগ্র রচনা সম্বন্ধেই সে কথা প্রযোজ্য।

আসলে, দাদাঠাকুর প্রসঙ্গে যে বাঙালী কবির নাম পূর্বেই করা হয়েছে সেই ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গেই দাদাঠাকুরের সাদৃশ্য ছিল সবচেয়ে বেশী। মেকির প্রতি ক্রোধ, ব্যঙ্গ-প্রবণতা, কথায় কথায় সরসতা, সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত আগ্রহ, সংবাদপত্রের সম্পাদনা এবং সেই সূত্রে অধিকাংশ topical রচনার সৃষ্টি—প্রায় সব বিষয়েই দুজনের সমধর্মিতা লক্ষ করা চলে। পার্থক্য যে ছিলনা তা নয়, কিন্তু তার পরিমাণ কম। প্রধান পার্থক্য ছিল একটিই, ঈশ্বর গুপ্তের মনে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যে সংস্কার ও গোঁড়ামি ছিল, দাদাঠাকুর ছিলেন সে সব দিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সংস্কারের অপদার্থ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকেই ছিলেন তিনি অসহিষ্ণু—এ জন্য বাল্য-কালে তাঁকে নিয়ে গুরুজনদের অনেক অস্বস্তিকর অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি নিজেও এর জন্য কম নিগ্রহ সহ্য করেননি। উত্তরকালে এ বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদ আরো অনেক সোচ্চার ও বাধাহীন হয়েছে। তাঁর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করলেই তাঁর এই মানসগঠন এবং চরিত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে।

॥ ২ ॥

ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে

সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিকে বুঝিতে পারিলে আরো বেশী লাভ।' এ কথা মহৎ কবির জীবনী সম্বন্ধে কতটা সত্য বলা শক্ত, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ও দাদাঠাকুরের মত দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির পক্ষে যে এর সত্য অপরিসীম সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দাদাঠাকুরের সরস রচনাসম্ভার মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষটির মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী। বস্তুত, দাদাঠাকুরের অনমনীয় চরিত্র, অসাধারণ চারিত্র বল, যে-কোন প্রলোভনের নিকট নতি স্বীকার না করার দৃঢ়তা, সহজ অনাড়ম্বর জীবন এবং সর্বক্ষেত্রে ঋজু বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে অবহিত না হলে তাঁর পরিচয় নিতান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লেখায় তাঁর চরিত্রের আংশিক প্রকাশ, তার সম্পূর্ণতা ঘটে তাঁর মানসিকতার উন্মোচনে। বরং সেখানেই তাঁর প্রকাশ বৃহত্তর।

আপামর সাধারণের কাছে যিনি দাদাঠাকুর নামে পরিচিত, তাঁর প্রকৃত নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। দাদাঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১২৮৮ বঙ্গাব্দের তেরোই বৈশাখ। তাঁর জন্মস্থান বীরভূম জেলার নলহাটি থানার অন্তর্গত সিমলান্দি গ্রাম। মাতামহ ঈশানচন্দ্র রায়ের গৃহেই তাঁর জন্ম। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল জঙ্গিপুরের দফরপুর গ্রাম। জন্মের দু বছর পরেই তিনি পিতৃহীন হন এবং পিতা হরিলালের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ বছর পরে তাঁর মাতা তারাসুন্দরী দেবীও পরলোকগমন করেন। পিতৃমাতৃহীন এই বালকের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন হরিলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রসিকলাল। দাদাঠাকুর জ্ঞানাবধি রসিকলালকে বাবা বলেই ডাকতেন—রসিকলালও তাঁকে অপত্যস্নেহেই লালনপালন করেছেন। হরিলাল যখন মারা যান রসিকলাল তখন সবেমাত্র উনিশ বছরের যুবক, ছাত্রবৃত্তি পাশ করে স্থানীয় বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নিজের কর্তব্যের কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। অন্তরে তিনি অত্যন্ত কোমল হলেও শাসন ছিল তাঁর কুলিশ-কঠোর। তাঁর শাসন এবং শিক্ষাতেই মানুষ হয়েছিলেন দাদাঠাকুর। পিতৃব্যের কাছে একদিকে যেমন তিনি পেয়েছিলেন সত্যবাদিতা ও অন্যায়ের প্রতিবাদের শিক্ষা, অন্যদিকে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর কাছে কৃচ্ছ্রসাধনের ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শ। বাল্যকালে কৃচ্ছ্রসাধনের যে শিক্ষা তিনি পেয়েছেন, আজীবন তা স্মরণ রেখেছেন—সুদীর্ঘ জীবন তিনি নগ্নপদে চলেছেন, পরিধান বলতে ছিল হাঁটু পর্যন্ত ধুতি ও ক্বচিৎ কখনও উত্তমাঙ্গে একটি উত্তরীয়।

ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন দাদাঠাকুর—স্মৃতিশক্তি ছিল অতি প্রখর, একবার যা শুনতেন বা পড়তেন বহুদিন তা মনে রাখতে পারতেন। পরিহাস রসিকতা তাঁর জন্মসূত্রে অর্জিত সম্পদ। কিশোর বয়সে তিনি ভর্তি হন জঙ্গিপুর হাইস্কুলে। স্কুলের বেতন দেবার সংগতি তাঁর ছিল না বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে অর্ধেক বেতনে পড়বার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর কবিত্বশক্তির বিকাশ অতি শৈশবকাল থেকেই দেখা যায়—যদিও এর জন্য তিনি কি জাতীয় নিগ্রহের সম্মুখীন হয়েছিলেন, নির্মলরঞ্জন মিত্র তাঁর 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর' গ্রন্থে তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন। স্কুলের সহপাঠীদের তিনি নানাভাবে আনন্দ দিতেন মুখে মুখে সরস কবিতা ও গান রচনা করে। জঙ্গিপুরের বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি এফ্-এ পড়বার জন্য ভর্তি হন বর্ধমান রাজ কলেজে। এখানে তিনি বিনা বেতনেই পড়বার অনুমতি পান এবং আহারাদির ব্যয় নির্বাহ করবার জন্য একটি পুলিস-দারোগার ছেলেকে

প্রাইভেট পড়াতে থাকেন। ছাত্রাবস্থাতেই রসিকলালের ইচ্ছানুসারে তাঁকে বিবাহ করতে হয়। বিবাহকালে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী প্রভাবতীর বয়স ছিল মাত্র এগারো। যথাকালে তিনি আট সন্তানের জনক হন—চারটি পুত্র সন্তান এবং চারটি কন্যা সন্তান। পুত্রদের মধ্যে সত্যেন্দ্রকুমার ও বিমলকুমার সাত বৎসর বয়সেই মারা যায়। অন্য দুই পুত্রের নাম বিনয়কুমার ও অমলকুমার। কন্যাদের নাম ইন্দুমতী, বিন্দুবাসিনী, রেণুকা ও কণিকা।

রসিকলালের সংসার স্বচ্ছল ছিল না, কাজেই বাধ্য হয়ে দাদাঠাকুরকে অতি অল্প বয়সেই জীবিকার সন্ধান করতে হয়। কিন্তু চাকরি করার ব্যাপারে রসিকলালের ছিল ঘোর অনিচ্ছা। তিনি তাঁর এক শিক্ষকের কথা প্রায়ই শোনাতেন দাদাঠাকুরকে—'It is better to starve than to serve. স্বাধীন জীবিকার উপায় হিসাবে দাদাঠাকুরের মাথায় আসে, ছাপাখানা করার চিন্তা। বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় তিনি অল্প দামে কাঠের একটি পুরণো ছাপার যন্ত্র ও ছাপার অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করেন—সেই সঙ্গে কিনতে হয় একটি 'প্রিণ্টার্স গাইড', কারণ এ ব্যাপারে তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না। অচিরেই রঘুনাথগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পণ্ডিত প্রেস'—যার প্রোপাইটর, কম্পোজিটর, প্রুফ-রিডার এবং ইংকম্যান তিনি একাই ; এবং প্রেসমান বা উওম্যান তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী দেবী। রঘুনাথগঞ্জে আড়াই টাকা ভাড়ায় ঘরটি নেবার কারণ সেখানেই ছিল আদালত, থানা ও অন্যান্য সরকারী অফিস। ফলে চেক-দাখিলা ও অন্যান্য কাজ তিনি পেয়ে যেতেন।

এর পরই দাদাঠাকুরের দ্বিতীয়বার 'পিতৃ-বিয়োগ' ঘটলো, ১৩১১ বঙ্গাব্দে তিনি হারালেন তাঁর পিতৃব্যকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম তাঁর বাল্যকালেই শুরু হয়েছিল, এবার শুরু হল অস্তিত্ব-রক্ষার সংগ্রাম। সব কিছু হেসে উড়িয়ে দেওয়া দাদাঠাকুরের সহজাত বৈশিষ্ট্য, তাই এ সম্পর্কেও তিনি পরিহাস-রসিক মন্তব্য করেছেন—'ছেলেবেলায় কালাজ্বর হয়েছিল, Antimony injection দিয়ে কালাজ্বর সারলো কিন্তু দারিদ্র্য (Anti-money)-ব্যাধিগ্রস্ত হলাম।'

ব্যবসায়িক কাজকর্মের সম্প্রসারণ ঘটাবার জন্য এবং নিজের কাব্যপ্রতিভা তৃপ্ত করার জন্য দাদাঠাকুর একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু মাটিতে গর্ত করে রাখা টাইপের কেজ আর পুরণো ভাঙা যন্ত্র নিয়ে তা করা সম্ভব নয় বলে সীমিত অর্থের মধ্যে একটু ভাল প্রেস অনুসন্ধান করছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর এক সাহেবের কাছে সেরকম একটি প্রেস পাওয়া গেল। সাহেব তাঁর অদ্ভুত কায়দায় ধূমপান দেখে চমৎকৃত হয়ে বাকিতে ভাল একটি প্রেসের ব্যবস্থা করে দেবার কথা বললেও ঋণের প্রতি জাতক্রোধ ছিল দাদাঠাকুরের—তিনি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী একশো টাকায় একটি প্রেস কিনে নিলেন।

পরের বছর আত্মপ্রকাশ করলো দাদাঠাকুরের পত্রিকা, 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য তিনি তাতে প্রকাশ করতেন সরকারী বিজ্ঞাপন এবং নীলামের সংবাদ, তাছাড়া, দেশের ও সমাজের কথা লিখতেন নিজের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই সেই পত্রিকা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং কর্তাব্যক্তিরাও সেটির প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু জনপ্রিয়তার অভিশাপও কম নয়, কিছু বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি এই পত্রিকার পাশাপাশি 'জঙ্গিপুর বাণী' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে—যার প্রধান কাজ ছিল দাদাঠাকুরের প্রতি

অসৌজন্যমূলক রচনা প্রকাশ করা। সৌভাগ্যের কথা সেটি বন্ধ হয়ে যায় অচিরেই, এবং তা দাদাঠাকুরেরই বিচিত্র কৌশল ও অপার বুদ্ধিমত্তায়।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ দাদাঠাকুর আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, এটি সাপ্তাহিক। এই পত্রিকা তাঁর পরিচিতিকে আরো বিস্তৃত ও দৃঢ় করে। পত্রিকার নাম 'বিদূষক', প্রকাশিত হতো প্রতি শনিবার। আত্মপ্রকাশের লগ্ন থেকেই এটি ছিল বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত। 'প্রথম সংখ্যা' কথা দুটির পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছিলেন 'প্রথম হর্ষ', 'এডিটার' শব্দটি ইংরেজিতে লেখা হতো 'Aid-eater.' প্রচ্ছদপটে ছিল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের একটি ব্যঙ্গচিত্র—তার কপালে লেখা 'দুঃখ', বুকে 'দুরাশা' আর উদরের ওপর লেখা 'উদররে তুহুঁ মোর বড়ি দুশমন।' পত্রিকার পরিচিত ছিল—'ধামাধরা উদরপন্থীদের মুখপাত্র।' পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি যে কবিতা লিখেছিলেন তার প্রথম চার পংক্তি এই রকম—

> 'জন্ম আমার জঘন্য স্থান পল্লীগ্রামের জঙ্গলে,
> দেশের মঙ্গল যেমন তেমন নিজের পেটের মঙ্গলে,
> আজ রাত্তিরে ভ'রে রাখি, খালি আবার কালকে তা
> পেটের জ্বালায় 'বিদূষক' চলে এলেন কল্‌কাতা।'

'বিদূষক' সত্যিই কলকাতায় চলে এসেছিল—নিজের ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে কলকাতায় এনে দাদাঠাকুর নিজেই তা ফেরি করতেন ; অর্থাৎ পত্রিকাটির মুদ্রক, প্রকাশক, লেখক ও বিক্রেতা ছিলেন তিনি একাই! বেশীদিন এই আসা-যাওয়ার ব্যাপার সম্ভব হল না বলে, বাগমারীতে ভোলানাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ির দারোয়ানের ঘরের পাশে ছোট কামরাটি ভাড়া নিয়ে সেটিকেই তাঁর ছাপাখানা করেন। অবশ্য সেটি তিনি করেছিলেন ১৩৩১ বঙ্গাব্দে। পত্রিকাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এটির সমস্ত রচনাই ছিল পদ্য—স্থানীয় সংবাদ পর্যন্ত। পত্রিকাটি ছিল সচিত্র। একে সচিত্র করবার পদ্ধতিও ছিল বেশ অভিনব। তখন কলকাতায় কাঠের যে সব পুরণো ব্লক খুব সস্তায় বিক্রী হতো, তাই কিনে নিতেন দাদাঠাকুর, তারপর ছবি অনুযায়ী রচিত হতো ব্যঙ্গ কবিতা। প্রকাশের সময় এর মূল্য ছিল চার পয়সা, কিন্তু পরে তার মূল্য তিনি কমিয়ে এক পয়সা করেন।

দাদাঠাকুরের আর একটি জনপ্রিয় কীর্তি 'বোতল পুরাণ'। বিদূষকের সঙ্গেই তিনি এই 'বোতল পুরাণ' কলকাতার রাস্তায় ফেরি করতেন গান গেয়ে। বোতলের আকারে কালো রঙের মোটা কাগজ কেটে তৈরি হতো প্রচ্ছদ, ভেতরে থাকতো লাল রঙের কাগজে ছাপা মদ্যপদের জন্য কবিতা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দু-আনা। আর একবার চাঁদপুরে কুলিদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি জ্বালাময় ভাষায় রচনা করেছিলেন মোহ-মুদ্গরের অনুকরণে 'কুলী-মুদ্গর।'

আলস্য ও বিলাসিতা ছিল দাদাঠাকুরের প্রধান দুই শত্রু। কলকাতায় বসবাস করার সময়ও তিনি ট্রামে বাসে বিশেষ কখনো চড়েননি—যখনই যাতায়াতের প্রয়োজন পড়েছে, নগ্ন চরণ দুটিই ছিল তাঁর প্রধান ভরসা। কিন্তু ১৩৭১ বঙ্গাব্দ থেকেই তাঁর শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে চার বছর অসুস্থ জীবনযাপন করে ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ তারিখে তিনি

অমরধামে গমন করেন। জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন তাঁর জীবনের দুই প্রান্তে এসে একাসনে বসেছে, জন্মদিনই পরিণত হয়েছে মৃত্যুদিনে।

॥ ৩ ॥

দাদাঠাকুরের জীবনের এই রেখাচিত্র থেকে সম্পূর্ণ মানুষটিকে চিনে নেওয়া শক্ত। কোমলে কঠোরে গড়া এই মানুষটিকে আরো ভালভাবে বুঝতে গেলে তাঁর জীবনের কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে হবে। তদানীন্তন অনেক খ্যাতিমান মানুষের কাছেও দাদাঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মত রাজনীতিবিদ্, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল বা অমৃতলাল বসুর মত বরেণ্য সাহিত্যিক—যিনিই একবার তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তিনিই মুগ্ধ হয়েছেন। বাংলার তদানীন্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কাজের চাপে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেই সে উদ্বেগের নিরসন করবার জন্য স্মরণ করতেন এই লোকটিকে। কথায় কথায় punning করার আশ্চর্য ক্ষমতা, কথা ভাঙচুর করে নতুন কথা তৈরি করবার দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Ready wit, সেই মননশানিত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ছটায় দাদাঠাকুর কত লোকের যে হৃদয় জয় করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। অন্যদিকে ছিল তাঁর দৃঢ় আত্মসম্মান জ্ঞান, দারিদ্র্যের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম সত্ত্বেও স্বাধীনচেতা দম্ভ, করুণা ও সহানুভূতির সহজাত মানসিকতা এবং সেই সঙ্গে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হবে।

কথা নিয়ে খেলা করার স্বভাব বোধ হয় দাদাঠাকুরের জন্মগত। স্কুলে পড়বার সময় একবার পরিদর্শকের সম্মানে সেখানে পর্যাপ্ত ভোজনের ব্যবস্থা হয়। সব দেখেশুনে দাদাঠাকুর তাঁর এক সহপাঠীকে বলেন, 'স্কুলের আজ শ্রাদ্ধ হচ্ছে।'

সে কথা কানে যায় তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের, তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন, বলেন, 'জানিস—এরকম স্কুল কমই আছে। এটা গভর্ণমেণ্ট এডেড (Aided) স্কুল?'

দাদাঠাকুরের উত্তর, 'জানি স্যার, a dead school.'

এরপর অবশ্য তাঁর সম্বর্ধনার ব্যবস্থা কি রকম হয়েছিল সে কথা না বলাই ভাল। এই ছেলেমানুষি দাদাঠাকুরের সারা জীবনেও যায়নি। দেশ স্বাধীন হবার পর ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা করার ব্যবস্থা হল, তারপর আবার বাংলার পরিবর্ত শব্দ হিসাবে হিন্দী-শব্দের প্রচলন হল। সেই সময়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বলুন দেখি, সরবরাহ বিভাগের হিন্দী কি হবে?' সুনীতিকুমার উত্তর দেবার আগেই তিনি বলেছিলেন, 'হট্ যাও শুয়োর বিভাগ বললে কি ভুল হবে?'

দাদাঠাকুর যে বলতেন, দিন আনি দিন খাই—সে কথা তাঁরই বলা সাজতো, কারণ যাবতীয় অর্থ তাঁর ট্যাঁকেই থাকতো। আয়রণ-চেস্ট তো দূরের কথা, একটা মানিব্যাগ পর্যন্ত তাঁর ছিল না। সে কথা বলা হলে তিনি বলেছিলেন, 'চেস্ট (বক্ষঃস্থল) যাদের আয়রণের মত অনুভূতিহীন তারাই আয়রণ-চেস্টে রাখার মত টাকা সঞ্চয় করতে পারে।'

কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'আমার অ্যাকাউণ্ট খোলা আছে রিভার ব্যাংকে। এ ব্যাংকে আবার কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট করা সোজা নয়। ফ্লোটিং অ্যাকাউণ্ট, সিংকিং ফাণ্ড সব আছে।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ওয়ার-লোন সংগ্রহ করতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার এসেছেন জঙ্গিপুরে। সেই উপলক্ষে জঙ্গিপুর মহকুমার হাকিম একটি সভা আহ্বান করেছেন। বক্তারা সবাই এই আশা ব্যক্ত করছেন যে, যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় হবেই—এবং আমাদের উচিত ইংরেজ সরকারকে লোকবল ও অর্থবল দিয়ে সাহায্য করা। দাদাঠাকুর ভাষণ দিতে উঠেই সভার সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন, 'এ যুদ্ধে জয়ী হবেন জার্ম্যান—জার্মানী।'

সকলে হতবাক। কমিশনারের মুখ লাল।। মহকুমা হাকিম প্রমাদ গুণছেন। প্রত্যেকেই একটা আশংকায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। দাদাঠাকুর আবার হেসে বললেন—'আমরা ফর্টিনাইনথ্ বাঙালী রেজিমেণ্ট তৈরী করে এই যুদ্ধে ভারতসম্রাটের লোকবল বৃদ্ধি করেছি, এবার অর্থদানের পালা। তাই বলছি, এ যুদ্ধে জয়ী হবে যার man—যার money.'

দাদাঠাকুর এবং তাঁর বিচিত্র হুঁকা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছিল। হুঁকা পালটে গড়গড়া ব্যবহার করার কথা তাঁকে অনেকে অনেকবার বলেছেন। তিনি রাজি হতেন না। গড়গড়ার নাম তিনি দিয়েছিলেন নল-দময়ন্তী। কথাটা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন তাঁর অনেক গানের গায়ক স্নেহধন্য নলিনীকান্ত সরকারকে—'গড়গড়ায় নলতো দেখতেই পাস—সংস্কৃত জানলে দময়ন্তীও দেখতে পেতিস। গড়গড়ার নলে টান দেওয়ার মানেই—দময়তি, দময়তঃ, দময়ন্তি। এক টানে দময়তি, দুটানে দময়তঃ, তারপর থেকে টানের পর টানে দময়ন্তি। গড়গড়ায় নল-দময়ন্তীর একেবারে যুগলমিলন।'

ছোটবেলায় যেমন aided school-কে বলেছেন a dead school, পত্রিকা বার করার সময় তেমনি editor হিসাবে নিজের নাম না দিয়ে নিজেকে বলতেন পত্রিকার aid eater. কলকাতায় যখন ঘন ঘন আসতে হত 'বিদূষক' পত্রিকা নিয়ে তখন একদিন বলেছিলেন, 'পাঁজিতে লেখা থাকে— বছরে একদিন রাস আর একদিন ঝুলন, কিন্তু কলকাতায় চলেছে নিত্য-রাস, নিত্য-ঝুলন।'

কোথায় দেখলেন এসব রাস-ঝুলন, এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠেছে। বলেছিলেন—'কেন, ট্রামে বাসে? যেমন rush. তেমনি ঝুলন।'

শব্দ দিয়ে খেলার নেশা দাদাঠাকুরের ছিল এতই সহজাত প্রতিভালব্ধ যে এজন্যে তাঁকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করতে হতো না—এই নেশা তিনি ছাড়তেও পারেননি কোনদিন। কলকাতা বেতারে একদিনের একটি অনুষ্ঠানের কথা জানিয়েছেন নলিনীকান্ত সরকার। সেটি ছিল প্রশ্নোত্তরের আসর—প্রত্যেকটি প্রশ্নের মধ্যেই আছে তার উত্তর। একটু নমুনা দেওয়া হল:

'প্রশ্ন—এটা কি গ্রাম?
উত্তর—এ টাকি গ্রাম।
প্রশ্ন—মাসী কি দিয়েছে?
উত্তর—মা সিকি দিয়েছে।
প্রশ্ন—অরুচি হলে নিম কি রুচিকর?
উত্তর—অরুচি হলে নিমকি রুচিকর।

প্রশ্ন—কে সব দেবতার মধ্যে পালন কর্তা ?

উত্তর—কেশব দেবতার মধ্যে পালনকর্তা।

প্রশ্ন—বড়দিনে ভেট কি দিলে ?

উত্তর—বড়দিনে ভেটকি দিলে।'

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই খেলা তাঁর ঠোঁটে লেগে ছিল। রোগশয্যায় পুত্রবধূ হরলিকস খাওয়াতে এলে বলেছিলেন, 'চারধার লিক্ করছে—হরলিকস আর কদিন ঠেকাবে ?'

তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন—'আর লিঙ্গার করবে না, এবার ফিঙ্গার দেখাবে।'

উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেকটি পরিবেশ সামলে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল দাদাঠাকুরের। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য মিশে আছে কি অসামান্য উজ্জ্বলতায়। এক রাত্রে নিমন্ত্রণ সেরে ফিরছেন দাদাঠাকুর, রাত্রি খুব বেশিই হয়ে গিয়েছে। মাণিকতলা ব্রীজের কাছে এক টহলদার সেপাই ধরলে তাঁকে—থানায় নিয়ে যাবে, এত রাত্রে নিমন্ত্রণ খাওয়ার অজুহাত নিশ্চয়ই মিথ্যে। দাদাঠাকুর অনেক বোঝালেন, কাজ হলো না। অগত্যা কৌশল। তাঁর হিন্দীভাষণ ছিল অপূর্ব—হিন্দীতে তিনি অনেক কবিতাও রচনা করেছিলেন, সেই হিন্দীতে বললেন, সিপাই তুমি নিশ্চয়ই ছত্রী। গর্বিত সিপাই বললে, নিশ্চয়ই !

দাদাঠাকুর বললেন, দেশের কি হাল দেখো—একদিন ছত্রী ছিল দেশের রাজা, ব্রাহ্মণকে তারা পূজা করতো— আর আজ এক ছত্রী বিনা অপরাধে ব্রাহ্মণকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে হাজতে।

সেপাই লজ্জিত হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিল।

বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দাদাঠাকুর। তাঁর বাড়িতে কয়েকটি কুকুর ছিল, দাদাঠাকুরের বিচিত্র বেশ দেখে তারা দাঁত বসিয়ে দিল তাঁর পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে টিঞ্চার আয়োডিন, তুলো দিয়ে ভাল করে ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ নিজে। দাদাঠাকুর হাসিমুখে বললেন, কুকুরে কামড়াবে বলে ব্যবস্থা কি সব সময় ঠিক করেই রাখো ?

হেমেন্দ্রপ্রসাদ অপ্রস্তুত হলেও সামলে নিয়ে বললেন, না, আমার কুকুর ভদ্রলোক চেনে—তাদের ও কামড়ায় না।

দাদাঠাকুর সহাস্যে বললেন, তা নয়—কায়েতের কুকুর তো, মনিবের মতই বামুনের পা পেয়ে আর ছাড়তে চায় না।

এক কন্যার চিকিৎসার জন্য একসময় ঘন ঘন পি জি হাসপাতালে যেতে হতো দাদাঠাকুরকে। প্রত্যহই বিচিত্র কথায় হাসপাতালের বহু কর্মীকে তিনি মাতিয়ে রাখতেন। একদিন একটি যুবক-কর্মী এসে তাঁকে বলল, 'sir, I want your help. My name is very bad, everybody laughs at me and I feel shy and small.

দাদাঠাকুর বললেন, What is your name ?

যুবক বললে, My name is Lawless.

দাদাঠাকুর বললেন, You put 'F' before your name, nobody will laugh at you, and you will be Flawless.

সকলে দাদাঠাকুরের হাত ধরে বলল, Splendid. You took no time to solve the problem.

একবার দাদাঠাকুর দিল্লী থেকে বাড়িতে ছেলের কাছে চিঠি লিখছেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ঠাট্টা করে বললেন, Are you writing a letter to your Brahmani ?

দাদাঠাকুর বললেন, Our family custom is that the husband can-not write a letter to the wife and the wife can not write a letter to the husband.

পণ্ডিতজী ব্যথিত হয়ে বললেন, A very cruel system !

দাদাঠাকুর বললেন, কি আর করা যাবে—She'll never take any pain to hold a pen in her life to write to any male or female in the world.

এ কথা শুনে জিন্না সাহেব মন্তব্য করলেন—It is more cruel than your suttee rites (সতীদাহ).

শেষ পর্যন্ত মূল রহস্য ফাঁস করে দিলেন স্বরাজ্য দলের নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, বললেন—ভেতরের কথাটি হচ্ছে এই যে, দাদাঠাকুরের স্ত্রী মোটেই লেখাপড়া জানেন না—দাদাঠাকুর তোমাদের বোকা বানিয়েছেন।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে একটি বেতার-ভাষণ দেবার জন্য একবার দাদাঠাকুর আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি ভূমিকার পরই এমন একটি কথা বলে বসেন যাতে অনুষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের হৃৎকম্প হয়েছিল। তিনি বলেন, দেশশুদ্ধ লোক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বড় বলে মানলেও তিনি ছোট, নিতান্ত ছোট।

এরপর শুরু হল উপস্থিত বুদ্ধির খেলা। বললেন, আমি প্রমাণ করে দেব, শরৎদা ছোট তো বটেই, সবার চেয়ে ছোট। একটা গল্প বলি। একদিন নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবচেয়ে বড় কে ? কে-ই বা সবার চেয়ে ছোট ?' নারায়ণ উত্তর দিলেন—'সবচেয়ে ছোট আমি, আর নারদ তুমি সবার চেয়ে বড়। এই জল-স্থল-অন্তরীক্ষ—আমি সবার স্রষ্টা, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রা আমি। কিন্তু তুমি আমার চেয়েও বড়, কারণ তোমার হৃদয়ে আমার স্থান। আধারের চেয়ে আধেয় বড় হতে পারে না। ভক্তের হৃদয়ে আমার আসন ; সেখানে আমি ছোট বৈকি !

এরপর দাদাঠাকুরের সমাপ্তি অংশ—অগণিত ভক্তের হৃদয়ে শরৎদা'র আসন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তিনি ছোটই তো। নারায়ণের নজির—এ কথা মানতেই হবে।

আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল দাদাঠাকুরের অত্যন্ত প্রবল এবং যে কোন মূল্যের বিনিময়েই তা ক্ষুণ্ণ করতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাঁর জীবনে এই ধরণের ঘটনা বহু ঘটেছে, এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে দাদাঠাকুর একবার গিয়েছিলেন তাঁর কাছে। আহারের পর মহারাজার ভৃত্য রূপার গাড়ুতে জল, হাতে সাবান ও তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—দাদাঠাকুর হাত ধুয়ে এলেন পুকুরে গিয়ে। মহারাজা ঠাট্টা করে বললেন, পাড়াগেঁয়ে মানুষের এমনি বুদ্ধিই হয় !

দাদাঠাকুর বললেন, রাজবাড়ির হিসেবের খাতাপত্র ঘাঁটলেই বোঝা যাবে একটা রূপোর গাড়ু তৈরি করতে কত টাকা লেগেছে আর ওই পুকুরটা কাটাতে কত খরচ পড়েছে। আমি আবার অল্প দামের জিনিষ ব্যবহার করতে পারি না—বনেদী লোক কিনা!

আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্য একটা কথা তিনি প্রায়ই বলতেন—I first person, singular number, always Capital, never takes help of another alphabet.

অথচ এই কুলিশকঠোর ব্যক্তিটির অন্তর যে কত কোমল ছিল তার অজস্র দৃষ্টান্ত দাদাঠাকুরের জীবনে ছড়িয়ে আছে। সেগুলির উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করিনা, যদি কখনো তাঁর তথ্যাভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা হয় তবে তা একাধারে শিক্ষণীয় আদর্শ এবং আকর্ষণীয় কাহিনীর সমাহার হয়ে উঠবে। দাদাঠাকুর নিজেই এক আত্মচরিত রচনার কাজ শুরু করেন, দুর্ভাগ্য তিনি তা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি—অথবা বলা যায় জীবনের অতি অল্প অংশই তিনি সেখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। কাজেই তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি যেখানে দাদাঠাকুরের সহানুভূতি ও কঠোরতা যুগপৎ প্রকাশিত হয়েছে 'বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে' ব্যক্তি-জীবনেই সত্য হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গে দাদাঠাকুর যে বৈধ হিংসার চর্চা করেছেন তারও একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে এই ঘটনা থেকে;

গ্রামের এক দরিদ্র যুবক বিহারীলাল দাস মনোহারী জিনিষের ব্যবসা করেছিল। দাদাঠাকুরকে সে এসে দুঃখ করে জানালো যে রেলের পার্শেলের বাক্স ভেঙে বিশেষ করে মাথায় মালা সুগন্ধি তৈল নিয়মিত ভাবে চুরি হয়ে যাচ্ছে। এ রকম চললে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। দাদাঠাকুরের চিত্ত যেমন আর্দ্র হল এই দরিদ্র যুবকটির জন্য সেই সঙ্গে ক্রোধও তীব্র হয়ে পড়ল স্টেশন মাষ্টারের প্রতি—কারণ ব্যাপারটা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন।

দাদাঠাকুরের এক আত্মীয় ছিলেন Chemistry-র অধ্যাপক, তাঁকে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, চুল উঠে যায় কিসে বলো ত হে!

উত্তর পেলেন Barium Sulph.

দাদাঠাকুরের কথামত যুবকটি সুগন্ধি তেলে ভাল করে Barium Sulph মিশিয়ে সেবার জিনিষ পার্শেল করল নিজের ঠিকানায়। যথারীতি সেবারও পার্শেল ভাঙা। দাদাঠাকুর হাসলেন।

দিন দশেকের মধ্যেই হই হই কাণ্ড। স্টেশন মাস্টারের সমস্ত পরিবারের মাথায় চুল উঠে যাচ্ছে হু হু করে। কোন ওষুধেই কাজ হচ্ছে না। মেয়ের বিয়ের সমস্ত ঠিক, বরপক্ষ আশীর্বাদ করতে আসবে—সেই সময় কিনা এই কাণ্ড!

স্টেশন মাস্টার মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন জানা যায়নি, তবে বিহারীলালের মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল—পার্শেল ভেঙে মাল চুরি এর পর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দাদাঠাকুরের প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনীর অতি প্রয়োজন, সন্দেহ নেই। সেই জীবন কত আকর্ষণীয় বোঝাবার জন্য এই ঘটনাগুলির উল্লেখ

আমি করেছি নির্মলরঞ্জন মিত্র এবং নলিনীকান্ত সরকারের দাদাঠাকুর বিষয়ক গ্রন্থ থেকে।

॥ ৪ ॥

দাদাঠাকুর রচনাসমগ্রের সজ্জায় একটু বিশেষত্ব আছে, সে কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। সরস এবং ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ও গানের জন্যই দাদাঠাকুর আমাদের কাছে সবিশেষ পরিচিত। কিন্তু তাঁর রচনাসম্ভার মুদ্রিত করতে গিয়ে সেই জনপ্রিয় রসরচনাগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও মন্তব্যগুলিকে। এর কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। দাদাঠাকুর কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সেই পত্রিকার পৃষ্ঠাপূরণের তাগিদেই মূলতঃ কলম ধরেন। তাঁর অনেক কবিতা, সম্ভবত বেশীর ভাগ কবিতাই, এইভাবে রচিত। যে সব প্রবন্ধ তাঁর মানসিকতাকে নির্ভুলভাবে তুলে ধরে সে সব প্রবন্ধও পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই রচিত এবং এর মধ্যে বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ হিসাবেই লিখিত হয়েছিল। এক অর্থে তাঁর প্রায় সমস্ত গদ্যরচনাকেই সম্পাদকীয় রচনা বলা চলে। তা সত্ত্বেও প্রবন্ধ হিসাবে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করতে পারে এমন রচনাগুলিকে পৃথক করে প্রবন্ধ হিসাবে সজ্জিত করা হয়েছে—কবিতার ক্ষেত্রে নির্বাচনের কাজ হয়েছে অনেক সহজ। অন্যান্য সম্পাদকীয় রচনাই 'সম্পাদকীয়' শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই সব সম্পাদকীয় রচনাগুলি পাঠ করার পূর্বে এরকম মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে সাময়িক কোন ঘটনার বর্ণনা বা সাময়িক ঘটনা বিষয়ে টিকাটিপ্পনি আজকের দিনে আমাদের ভাল লাগার কথা নয়। আসলে যে কোন topical লেখা এবং সাংবাদিকতামূলক রচনা সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। কোন বিশেষ সময়ে যে ঘটনা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর হয়ে ওঠে, কালের ব্যবধানে তাকেই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। সুতরাং সেই ঘটনা সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ কোন বিবরণ বা সে সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পরবর্তীকালে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। সেই জন্য সেই সব topical রচনা ও তাদের সম্বন্ধে মন্তব্যের মালা সাজিয়ে এই রচনাগুচ্ছ উপহার দেবার কারণ কি হতে পারে।

এ বিষয়ে অনেকগুলি কথা বলবার আছে বলে আমার মনে হয়েছে। প্রথমত, দাদাঠাকুরের রচনার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হওয়ার ফলেই বুঝতে পারছি একান্ত তথ্যভারবহুল রচনা এবং বিস্মৃত বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্যাদিসহ যেসব সম্পাদকীয় লেখা সাধারণের কাছে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করতে পারতো না, সেই নীরস বিষয়গুলি সম্পাদকমণ্ডলী নিষ্ঠার সঙ্গে বিবেচনা করেছেন এবং সাধারণ পাঠকের কথা চিন্তা করে বর্জন করেছেন। অবশ্য তার পরিমাণ খুব বেশী হবে না।

দ্বিতীয়ত, নামে সম্পাদকীয় নিবন্ধ হলেও সম্পাদকের গুরুগাম্ভীর্য বেশীর ভাগ রচনাতেই অনুপস্থিত। যে কৌতুকস্নিগ্ধ ও ব্যঙ্গদাহ্য রচনা দাদা-ঠাকুরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—এই বিভাগের ছোটবড় সবকটি রচনাতেই তার স্বাদ অল্পবিস্তর পাওয়া যাবে। একেবারে নীরস বিষয়কেও নিজের সরস মন্তব্য ও পরিবেষণ-ভঙ্গীতে পাঠকের রুচিকর করে তোলার ক্ষমতা তাঁর ছিল। সেই হিসাবে মুখ্যত সাংবাদিকতা ধরণের রচনাগুলিও যথেষ্ট সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে

এবং দাদাঠাকুরের রচনার আগ্রহী পাঠক সেগুলির মধ্যেও তাঁদের প্রিয় লেখককে খুঁজে পাবেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

তৃতীয়ত, দাদাঠাকুরের জীবনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করে আমরা যে দেখাতে চেয়েছি বৈধ হিংসার চর্চায় দাদাঠাকুর পরাঙ্মুখ ছিলেন না—সেই বৈধ হিংসার পরিচয় সম্পাদকীয় রচনার বহুস্থলেই পাওয়া যাবে। অন্যায় এবং অবিচার সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হলে যে সাহস এবং মানসিক দৃঢ়তা থাকা দরকার তা তাঁর উপযুক্ত পরিমাণেই ছিল, বিরুদ্ধ শক্তি বিশেষ প্রবল হলেও। সম্পাদকীয় নিবন্ধে সেই মানসিক দৃঢ়তা এবং প্রতিবাদের সাহসিকতা প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যাবে।

চতুর্থত, যে স্বাদেশিক বোধ এবং নিপীড়িত সাধারণ জনের প্রতি সহানুভূতি দাদাঠাকুরের চরিত্রের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত তার নিখুঁত পরিচয় এই বিভাগের রচনাগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। 'পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ,' 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,' 'তোরা ঘরের পানে তাকা,' "ব্যাধি কোথায়?' 'সাময়িক প্রসঙ্গ' প্রভৃতি সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রতি দৃক্‌পাত করলেই এ বিষয়ে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হতে পারবে।

পঞ্চমত, সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি কালানুক্রমে সজ্জিত। যে সময়ে এই রচনাগুলি লিখিত, ভারতবর্ষ এবং অবিচ্ছিন্ন বাংলা দেশের পক্ষে সেটি বড় দুঃসময়। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই যে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা জাতীয় জীবনকে আলোড়িত করছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে তা চরম আকার ধারণ করে। ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস (দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা) থেকে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ এখানে স্থানলাভ করেছে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সাধারণ মানুষের জীবনাচরণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণে এই নিবন্ধগুলি বিশেষ মূল্যবান দলিল হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। দেশের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠক এবং গবেষকগণ এই পর্যায়ের রচনাগুলি থেকে সবিশেষ উপকৃত হতে পারেন বলেই আমার ধারণা। রচনাগুলির আরো বেশী গুরুত্ব এই কারণে যে, এগুলি ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র নয়—সংঘটিত ঘটনাক্রমের বিশেষ তাৎপর্যও দাদাঠাকুরের কাছে ধরা পড়েছিল। ঘটনার সেই অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও তিনি একই সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ২য় বর্ষ, ৩১শ সংখ্যায় স্বায়ত্ত শাসনের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন এবং ৫ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যায় তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সত্যতা পরবর্তীকালে গভীর ভাবে বোঝা গিয়েছিল। এই ধরণের নিবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক রহস্য' গ্রন্থের 'হনুমদ্বাবু সংবাদের' অংশবিশেষ আমাদের স্মরণ করায়।

ষষ্ঠত, দাদাঠাকুর রচিত গল্পের সংখ্যা প্রায় নগণ্য। যে অতি স্বল্পসংখ্যক ছোটগল্প তিনি উপহার দিয়েছেন তার চমৎকারিত্ব ও রসবৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। বিচিত্ররসের এই মনোহর ছোটগল্পের অভাব পাঠক অনেকাংশে পূর্ণ করতে পারবেন সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে। এই স্তম্ভে দাদাঠাকুর প্রচুর গল্প শুনিয়েছেন আমাদের। সর্বত্রই যে সেগুলি হাসির খোরাক জুগিয়েছে তা নয়, তার মধ্যে বেশ কিছু ভিন্ন জাতীয় কাহিনীও রয়েছে। 'যোগী না নর পিশাচ' (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)-এর মত মর্মান্তিক গল্প যেমন তিনি উপহার দিয়েছেন,

'ইমানদার হাজি সাহেব' (২য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা)-এর মত আকর্ষণীয় গল্পও তিনি শুনিয়েছেন। বিচিত্ররসের বেশ দু-একটি গল্পের উল্লেখ এখানে করা যায়, যেমন—'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা। বয়ো গতে কিং বণিতা বিলাসঃ' (২য় বর্ষ, ২১শ সংখ্যা), 'আসল ও মেকি' (৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) অথবা 'অধিবাসের ঠেলা' (৭ম বর্ষ, ২২শ সংখ্যা)। এই সব গল্পের বেশীর ভাগই অবশ্য সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত, কিন্তু তাতে গল্পের আকর্ষণ কিছুমাত্র কমেনি—কারণ, যে কোন রসেরই কাহিনী হোক, তাকে চিত্তাকর্ষকভাবে পরিবেষণের রহস্য দাদাঠাকুরের জানা ছিল।

এতগুলি কারণেই মনে হয়, দাদাঠাকুরের রচনাসংগ্রহের ক্রমিক সজ্জায় সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি প্রথমে সজ্জিত করা অযৌক্তিক হয়নি। মূলতঃ সম্পাদক এই অসাধারণ মানুষটি সম্পাদক হিসাবে যেসব অমূল্য রত্নরাজি বিতরণ করেছেন অকুণ্ঠভাবে—তাৎপর্যে ও উপভোগ্যতায় তা অসামান্য বলেই মনে হয়।

সম্পাদকীয় রচনাগুলির পরেই সজ্জিত করা হয়েছে দাদাঠাকুরের কিছু অসামান্য সরস কবিতা। এই জাতীয় কবিতার জন্যই দাদাঠাকুর সমধিক খ্যাত, সুতরাং এই কবিতাবলীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। সুষ্ঠু সম্পাদনা এবং নিষ্ঠ সংকলনের ছাপ এই নির্বাচিত অংশে খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়বে। কবিতাগুলি প্রকাশকালের ক্রম অনুসারে গ্রহণ করা হয়েছে—ফলে যেসব কবিতা দাদাঠাকুরের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ তার বহুলাংশ এখানে অনুপস্থিত হলেও সেজন্য পাঠকের আক্ষেপেরও কোন কারণ ঘটেনি। অপরিচিত এবং স্বল্পপরিচিত কবিতাগুলিও উপভোগ্যতায় কতখানি স্বাদু, সে কথা তাঁরা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন। উপরন্তু এইসব কবিতার স্বাদগ্রহণ করে তাঁরা এ কথাই উপলব্ধি করবেন যে, কবিতা রচনার দক্ষতার পরিচয় দাদাঠাকুরের প্রায় সমস্ত রচনাতেই একই রকম স্পষ্ট। জনপ্রিয় কবিতা অপেক্ষা এগুলির উপভোগ্যতা কোন অংশে কম নয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিস্ময়কর সত্যও উদ্ঘাটিত হতে পারে, সরস কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু দাদাঠাকুরের কাছে অকিঞ্চিৎকর। যে-কোন সামান্য ও তুচ্ছ বিষয় অবলম্বন করে নিজের ঐন্দ্রজালিক রস-সম্মোহন বিস্তার করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। যে কারণে সামান্য সংবাদ পরিবেষণের গুণে অসামান্য সংবেদন জাগাতে সমর্থ হয়, সেই কারণেই অতি তুচ্ছ বিষয় নিটোল মুক্তোর মত এক একটি সরস কবিতার জন্ম দেয়। বেশ কিছু কবিতারই অনুচ্ছেদের শেষ মিলটি সমজাতীয় মিত্রাক্ষরতার সৃষ্টি করায় গান হিসাবে সেগুলি পরে সুর সংযোগে ব্যবহৃত হয়েছে—কবি নিজেও কখনো কখনো পরিচিত গানের প্যারডি হিসাবে তাদের রচনা করেছেন।

অতি নগণ্য বিষয় নিয়ে কবিতা রচনার প্রয়াস দাদাঠাকুরের আগে যাঁর কলমে লক্ষণীয় ভাবে ধরা পড়েছে তাঁর নামোল্লেখ আমরা আগেও করেছি। আনারস, পাঁঠা, তপ্‌সে মাছ প্রভৃতি নিয়ে কাব্যচর্চার দুঃসাহস ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম লক্ষণীয়ভাবে দেখিয়েছিলেন—সে কাব্য কিছু গদ্যরসাত্মক হলেও। দাদাঠাকুরের কলমেও যে জাতীয় বস্তুর অভাব ছিল না, এই বিভাগের একেবারে প্রথম কবিতাটিই তার ভাল প্রমাণ। রসনারসিকতারও অভাব ছিল না দাদাঠাকুরের। ভোজনের ব্যাপারে তাঁর অভাববোধ ছিল যত কম, এ নিয়ে রসিকতার আগ্রহ ছিল ততই বেশী। নইলে ১৩২৪ সালে প্রকাশিত 'পেটুক বামুন'

কবিতায় ভেজাল ঘি এবং 'অস্থি মিশেল শর্করার' দুঃখে তাঁকে বলতে হত না—

"রসনারে! এবার হ'ল
বাসনা তোর করতে দূর ;
নেহাৎ তোমার ভাগ্যে আছে
চিড়ে, দৈ আর কোৎরা গুড়।"

অনাড়ম্বর এবং সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত দাদাঠাকুর কৃচ্ছ্রসাধনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না, কিন্তু মানবিক মহত্ব ও গুণের ওপর স্থাপিত রজত-কৌলীন্যের শ্রেষ্ঠত্বকে অসহিষ্ণু ব্যঙ্গ করেছেন বহুবার। এ বিষয়ে তাঁর অনেক-গুলি গান আজ পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে আছে। 'বোতল-পুরাণে' প্রকাশিত তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা 'টাকার অষ্টোত্তর-শত নাম' হয়ত এখনো কারো কারো স্মরণে আছে। এই সংগ্রহে অন্তত দুটি এই জাতীয় কবিতা সম্পাদক উপহার দিয়েছেন— 'তঙ্কাস্তোত্র' এবং 'টাকার উনপঞ্চাশৎ নাম'। দুটি কবিতাই প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৪ সালে।

কেবলমাত্র নির্দোষ হাস্যরসাত্মক কবিতা দাদাঠাকুর লেখেননি, satire বা শ্লেষের তীব্র জ্বালাও তিনি কখনো কখনো তাঁর শর্করাবৃত কাব্য-বটিকায় পরিবেষণ করেছেন। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন খাঁটি, তাই এই শ্লেষ তাঁর মনে স্বাভাবিক কারণেই জন্ম নিয়েছে। সেই একই কারণে এই ধরনের রচনা প্রকাশের সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর ছিল বলেই আমরা মনে করি। তাঁর এই ব্যঙ্গ বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সীমিত ছিল না, যেখানে যত অন্যায় এবং অবিচার দেখতে পেয়েছেন নির্দ্বিধায় সাহসিকতার সঙ্গে তার বিরুদ্ধে তিনি এই সরস প্রতিবাদ করেছেন। বাংলা ভাষার অপব্যবহার দেখে ব্যথিত হয়ে ডি এল্‌ রায়ের 'আমরা বিলেত ফের্তা ক ভাই'-এর সুরে গীত রচনা করেছেন 'ভাষার নমুনা'। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার যে অধিকারের ছলনামাত্র— অথচ সেই অধিকার অর্জনের জন্যই মারামারি, রেষারেষি এবং সর্বপ্রকার কদর্য আচরণের যে শেষ নেই, এই বিষয় নিয়ে কিছু ব্যঙ্গ কবিতা তিনি লিখেছেন। এই সংকলনে মুদ্রিত ডি এল্‌ রায়ের 'আমার জন্মভূমি'র প্যারডি হিসাবে রচিত 'স্বায়ত্ত আসন। অনাহারী পোস্ট' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। রাজনৈতিক সমস্যার মত সামাজিক সমস্যাও তাঁকে বিচলিত করেছে। সম্পাদকীয় নিবন্ধের বিষোদ্‌গার হাস্যের তির্যক কটাক্ষ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'সমাজ ন্যাতার ভ্যালু', 'দা-ঠাকুরের বর্ষফল গণনা' প্রভৃতি কবিতায়। সাধারণভাবে মানুষের জীবনাচরণের বিকৃতি এবং অপদার্থতা নিয়ে তিনি সরস ব্যঙ্গে মুখর হয়ে উঠেছেন 'ত্রেতার বীর' বাউলের সুরে 'ভাঙা ঘরে থাকবো না মা আর' প্রভৃতি কবিতায়।

গল্প বলা দাদাঠাকুরের সহজাত প্রবণতা। সম্পাদকীয় রচনাতেও তিনি গল্প বলার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। সরস কবিতাতেও তিনি বেশ কিছু আখ্যান শোনাবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের অমানুষিকতা, অপদার্থতা এবং বঞ্চনাই এই সব আখ্যান কবিতার মূল উপজীব্য। দুটি বিবাহ করার শখ যেসব বাবুদের চিত্তে জাগে তাদের করুণ আলেখ্য রয়েছে 'পূজায় দ্বিপত্নীকের বিপদ' কবিতায়। প্রবাসী মানুষকে যখন স্ত্রী-পুরুষ ছেড়ে যাত্রা করতে হয়

কর্মব্যপদেশে, তার দুঃখের মর্মান্তিক চিত্র সর্বজনীন সত্য হয়ে দেখা দেয় রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়। একই দুঃখ অনেক সংকীর্ণ গণ্ডীতে সরসতার আরকে মিশ্রিত করে পরিবেষণ করেছেন দাদাঠাকুর তাঁর 'কেরাণী বিদায়' কবিতায়। রবীন্দ্রনাথেরই 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আমাদের মনে পড়বে 'বনেদী হারামজাদা' কবিতা পাঠ করে। মানুষের অপদার্থতার আর একটি অনুপম আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে 'সম্ভ্রম' কবিতায়।

সরস কবিতায় দাদাঠাকুরের আর একটি প্রবণতা লক্ষ করার মত। রসিকতা করার জন্য তিনি কবিতায় মাঝে মাঝে রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। এই রূপক কখনও দেবদেবীকে উপলক্ষ করে রচিত হয় এবং কখনও আদালতের কল্পিত মামলার আঙ্গিকে রচিত হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি তাঁর বেশী পছন্দ বলে মনে হয়, কারণ গদ্যরচনাতেও এই আঙ্গিকটি তিনি কয়েক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

দেবদেবীর রূপকে সরস সত্য পরিবেষণের ব্যাপারেও শুক-সারীর সংলাপ দাদাঠাকুরের এক প্রিয় বিষয়। এই ধরনের গান গ্রামাফোনের ডিস্কে নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের কণ্ঠে অমর হয়ে আছে। এই সংকলনে এই জাতীয় এক অনবদ্য কবিতা 'শুক-সারীর দ্বন্দ্ব' কবিতায় ব্যঙ্গের আসল লক্ষ্যটিকে পাঠকের বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না বলেই মনে করি। 'হর-পার্বতী সংবাদ' কবিতায় অবশ্য বিষয়বস্তু যে স্বায়ত্তশাসন, কবি সে কথা নিজেই উল্লেখ করেছেন।

আদালতে মামলার আঙ্গিকে দুটি দীর্ঘ কবিতা পাওয়া যাবে। প্রথম কবিতা 'একখানি আরজী। দরিদ্রতা বনাম দরিদ্র' তুলনামূলকভাবে স্বল্পায়তন, কেবলমাত্র আরজী পেশ করেই তা শেষ হয়েছে। কিন্তু 'তামাদী আরজী' শুধু সেইটুকুতেই সমাপ্ত হয়নি, তামাদি আরজির জবাবও সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। এই আরজির বাদীপক্ষ ম্যালেরিয়া সিংহ বর্মা, যাঁর পিতা এনোফিলি মশা এবং তাঁর পরিচয়—'ব্যাধিক্ষত্র, নিবাস সর্বত্র, মানব ক্ষয়-ব্যবসা।'

অবশ্য আদালতের মামলার রূপকে রচিত কবিতায় বাদ-প্রতিবাদ নেই। সংলাপাত্মক উত্তর-প্রত্যুত্তর ধরণের কিছু কবিতার নিদর্শন যেরকম রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়—সেই ধরণের কিছু কবিতাও দাদাঠাকুর রচনা করেছিলেন। একটি ভাল উদাহরণ 'শ্বাশুড়ী-বধূ সংবাদ'। বিবাহের পর ছেলে মাইনের সমস্ত টাকা তুলে দেয় বধূর হাতে, তার পেছনে এত খরচপত্র সব বৃথা—এও যেমন শ্বাশুড়ীর অভিযোগ, তেমনি একথা বলতেও তিনি ভোলেন না—'হায়রে আমার বুকের বাছারে

কি মন্তরে করলি বশ।'

বধূর জবাব দুটি অভিযোগের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমত,

'আঁতুর হইতে কলেজ খরচা
হিসাব করিয়া চার হাজার,
বাবার নিকট নিয়েছ তোমরা
পুত্রের দাবি কেন আবার?'

দ্বিতীয়ত, 'তোমার পুত্রে আইনতঃ আমি
খরিদ সূত্রে দখিলকার।'

এক কথায়, দাদাঠাকুর যে বিষয় নিয়েই কবিতা রচনা করুন, তাঁর সরস-কবিতাগুলি প্রত্যেকটিই নিদারুণ উপভোগ্য। সর্বজনীন সত্য দিয়ে তিনি যে কবিতাগুলি রচনা করেছেন সেগুলি যে কোন সাময়িক উপলক্ষ অতিক্রম করে শাশ্বতকালের আস্বাদ্য রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে। একটি ছোট কবিতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেবার প্রলোভন সংবরণ করা শক্ত হয়ে পড়ছে। কবিতাটির নাম 'পুরাতন চলিত কথা।' তিনি এটি শুরু করেছেন এইভাবে—

'উকীল খোঁজে মকদ্দমা
কোকিলে বসন্ত চায়।
অগ্রদাণী নিত্যি গণে
কোন্ দিকে কে গঙ্গা পায়॥
সাধু খোঁজে পরামর্শ
লম্পট খোঁজে বেশ্যালয়।
গোলমালেতে রেস্ত মেলে,
হাটের নেড়ে হুজুক চায়॥'

দাদাঠাকুর কবিতাটি শেষ করেছেন এই বলে—

'বিনি তুফানে না' ডুবায়
সেই বা কেমন নেয়ে?
একদিনও করেনি ঝগড়া
সেই বা কেমন মেয়ে?'

সরস কবিতার পর সজ্জিত হয়েছে দাদাঠাকুরের কিছু গুরু প্রবন্ধ। মানুষটির সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার পক্ষে এই ক্রম বেশ উপযোগী হয়েছে। ললিতে কঠোরের এক দুর্লভ সমন্বয় দাদাঠাকুরের মধ্যে মূর্তি লাভ করেছিল। কথায় কথায় ব্যঙ্গ এবং পরিহাস যে মানুষের সহজাত, সেই মানুষটিই যখন সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ে সাধারণের জন্য চিন্তিত তখন তাঁর এক ভিন্ন মূর্তি। এই চিন্তিত-গম্ভীর দাদাঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য এই রচনাগুলি অত্যাবশ্যক ছিল। আপাতপঠনে এগুলিকে নীরস মনে হতে পারে, কিন্তু মানুষের প্রতি মমত্ববোধ এবং অধঃপতিত মানুষের জন্য যে গভীর চিন্তার প্রকাশ এই রচনায় আছে তা উপলব্ধি করতে পারলে পাঠকের কাছে এর মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এই সব প্রবন্ধও তাঁর নিজস্ব পত্রিকাতেই প্রকাশিত এবং প্রকাশের ক্রম অনুসারে এগুলিও সজ্জিত হয়েছে।

বহুবিধ বিষয় নিয়েই এই সব প্রবন্ধে চিন্তার বিস্তার আছে। যে কোন রকম স্বদেশী আন্দোলনের চেয়ে যে অনেক বড় চরিত্র গঠন, সে কথা তিনি প্রকাশ করেছেন 'মন, হারালি কাজের গোড়া' প্রবন্ধে। চরিত্র গঠন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেই তিনি রচনা করেছেন 'আশার ইঙ্গিত' 'মা আসিতেছেন' 'আত্মদর্শন' প্রভৃতি প্রবন্ধ। ভণ্ড দেশনেতার প্রতি বিরূপতা স্পষ্ট করে তিনি প্রকাশ করেছেন 'আমার মাথা উঁচু করে দাও হে তোমার আসমানের উপরে' প্রবন্ধে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা—সামাজিক অগ্রগতির জন্য ব্যর্থ আন্দোলন, কুসংস্কার ও ঘৃণিত প্রথা প্রভৃতি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন "সামাজিক সমস্যার সমাধান' 'কঃ পন্থা?' 'ছেলেদের ভবিষ্যৎ" 'বাঙালীর হা-হুতাশ' প্রভৃতি প্রবন্ধে। এগুলি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করার আগে

অবশ্য সম্পাদক দাদাঠাকুরের বিভিন্ন নামে রচিত কয়েকটি সরস পত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। কয়েকটি পত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তকে স্মরণ করায়।

এই প্রকরণগুলি ছাড়া দাদাঠাকুরের সাহিত্যকীর্তির অন্যান্য যেসব নিদর্শন এই গ্রন্থে আছে তার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর কিছু সাধারণ কবিতা। এই ধরণের কবিতায় শ্লেষ আছে, সমালোচনা আছে, মর্মবেদনাও আছে—এবং সেই শ্লেষ, সমালোচনা ও মর্মবেদনার আন্তরিকতায় খাঁটি মানুষটি এতই স্পষ্ট হয়ে ওঠেন যে সরসতার অভাব পাঠক কখনো অনুভব করেন না। এই সংগ্রহে কিছু দঃখের কবিতা আছে, যার কিছু কিছু বেদনার উৎস কবির ব্যক্তিগত জীবনের শোক—তাঁর জীবনীবিষয়ক গ্রন্থে এরকম আভাস পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত শোককে সাহিত্য-শ্লোকে পরিণত করার কাজটি দুরূহ—যদিও আদি কবি বাল্মীকির কাল থেকে সে ঘটনা পুনরাবৃত্ত হয়ে আসছে। দাদাঠাকুর মুখ্যত সরস কবি ও সম্পাদকরূপে খ্যাত হয়েও মহৎ কবির সেই পরিচয় কিছু কবিতায় ধরে রাখতে পেরেছেন।

ঈশ্বর সম্পর্কে দাদাঠাকুরের ধারণা কোন কোন কবিতায় স্পষ্টতা লাভ করেছে। তিনি নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু দুর্বল ও নির্ভরশীল আস্তিকতাও তাঁর ছিল না। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন—"ভগবানের কাছে কি চাইবো? আমার জন্মের পূর্বেই আমার মাতৃস্তনে দুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন, শিশুকে মাতৃস্তন চুষে দুধ পান করতে শিখিয়েছেন তিনি।" তাঁর এই মনোভাবের মধ্যে একাধারে ভগবৎবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, এই বিষয়ক কবিতাতেও সেই সুরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেব-দেবী সম্পর্কে সরস কবিতাও যে তিনি রচনা করেননি এমন নয়, কিন্তু সেগুলিতে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মনোভাবের পরিবর্তে এ সম্বন্ধে অন্ধ সংস্কার ও ভণ্ডামীই তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

দাদাঠাকুরের আর এক ধরণের রচনা এই সংগ্রহে সামান্য পরিমাণে মুদ্রিত হয়েছে। এগুলিকে নাটক ও কবিতার এক মিশ্র পরীক্ষা বলা যায়। একই ভাবগত বিষয় এবং অভিন্ন শিরোনামে কিছু সংলাপাত্মক রচনা ও কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে—যার সবগুলি একসঙ্গে এক অখণ্ড রস-সংবেদন গঠিত করে। এই জাতীয় পরীক্ষা দাদাঠাকুর খুব বেশী করেননি, কিন্তু তার অন্তত একটি সামগ্রিক দৃষ্টান্ত এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে এবং তার প্রকৃত মর্মার্থে তা সজ্জিত হয়েছে বলে সম্পাদক গোষ্ঠীকে সাধুবাদ জানাই। এই পরীক্ষা খুব সার্থক এবং রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি বলেই সম্ভবত দাদাঠাকুর এই ধরণের পরীক্ষা থেকে বিরত ছিলেন। এই সঙ্গেই কিছু মনোরম চুটকি (আলি সাহেবের পরিভাষা অনুসারেই কি এদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে চুটকিলা!) এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধির সঙ্গে রসবোধের যে আশ্চর্য সংমিশ্রণ এই সব রচনায় সংহত আকারে প্রকাশ পেয়েছে শুক্তির মাঝে মুক্তোর মতই তা উজ্জ্বল ও মূল্যবান। সংগ্রহটি সব দিক থেকেই যোগ্য বলে আমি মনে করি।

॥ ৫ ॥

জীবিতকালে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দাদাঠাকুর পাননি, মৃত্যুর পরেও নয়। অথচ এই নামটির সঙ্গে পরিচিত নন এরকম বাঙালীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাঁর যে সরস কবিতাগুলি একদা নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের দৃপ্ত কণ্ঠে গান

হিসাবে শ্রোতার মনোরঞ্জন করেছে সেগুলিই অদ্যাবধি তাঁর কিছু পরিচয় সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। জীবিতকালেই তাঁর জীবন নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ বৃদ্ধির বিশেষ কোন প্রচেষ্টা সমালোচকগণ করেননি। তাঁর অননুকরণীয় জীবনের কিছু খণ্ডচিত্র এবং সামান্য সংখ্যক রচনার সম্বল নিয়ে রচিত দুটিমাত্র গ্রন্থ এ যাবৎ আমার চোখে পড়েছে—নলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' এবং নির্মলরঞ্জন মিত্রের 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর'। এঁরা দুজনেই আমাদের শ্রদ্ধা দাবী করতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এগুলি ছিল অতি সামান্য। আত্মবিস্মৃত জাতি হিসাবে বাঙালীর সুনাম আছে, দাদাঠাকুরের প্রতি নির্মম ঔদাস্য বাঙালীর সেই খ্যাতি পুনর্বার প্রমাণিত করেছে। 'দাদাঠাকুর রচনাসমগ্র' সেদিন থেকে বাঙালীর কৃতঘ্ন অন্যমনস্কতার সচেতন প্রায়শ্চিত্ত। এই ধরণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংকলন এবং সেই সংকলনের উদ্যোক্তা ও প্রকাশককে বাংলা সাহিত্যের যে কোন অনুরাগী পাঠকই পরম সমাদরে গ্রহণ করবেন ও সাধুবাদ জানাবেন বলেই আমি মনে করি।

ব্যারাকপুর।
বুদ্ধ পূর্ণিমা,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০।

ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

যোগী না নর পিশাচ।

১৩২২ সাল—২৬ জ্যৈষ্ঠ ২য় বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা॥

মঠাধ্যক্ষ যোগী গদিতে বসিয়া আছেন। শত শত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিতেছে, কেহ পায়ের ধূলি লইতেছে কেহ বা সাক্ষাৎ ভগবদবতার জ্ঞানে অনিমিষ নয়নে তাহাকে অবলোকন করিয়া নয়ন মনের সাফল্য জ্ঞান করিতেছে। যোগী কিন্তু এক মনে এক প্রাণে কি এক কূট চিন্তা হৃদয়ে লইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

এমন সময় একটি দিব্যভূষণ ভূষিতা অবগুণ্ঠনাবৃতা সুন্দরী হিন্দুস্থানী ললনাকে সঙ্গে লইয়া জনৈক বৃদ্ধ হিন্দুস্হানী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং কহিল—মহারাজ সন্তান লালসায় এই স্ত্রীলোকটি শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছিল কিন্তু ৪/৫ দিন ধন্যা দিয়াও কোনও প্রত্যাদেশ হইল না। এখন যাহা কর্তব্য হয়,—আদেশ করুন।

যখন সঙ্গী লোকটি এই কথা বলিতেছিল, তখন যোগী মহাশয় কিন্তু ললনার লাবণ্যে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। বক্তার উক্তি কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল সত্য কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যোগী মহাশয় নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য তখন এই চিন্তা করিতেছিলেন যে কেমন করিয়া এই নবীন নধর দেহখানির সংস্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া দেহ প্রাণ সার্থক করিবেন। ধন্য রিপু ষড়বর্গ! তোমরা দেবতাকেও নরকের রাক্ষস করিতে পার।

কিয়ৎক্ষণের পর যোগী পুরুষ উত্তর করিলেন—আচ্ছা এখানে কিছু হুকুম না হয়ে থাকে, আমার কুঠিতে সন্ধ্যার আরতির পর নিয়ে যেও, আমি ঔষধ দিব তাহা খাওয়াইলে বংশ রক্ষা হবে।

যোগী যে রাক্ষসের প্রবৃত্তি লইয়া এই প্রস্তাব করিল, সমভিব্যাহারী লোকটি তাহা আদৌ বুঝিতে পারিল না। সে যথাসময় সন্তানোৎপত্তির ঔষধের প্রত্যাশায় তাঁহার আখড়ায় দ্বিতল প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইল। দর্শনমাত্রেই যোগীবর কহিলেন, এসেছ, ভালই হয়েছে। ঔষধ প্রস্তুত আছে, তুমি পুরীতে গিয়ে শঙ্করের কিছু নির্ম্মাল্য নিয়ে এস, তাহার সঙ্গে ঔষধটি খেতে হবে।

লোকটি তখন একাকিনী অবস্থায় সেই নিরাশ্রয় অবলাকে সেইস্থানে রাখিয়া যাইতে একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু তাহার সে শঙ্কা স্থায়ী হইল না। সে ভাবিল যাহারা দেবতার ন্যায় পূজিত তাহারা কখনও নরকের কীট হইতে পারে না। সুতরাং সে নির্ম্মাল্য আনিতে নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেল। এ দিকে সঙ্গে সঙ্গে আখড়ার দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে লোকটী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—সর্ব্বনাশ উপস্থিত, দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে আর প্রবেশের উপায় নাই। তখন সে বহির্দ্বারে ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনও উত্তর নাই। বহুক্ষণের পর যোগীবাবার একজন উত্তর করিল—"চেল্লাচিল্লি মাৎ কিজিয়ে, তোমরা জানানা চলা গিয়া।" অতঃপর রমণীর উদ্ধারের আর কোন উপায় রহিল না। লোকটী দ্বারদেশে পড়িয়া ছট্-

পটং করিতে লাগিল। কিন্তু করিয়া করিবে কি? তীর্থস্থানে তীর্থাধ্যক্ষদিগের প্রতাপ ত বড় অল্প নহে। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে কাটিল। বাড়ীর ভিতর যে একটি অসহায়া অবলার অবস্থা কি হইল ;—তাহার কিছুই সংবাদ পাওয়া গেল না।

রক্ষক লোকটি দ্বারদেশে সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিয়া কোনও উপায় করিতে না পারিয়া প্রাতঃকালের ট্রেণে যুবতীর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে খবর দিতে স্থানান্তরে চলিয়া গেল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সকলে ঘটনাস্থলে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে প্রাণ শুকাইয়া গেল। দেখিল সেই প্রস্ফুটিত কুসুমটী যোগী মহাত্মার বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন দোকানদারের গৃহে শুষ্কাবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার দেহে আর প্রাণ নাই। দোকানদার বলিল—যুবতী তাহার দোকানে আসিয়া শয়ন করিয়াছিল তৎপরে প্রাতঃকালে দেখা গেল তাহার জীবনান্ত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে যে এ কথা সত্য নহে তাহা কাহারও জানিতে বাকী রহিল না। লোক পরম্পরায় জানা গেল—পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর বাটীতে অবরুদ্ধ হইয়া যখন সেই অসহায়া অবলা কুকার্য্য সাধনার্থ যোগী মহাত্মার দ্বারা বারংবার আদিষ্ট হইতেছিল, তখন সে তাঁহার পায়ে হাতে ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াছিল কিন্তু কামাসক্ত পাষণ্ড যখন কিছুতেই শুনিল না, তখন সে দ্বিতল প্রাসাদের বারাণ্ডা হইতে লাফাইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য তাহাতেই তাহার জীবনান্ত হইল। তৎপরে সেই লাস দোকানদারের গৃহে আনিয়া লোক প্রমাণার্থ সজ্জিত করিয়া রাখা হয়।

স্বর্গগতা ললনার আত্মীয়গণ পুলিশ আনাইয়া অনেক তদ্বির করিলেন কিন্তু সকলই প্রমাণ সাপেক্ষ। অর্থ প্রণোদিত দোকানদার অবলীলাক্রমে বলিয়া দিল—তাহার দোকানে আসিয়া শয়নের পর স্ত্রীলোকটি মারা গিয়াছে। কাজেই মামলা মোকদ্দমায় আর বিশেষ কিছু প্রতিকার হইল না। তীর্থাধ্যক্ষ মহাশয় দেব সম্পত্তির বলে অল্প বলীয়ান নহেন। তাঁহার অর্থ ব্যয়ে সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। পাঠক এই বৃত্তান্ত পাঠ করুন আর তীর্থস্থানে গিয়া কিরূপ সতর্কতার সহিত অবস্থান করা আবশ্যক তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকুন।

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ।

ইং ৪ঠা আগস্ট ১৯১৫। ১৩২২ সাল ২৯ শে শ্রাবণ—২য় বর্ষ—১২শ সংখ্যা।

ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর ও পাবনার স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী মুখ ব্যাদন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। শত সহস্র নরনারী ইহার করাল কবলে পতিত হইয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে, লোকে পেটের জ্বালায় কচু, শাক, কলার এঁটে প্রভৃতিও খাইতে আরম্ভ করিয়াছে ভগবান তাহাও সচ্ছলভাবে সরবরাহ করিতেছেন না। এই সকল অঞ্চলে যাহারা সৎ গৃহস্থ বলিয়া পরিচিত ছিল তাহারাও পুত্রকন্যাগণকে দুবেলা পেট ভরিয়া অন্ন দিতে অক্ষম। গরীব শ্রমজীবীগণ কেহ কেহ ৪ দিন কেহ কেহ বা সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া পরিশেষে শয্যাগত হইয়াছে। এই শয্যায় আবার অনেকের

মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইতেছে। সরকার বাহাদুর নিশ্চেষ্ট ভাবে আছেন তাহা বলা যায় না। কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক সহৃদয় মহোদয়গণ এই সকল নিরন্ন দুস্থ ব্যক্তিগণের-অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণ এই সকল অনশন ক্লিষ্ট জীবগণের সাহায্যার্থ ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়াছেন। জনৈক সেবক দুর্ভিক্ষ স্থল হইতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্তি আরও ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে, আমরা পরিদর্শনের কার্য্য খুব দ্রুত চালাইতেছি, প্রাতে চিড়া গুড় খাইয়া বাহির হইয়া সন্ধ্যার পর আড্ডায় ফিরি। প্রায় প্রতি গ্রামেই শুনিতে পাই যে কোন কোন পরিবারের কর্ত্তা ছেলেমেয়েদের হাহাকার সহ্য করিতে না পারিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, ঠিকানা নাই, অনাথ ছেলেমেয়েরা ভাত চুরি করিয়া উদর পূরণ করিতেছে। জমিদার ও কয়েকঘর গৃহস্থ ব্যতীত অল্প কয়েক ঘরেরই অতি-কষ্টে একবেলা আহার জুটিতেছে। আর সকলে একদিন বা দুইদিন পর আহার জুটাইতেছে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ছেলে-মেয়েরা দুটি ভাতের জন্য তাহাদের খাইবার সময় সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে, ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। দিন দিন সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। যখনই পরিদর্শন করিবার জন্য গ্রামে প্রবেশ করি, দেখিতে পাই ছেলেমেয়েরা সারি সারি মরার মত পড়িয়া আছে। আমাদের দেখিয়া করুণভাবে সাহায্য ভিক্ষা করে। ছেলেমেয়েদের সকলেই লেঙ্গটি পরা। স্ত্রীলোকমাত্র কোমরে কাপড় জড়ান আমাদের দেখিয়া জড়সড় হইয়া সরিয়া যায়। এমন কি চাউল লইবে এমন কাপড়ও নাই। স্ত্রীলোকেরা দ্বিতীয় বস্ত্রাভাবে বুকের কাপড়ে চাউল লইতেছে। একটি স্ত্রীলোকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমাদের পরিধেয় একখানা কাপড় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবার ফসল বেশ হইয়াছে বুঝা যায় কিন্তু অনবরত এত বৃষ্টি হইতেছে যে অনেক জায়গায় এই ফসল নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

স্বায়ত্ত শাসন।

ইং ৫ই জানুয়ারী ১৯১৫

১৩২২ সাল ২০শে পৌষ—২য় বর্ষ—৩১শ সংখ্যা ॥

গভর্ণমেন্ট মনে করেন স্বায়ত্ত শাসন কথাটার অর্থ হচ্ছে দেশ শাসনের কিয়দংশ দেশের লোকের হাতে দেওয়া। এখন নগর শাসনের কিছু অংশ দিয়াছি। জেলার রাস্তাঘাট, চিকিৎসা, শিক্ষা, পানীয় জল প্রভৃতি বিষয়ের ভার দিয়াছি। দেশের লোক এই সকল কার্য্যে দক্ষতা দেখাইলে ভবিষ্যতে শাসন-বিভাগের অন্যান্য কার্য্যেরও ভার ক্রমশঃ দিব।

আর দেশের যে সকল লোকের হাতে স্বায়ত্ত শাসন তাঁহারা কেহ ভাবিতেছেন "শাসনটা যখন স্ব+আয়ত্ত তখন নিজের সুবিধা যাহাতে হয় তাহাই করিতে হইবে। ভোটার যদি ভাবে তাহাদের সুবিধাই দেখিব তবে আমি নির্ব্বাচিত হইলাম কেন? আমার সুবিধায় যদি ভোটারের সুবিধা হয় আমার কোন দুঃখ নাই।" সুতরাং মিউনিসিপাল কমিশনারের বাটীর নিকট

একটী আলো না থাকিলে আলো হইবে, তাঁহার বাটীর পার্শ্বের রাস্তা ঘাটে ঝাঁট পড়িবে, জল ছড়ান হইবে, প্রয়োজন হইলে মিউনিসিপাল কুলি আসিয়া বাড়ীর ভিতরটা পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া দিবে। বাড়ীর পার্শ্বের ড্রেনটা প্রত্যহ পরিষ্কৃত হইবে। আর সুবিধা পাইলেই মিউনিসিপালিটীর পুরাতন কর্ম্মচারীকে সরাইয়া তৎস্থানে নিজের মনোমত বা আত্মীয় লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে নতুবা নিজের শাসন হয় কৈ?

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর হইলে নিজের গ্রামের রাস্তাটি ভাল করিয়া লইতে হইবে। আর রাস্তা খরচ হইতে মাসে মাসে কিছু বাঁচাইতে হইবে। ইহাতে আর বড় কিছু হয় না।

আমি স্বায়ত্তশাসনের ইহাই অর্থ বুঝিয়াছি। আপনারা পাঠকেরা কি বলেন?

কাগজের বাজার—মুদ্রাযন্ত্রের দুরবস্থা।

ইং ২৯শে মার্চ ১৯১৫

১৩২২ সাল ১৬ই চৈত্র—২য় বর্ষ—৪২শ সংখ্যা॥

এদেশের কাগজের কলগুলি বুঝি দেশের কাগজ আর যোগাইতে পারে না। মফঃস্বল ও শহরে সমস্ত ছাপাখানাই কাগজের অভাব বোধ করিতেছেন। বড় বড় প্রেসওয়ালারা যদি কাগজের অভাবে ব্যতিব্যস্ত হন তাহা হইলে আমাদের মত নিঃস্ব বা স্বল্প পুঁজির মুদ্রাকরগণের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। বলিতে কি আমাদের "জঙ্গিপুর সংবাদ" আকারে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; আমরা তাই প্রকাশ করিতে যে কি প্রকার বেগ পাইতেছি তাহা ভগবানই জানেন। গত দুই সপ্তাহ হইতে আমাদের কাগজ নাই কাজেই বাজার হইতে চড়া দরে খেলো কাগজ কিনিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। যে সকল সংবাদ পত্রের আকার বৃহৎ তাহারা যে খুব লোকসান করিয়া কাগজ চালাইতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের জঙ্গিপুরের অন্তর্গত ধুলিয়ানেও কাগজ প্রস্তুত হয়। মহাদেবনগর নামক পল্লীবাটী কতিপয় মুসলমান চট, পাট, নেকড়া ইত্যাদি ঢেঁকিতে কুটিয়া কাগজ তৈয়ারি করিতেছে। তাহারা সকলেই দরিদ্র যদ্যপি উপযুক্ত যন্ত্রাদি ও মূলধন প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে বোধ হয় তাহারা খুব চিকণ কাগজ করিতে না পারিলেও চলনসই কাগজ প্রস্তুত করিয়া আংশিক অভাব মোচন করিতে পারে। অনেকের অর্থ আছে যদ্যপি তাঁহারা কেহ সাহস করিয়া মহাদেবনগরের মুসলমান কারিগরগণকে লইয়া কাগজ প্রস্তুতের চেষ্টা করেন তাহা হইলে জঙ্গিপুরেও একদিন কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের যেমন সুদে রুচি শিল্পে তেমন রুচি নাই। আর শিক্ষিতগণের চাকরীর যেমন ঝোঁক ব্যবসায় বা শিল্পে তাদৃশ আস্থা নাই। তাঁহারা বোঝেন "যেমন তেমন চাকরী ঘি ভাত"। আর নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব হইলেই যা কর আমেরিকা, যা কর জাপান। সহৃদয় গবর্ণমেণ্টও দেশীয় শিল্পের উন্নতি কল্পেও মনোযোগ দিয়াছেন। মহাদেবনগরের কাগজওয়ালাদিগের উপর একটু নজর করিলে বোধহয় তাহারাও উন্নতি করিতে পারে॥

খড়খড়ি নদীর সাঁকো।

১৩২২ সাল ১৯শে জ্যৈষ্ঠ—২য় বর্ষ—৩য় সংখ্যা ॥

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধিকার ভাগীরথীর উভয় কূলে অবস্থিত হইলেও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও টোল আফিস ভিন্ন রাজকীয় কার্য্যালয় সকল রঘুনাথগঞ্জে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। রঘুনাথগঞ্জের উত্তরে বালিঘাটা ও গুজরপুর দক্ষিণে আইলের উপর। বর্ষাকালে রঘুনাথগঞ্জে আসিতে হইলে নদী পার না হইয়া আসিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে ভাগীরথী পশ্চিমে ও দক্ষিণে খড়খড়ি নদী উত্তরে গর্জাগিরির দড়া। খড়খড়িতে অধুনা তিনটি গুজার ঘাট বর্ত্তমান—মোগলমারি খড়খড়ি ও বীরবাঁধ তিনটীই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনস্থ। গর্জাগিরির ঘাট ধুলিয়ান রামনগর নামক ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার মধ্যবর্ত্তী হইলেও সেটি জমিদারের গুজার ঘাট। পূর্ব্বে গঙ্গানদীর ঘাটগুলি মিউনিসিপ্যালিটীর আয়ত্তাধীন।

যখন গঙ্গায় বারমাস জল থাকিত জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জ নৌবাহিত বাণিজ্যের স্থান ছিল। চাউল, ধান, সর্ষপ, গহম, তুলা, তামাক, লবণ, মসলা প্রভৃতি পণ্য তথায় নানাস্থান হইতে আসিত ও চালান যাইত। নিকটবর্ত্তী ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন লাইনটি মুরারই, রাজগাঁ, পাকুড়ের তখন অস্তিত্ব ছিল না। নওদা ও বোখরায় তখনও ষ্টেশন হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও নলহাটি আজিমগঞ্জ রেলওয়ে হওয়ার পর অবধিই রঘুনাথগঞ্জের বাণিজ্যের অবনতি হইয়াছে। গঙ্গা শুষ্ককায় হওয়ার পরে তাহার উন্নতি একেবারেই নাই।

রঘুনাথগঞ্জে যে ৫ সহস্র লোক বাস করে তাহাদের আবশ্যকীয় চাউল, ধান্য, খড়, কাষ্ঠ, তরকারী, মৎস্য, দুধ এমন কি উনান ধরাইবার ঘুটাটিও নদী পার হইতে আইসে কয়েকজন মহাজন এখানে চাউল ও তৈল খরিদ করিয়া চালান দেয় তাহাও নদী পার হইয়া আইসে।

খড়খড়ির গুজার ঘাট গুলিতে বারমাস জল থাকে না। শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্যন্ত তথায় মাসুল দিয়া পার হইতে হয়। অবশিষ্ট কয়েক মাস কোনও গুজার ঘাটও থাকে না। মাসুলও লাগে না।

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন হওয়ার পর খড়খড়ির ঘাটে সাঁকোর জন্য লোকে লালায়িত হয়। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড একসঙ্গে মোগলমারী ও খড়খড়িতে সাঁকো করিতে আরম্ভ করিলে লোকের কতই আনন্দ হইয়াছিল। সাঁকো দুইটি প্রায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বরগণ মিটিং করিয়া স্থির করিয়াছেন দুইটীতে পদব্রজে গেলেও বারমাস টোল আদায় হইবে। নৌকায় পার হইতে যে মাশুল দিতে হইত তাহাই দিতে হইবে।

রঘুনাথগঞ্জবাসীগণ! এখন তোমাদের বার মাসই বর্ষাকাল হইল—পয়সায় ৮ গণ্ডা ঘুটে স্থলে ৪ গণ্ডা ঘুটে কেন, ২০০স্থলে টাকায় ৭৫ আটী খড় খরিদ কর, ঝাঁপ দিয়া চালের আড়তের ভিতর বসিয়া গল্প গুজব কর। সহরের বাহিরে যাইতে হইলেই বারমাস যে পয়সা দিতে হইবে তাহা সংগ্রহ কর। ফকীর "ঘোড়া দে লাজে রাম ঘোড়া দে লাজে রাম" বলিয়া চীৎকার করিলে দয়াল

ভগবান ঘোড়ার শাবক তাহার ঘাড়ে চাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন সে যাহা বলিয়াছিল তোমরা এখন ভাল বল—উল্টা বুঝিলি রাম।

হাসির কথা

ইং ৪ঠা আগস্ট ১৯১৫,

১৩২২ সাল ১৯শে শ্রাবণ—২য় বর্ষ—১২শ সংখ্যা ॥

স্বর্ণাঙ্গুরী ও সোনার তাগা।

একদা এক বাবু একটি মূল্যবান (অবশ্য তাহার পক্ষে বড় বড় রাজা মহারাজার পক্ষে কিছুই নয়) স্বর্ণাঙ্গুরী ক্রয় করিয়া তাহা দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলিতে পরিয়া অহংকারে স্ফীত হইয়া সকলকেই সেই অঙ্গুরী দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। প্রথমে নিজের কর্ম্মচারীদিগকে ফুস্কুরী খুঁটিবার ছলে দেখাইলেন, নাপিতকে নখ কাটিবার ছলে দেখাইলেন, খানসামাকে তেল মাখাবার সময় যেন অঙ্গুরীতে তেল না লাগে তজ্জন্য সতর্ক করিবার ছলে দেখাইলেন। এইবার বাহিরের লোককে দেখাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি সেদিন ভাল ইলিশ মাছ কিনিবার অছিলা করিয়া নিজেই মেছুয়া বাজারে গেলেন।

এক মেছুনীর ডালায় কয়টী মাছ সাজান আছে দেখিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে তর্জ্জনী সঞ্চালন পূর্ব্বক মৎস্য নির্দেশ করেন তিনি কিন্তু মধ্যমা অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্ব্বক এক একটি মৎস্য নির্দেশ করতঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "এহি মছলিকা কেৎনা দাম ? এহি মছলিকা কেৎনা দাম" ?

মেছুনী ভারী চালাক, সে কিন্তু বাবুর অভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারিল। মেছুনীর হাতেও সোনার নূতন তাগা ছিল। সেও নিজের তাগা দেখাইয়া বগল বাজাইয়া বলিতে লাগিল, ছহ, ছহ আনা, ছহ, ছহ আনা, ছহ, ছহ আনা, বলিহারী মেছুনী ! এখনও কিন্তু বাবুর vanity (গর্ব্ব) যায় নাই। বারকতক এইরূপ ঘা মুখে ঔষধ পাইলে যদি যায়।

ইমানদার হাজি সাহেব

ইং ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৫,

১৩২২ সাল ১৫ই ভাদ্র—২য় বর্ষ—১৫শ সংখ্যা ॥

রাজমহলের অতি নিকটবর্ত্তী গোপালপুর গ্রামে নিত্যানন্দ, রামানন্দ ও জ্ঞানানন্দ নামে তিন সহোদর বাস করিতেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর তিনজনেই পিতৃসম্পত্তি পৃথক না করিয়া একান্নভুক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ বাটীতে থাকিয়া চাষ বাস ও গৃহস্থলীর যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অপর দুইজন বিদেশে চাকরী করিতেন। তিন ভ্রাতাই বিবাহিত। রামানন্দ ও জ্ঞানানন্দের পত্নী তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতেন। শারদীয়া

পূজার সময় সকলেই গোপালপুরের বাটীতে আসিয়া ছুটির একমাস সুখে অতিবাহিত করিতেন। ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের লক্ষণ কিছুমাত্র দেখা যায় নাই।

একবার পূজার অবকাশান্তে যখন রামানন্দ ও জ্ঞানানন্দ স্ব স্ব কর্মস্থানে গমন করিলেন, তখন নিত্যানন্দের পত্নী একদিন স্বামীর নিকট বসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,

"দেখ তোমার ভ্রাতারা আর তোমার সঙ্গে একত্রে থাকিবে না। মেজ বৌ ও ছোট বৌ উভয়ে একদিন কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, আমি চুপি চুপি শুনিয়াছি। তাহাদের মত যে মেজবাবু ও ছোটবাবু যে টাকা উপার্জ্জন করে তাহা সমস্তই বড়বাবুর হাতে দেয়, তিনি সমস্তই আত্মসাৎ করেন। আগামী বৎসর পূজোর অবকাশে আসিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইবে। তুমি ত আমার কথা শোন না, এখন হ'তে কিছু সঞ্চয় কর, নতুবা ভবিষ্যতে আমাদের অন্ন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।"

নিত্যানন্দ পত্নীর কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, "দেখ বড় বৌ আমার কাছে ৫০০৲ টাকা আছে আমি এই টাকার ভাগ তাদের দেব না ; পৃথক হইয়া এই টাকা খাটাইয়া খাইব।"

অতঃপর কনিষ্ঠদ্বয়কে বঞ্চিত করিবার স্পৃহা নিত্যানন্দের চিত্তে বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন টাকা কয়টী রাখা যায় কোথায়? একবার ভাবিলেন শ্বশুর বাড়ীতে রাখেন, আবার ভাবিলেন যদি সম্বন্ধী মহাশয় অস্বীকার করেন? অবশেষে পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে রাজমহলে ইমাম হোসেন হাজি বেশ ধার্ম্মিক লোক, সম্প্রতি মক্কাসরিফ হইতে হজ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এত ধার্ম্মিক যে অর্থ স্পর্শও করেন না। তাঁর মতে অর্থ ও মাটি দুইই সমান। তাঁহার বাড়ীতেই এই ৫০০৲ গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের শারদীয়া পূজার আর একমাস বাকী আছে। রামানন্দ ও জ্ঞানানন্দের বাটী আসিবার সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ঠিক মহালয়ার দিন নিত্যানন্দ ইমামহোসেন হাজির বাটী গিয়া তাহাকে আভূমি সেলাম দিলেন। হাজি মহাশয় বিনয়ের অবতার, ধার্ম্মিকের মুখপাত, দুই হাতে নিত্যানন্দের সেলামের প্রতিদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ক্যা জনাব, গরীবকা গরীবখানামে আনেকা মৎলব ক্যা হ্যায়"।

নিত্যানন্দ সসম্মানে উত্তর দিলেন—

"হাজি সাহেব, এই টাকা কয়টী আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিবার জন্য আসিয়াছি, আপনার অপেক্ষা বিশ্বস্ত লোক আর নাই, তাই আপনার শরণ লইয়াছি।"

হাজি সাহেব—"আপকা ঘর, আপকা দরওয়াজা, যব খুসি রাখ দিজিয়ে, যব খুশি লে যাইয়ে উসমে ক্যা হ্যায়? হাম তো রোপেয়া ছোতে নেই।"

তারপর হাজি সাহেব নিত্যানন্দকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া একটি কোণ দেখাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ স্বহস্তে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ৫০০৲ টাকা সেই গর্ত্তে পুতিয়া রাখিলেন।

যথাসময়ে রামানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বাটী আসিলেন। তাঁহারা পৃথক হওয়ার কথা কিছুই অবগত নহেন। বড় বৌ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া নিত্যানন্দ পৃথক

হইবার কথা উত্থাপন করিলেন ; ফলে তিন ভ্রাতা তিন ঠাঁই হইলেন। রামানন্দ ও জ্ঞানানন্দ আপন আপন জমি জমা ভাগে পত্তন করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন।

এইবার নিত্যানন্দের গচ্ছিত টাকা ঘরে আনিবার সুযোগ হইল। তিনি হাজি সাহেবের বাড়ী গিয়া পূর্ব্ববৎ সেলাম দিলেন। হাজি সাহেব এবার কিন্তু তাঁহার সেলামের প্রতিদান করা দূরে থাক তাহার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। নিত্যানন্দ গচ্ছিত টাকা লইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবামাত্র হাজি সাহেব ক্রোধে অন্ধ হইয়া—

"ক্যারে বেইমান, কাফের, ইয়া ক্যাবাৎ বোলতা হ্যায়, তেঁই পাগলা হুয়া না ক্যা। হাম তেরা পাশ রুপেয়া কর্জ্জা লিয়া? হামরা কুচ কসতি হ্যায়? দারোয়ান পাগলাকো নিকাল দেও।"

বলিবামাত্র বরকন্দাজ নিত্যানন্দকে অর্দ্ধচন্দ্রদানে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। ভল্লুকের চড় খাইয়া রাজপুত্র যেমন সর্সেমিরা বুলি ধরিয়াছিলেন তেমনি নিত্যানন্দ ধরিলেন,

"হায় মেরি রুপেয়া"

নিত্যানন্দ আর বাটী গেলেন না। কেবল পাগলের ন্যায় "হায় মেরি রুপেয়া" "হায় মেরি রুপেয়া" বলিয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

একদিন নিত্যানন্দ সুশীলা নাম্নী এক সঙ্গীতপন্না বেশ্যার বাটীর সম্মুখ দিয়া চীৎকার করিতে করিতে যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া সুশীলার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। সে তাহার পরিচারিকাকে পাঠাইয়া নিত্যানন্দকে ডাকাইয়া আনাইয়া স্বীয় বাটীতে থাকিতে অনুরোধ করিল। নিত্যানন্দ রাজি হইলে সুশীলা উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা নিত্যানন্দের চিকিৎসা আরম্ভ করিল। কিছু দিন পর নিত্যানন্দ আরোগ্য লাভ করিলেন। আরোগ্য লাভ করিলে পর সুশীলা তাহার শিরোবিকৃতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় নিত্যানন্দ হাজি সাহেবের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিবার কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। সুশীলা ব্রাহ্মণকে তাঁহার টাকা আদায় করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল এবং আগামী সোমবার হাজি সাহেবের বাটীতে টাকার তাগাদা যাইতে বলিল। ৫০০ টাকার পরিবর্ত্তে ১০০০ টাকার দাবি করিতে পরামর্শ দিল। রবিবার অতি প্রত্যুষে সুশীলা মুসলমানি পোষাক পরিয়া মোগলানী সাজিয়া হাজি সাহেবের বাটীতে গমন করিল। হাজি সাহেব তখন ফজিলের নামাজ শেষ করিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। মোগলানীবেশিনী সুশীলা হাজি সাহেবকে সেলাম করিবামাত্র হাজি সাহেব আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"বেগম সাহেব! ক্যাবাস্তে গরীবকা আস্তানামে আয়া?" সুশীলা— "হাজি সাহেব, হামরা একঠো লেড়কা থা। উসকো নাম থা ছুন্নু। বরষ রোজ গুজার গিয়া হামরা ছুন্নু কাঁহা চলা গেয়া। হামরা থোরা বহুত রুপেয়া হ্যায়। লেড়কা তো কাঁহা চলা গেয়া হামরা রুপেয়া কোন খায়ে গা? হাম

মতলব কিয়া মক্কাসরিফ যাঙ্গে? সোই বাস্তে রুপেয়া ১০০০০ হাজার আপকা পাস মজুত রাখেঙ্গে।"

হাজি সাহেব—"বেগম সাহেব, আপকা ঘর, আপকা দরওয়াজা, যব খুশি রাখিয়ে, যব খুশি লে যাইয়ে। উসমে ক্যা হ্যায়? হামতো রুপেয়া ছোতে নেই"। সুশীলা আগামীকল্য সোমবার টাকা লইয়া আসিবে এইকথা হাজি সাহেবকে জানাইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরদিন প্রত্যুষে নিত্যানন্দ হাজি সাহেবের বাটীতে আসিয়া আপনার গচ্ছিত ৫০০ টাকার পরিবর্ত্তে ১০০০ টাকা চাহিলেন। হাজি সাহেব নিত্যানন্দকে তাড়াইবার অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু সুশীলার পরামর্শ মত নিত্যানন্দ নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলেন। এমন সময় হাজি সাহেবের জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিলেন "বেগম সাহেব রোপেয়া লেকে আতা হ্যায়।" হাজি সাহেব দেখিলেন যে এসময় যদি নিত্যানন্দ ১০০০র জন্য গোলমাল করে তাহা হইলে বেগম সাহেব বিশ্বাস করিয়া ১০০০০ টাকা জমা রাখিবে না সুতরাং থোক টাকা হাত হইতে চলিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দকে ১০০০ মিটাইয়া দিলেন ও তাঁহাকে বাটী হইতে বিদায় করিলেন। বেগম সাহেব হাজি সাহেবের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাহার টাকা গাড়ীতে আসিতেছে বলিলেন।

হাজি সাহেব ও সুশীলা বারান্দায় বসিয়া টাকার গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সুশীলার জনৈক পরিচারিকা আসিয়া বলিল:—

"বেগম সাহেব ছুন্নু আয়া"।

বেগম সাহেব হাজি সাহেবকে পুত্রের আগমন বার্ত্তা জানাইলেন ও টাকা রাখিবেন না তাহাও জানাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া নিম্নলিখিত গান গাহিলেন ও নাচিতে লাগিলেন:—

বেগম—মেরা ছুন্নু আয়া, মেরা ছুন্নু আয়া। নিত্যানন্দ অদূরে অবস্থান করিতেছিলেন তিনিও আসিয়া নৃত্য ও গান আরম্ভ করিলেন।

মেরা রোপেয়া মিলা, মেরা রোপেয়া মিলা। হাজি সাহেবও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া নাচিতে লাগিলেন ও গান ধরিলেন:

মেরা আক্কেল গুড়ুম, মেরা আক্কেল গুড়ুম। সুশীলা—আর হুয়া মালুম, আর হুয়া মালুম। বেইমানকো করে খোদা এইসা জুলুম॥

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।
বয়ো গতে কিং বণিতা বিলাসঃ।

ইং ১৩ই অক্টোবর ১৯১৫,
১৩২২ সাল ২৬শে আশ্বিন—২য় বর্ষ—২১শ সংখ্যা॥

হালিশহরের মদনমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় মা জগদম্বার অনুগ্রহে যাটের বাছা দুস্মনের মুখে ছাই দিয়ে সবে মাত্র ষাট বছরে পদার্পণ করিয়াছেন। মুখুয্যে মহাশয়ের পত্নী স্থানে যম; তাই তিনি এই অল্প বয়সের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে তিনটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনজনই হাতে শাঁখা সিঁথের সিন্দুর লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য তিনি গত বৈশাখে আর

একটী যুবতীর করে শাস্ত্রানুসারে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার জীবন পুরাণের চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন। মুখুয্যে মহাশয়ের এই নব পরিণীতা পত্নীর নাম "দশমহাবিদ্যা"। দশমহাবিদ্যার এই নামের বেশ সার্থকতা আছে। তিনি কালীর মত প্রচণ্ডা, তারার মত পতি বক্ষে দণ্ডায়মানা হইতেও কুণ্ঠিতা নহেন, ষোড়শী তো বটেনই। সম্প্রতি এই পূজার সময় বিলাস দ্রব্যাদি পছন্দসই না হইলে ছিন্নমস্তা হইতেও উদ্যতা। মুখুয্যে মহাশয় এই ষোড়শীর সেবা করিয়া একাধারে দশমহাবিদ্যা আরাধনার ফল প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। দেবীর সন্তোষের নিমিত্ত এই বয়সে পরণে কালা ফিতে ধুতি, গায়ে রেশমী কোট, পায়ে পামসু ইত্যাদি ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিয়াছেন।

মুখুয্যে মহাশয়ের শিরোদেশ যদি কোনও জমিদারের জমিদারীর সামিল হইত তাহা হইলে আমীন বাবু জরিপ করিলে তাহার ।৵০ ছয় আনা রকম আবাদী ও ।।৵০ দশ আনা রকম অনাবাদী বলিয়া সেরেস্তার লেখা যাইত। আমরা আন্দাজে স্থির করিয়াছি তাঁহার মস্তকের এক তৃতীয়াংশ শুভ্র কেশ বিরাজমান। অধুনা তাহাতে কলপ ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে। মুখুয্যে মহাশয়ের শত্রুরা বলে যে তাহার মাথায় টাক পড়িয়াছে ; কেহ কেহ বলে কিস্তি হইয়াছে। আগে গোঁফ কামাইতেন বলিয়া একদিন তাঁহার ষোড়শী ভার্য্যা তাঁহাকে ঘসা পয়সা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। তদবধি মদনের বদনে শ্বেত গুম্ফরাজি অবাধে অক্ষত শরীরে বসবাস করিতে স্বত্ববান হইয়াছে।

বেশবিন্যাস ও পোষাক পরিচ্ছদে গিলটি হইয়া মুখুয্যে মহাশয় এখন কেমিক্যাল যুবক সাজিয়াছেন। মদন মোহনের অহিতাকাঙ্ক্ষী দল ভিন্ন কেহ তাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া অনুমান করিতে পারে না।

এই শারদীয়া মহাপূজার সময় মদনের আরাধ্যা ষোড়শীর সহস্রোপচারে পূজার ব্যবস্থা হইলে তবে দেবী প্রসন্না হইবেন, মদনের প্রতি এইরূপ দৈবাদেশ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মদনের আয়োজনের ত্রুটি নাই ; গত ছয়মাস ধরিয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার সংগৃহীত সমস্ত দ্রব্যই নিখুঁত বলিয়া দেবী মঞ্জুর (approve) করিয়াছেন, কেবল একগাছা কণ্ঠাভরণ সুবর্ণ-মালা অপছন্দ হইয়াছে।

মুখুয্যে মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর গর্ভসম্ভূতা বিমলা নাম্নী একটি বিধবা কন্যা গত ভাদ্র মাসে বিধবা হইয়া পঞ্চম বর্ষীয় একমাত্র শিশুপুত্রকে লইয়া পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছে। "মা মরলে বাপ তাহুই" এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিমলা তাহুই গৃহেই বাস করিতেছে বলিতে হইবে। বিমলার স্বামীর অবস্হা খুব ভাল ছিল। বিমলা বিধবা হইয়া স্বামীর প্রদত্ত বহুমূল্যের অলঙ্কার লইয়া পিতার আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাহার একগাছা বিনেদবেণী হার আছে। বিমাতা সেই হার দেখিয়া উহা লইবার জন্য মদনের প্রতি আদেশ করিয়াছেন।

মদন বিধবা কন্যার নিকট এই প্রস্তাব করিতে না পারিয়া স্বর্ণকার দ্বারা বিমলার হারের অনুরূপ আর একগাছা তৈয়ার করাইয়া দশমহাবিদ্যার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দায়রা কেসের আসামীর মত সভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, "প্রেয়সী! দেখ বিমলার হার চেয়ে ওজনে তিন ভরি বেশী আছে, পছন্দ হবে ত? আর হয়রান করনা, আর কত দৌড়াদৌড়ি করিব ?

দেবী পালঙ্ক হইতে না নামিয়াই হাত নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আর আদেশ করিলেন—"বিমলার সেই গাছাই চাই। সহজে না দেয় রাত্রিতে বাক্স ভাঙ্গিয়া হস্তগত কর, প্রাতঃকালে গোলমাল হইলে বলিও—চোরে চুরি করিয়াছে।"

মদন এবার বুঝিতে পারিলেন—এ হার চাওয়া নয়, আমার হাড় মাস খাওয়া। মদন রাজী নয় বুঝিয়া ষোড়শী এবার আইন নজীর দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—"দেখ অযোধ্যাপতি দশরথ দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর অনুরোধে জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়াছিলেন, আর তুমি চতুর্থ পক্ষের পত্নীর অনুরোধে অলংকার পরিধানে অনধিকারিণী বিধবাকন্যার একগাছা হার চুরি করিতে পার না? ধিক্ তোমাকে।"

মদনের এবার দিব্য জ্ঞান হইল।

তিনি বলিলেন—"রামচন্দ্রকে বনগমনের অনুমতি দিতে হইবে বলিয়া দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। সেই মূর্চ্ছাই তাঁহার শেষ মূর্চ্ছায় পরিণত হইয়াছিল।

মাতৃহীনা অনাথা বিধবাকন্যা বিমলার হার চুরি করিবার পূর্ব্বে আমারও যেন চিরমূর্চ্ছা হয়। মা জগদম্বা! খুব হয়েছে, আমার কৃতকর্ম্মের ফল খুব ভোগ করেছি! আর কেন? চরণে স্থান দে মা!" এই বলিয়া মদন একেবারে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কোথায় গেলেন, আর কেহ তাঁহার সন্ধান পাইল না। বিমলার শিশু পুত্র মদনের ভাবী উত্তরাধিকারী।

ধনেন বলবান্ লোকঃ ধনাৎ ভবতি পণ্ডিতঃ

৩য় বর্ষ—১৩২৩ সাল—৩য় সংখ্যা ॥

"ভাগ্যবানের বোঝা বাসুদেবে বয়" এ কথাটী অনেকেই জানেন। কেবল মাত্র এক ব্যাপারে নয় সকল ব্যাপারেই এই বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, যে লোকটী একটু লক্ষ্মীমন্ত, তিনি "না না" করিলেও পরিবেষ্টা ও কৃতি তাঁর পাতেই খাদ্য দ্রব্যের চেরী লাগাইবেন। পাড়া গাঁয়ে যার ঘরে দশ মণ ধান চাল আছে, দু পয়সার সংস্থান আছে সেই গাঁয়ের মোড়ল। নিরক্ষর হইলেও লোকে দলিলের মুসাবিদা করিতে তাহার কাছেই যায়। চিকিৎসার "চ" জানে না তবুও জ্বর ইত্যাদি রোগ হইলে লোকে বলে "মোড়ল মশাই একটু হাতখান দেখুন ত" আর মোড়ল মশাইও ভেড়ার দলে বাছুর মোড়ল তিনিই বা 'জানি না'—বলিয়া খাট হইবেন কেন? তিনিও সবজান্তার মত সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ বলিয়া লোক সমক্ষে প্রকাশ করেন। পেটে ডুবুরী নামিলেও 'ক' অক্ষর মিলিবে না তবুও তিনিই গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ। টিপ সই করিয়া বা ঢেরা সই করিয়া সরকারের রিপোর্ট দিয়া থাকলে তাহাই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। বাঁড়ুয্যে মশাই, মুখুয্যে মশাই, ঘোষ মশাই যদিও লেখা পড়া জানেন সে লেখা পড়া লেখা পড়াই নয়—কারণ তাঁহারা সকলেই মণ্ডলজীর বাড়ী ধান ধার করেন, টাকা ধার করেন, তহশীলদারি করেন, কাজেই সকলেই মূর্খ। জানেন ত 'সর্ব্ব শূন্যা দরিদ্রতা' লেখা পড়া জানিলে কি হইবে? সরকার বাহাদুর লেখা পড়া জানা লোক চান কিন্তু যাঁহারা লেখা পড়া জানেন তাঁহারা মণ্ডলজীর পঞ্চায়েতী লইতে সাহস করেন না। রাজ

পুরুষগণ গ্রামে লেখা পড়া জানা লোক খুঁজিতে গেলে সবাই বলে মণ্ডলজীই উপযুক্ত, তাঁর কাছে কেহই কিছু জানে না। কাজেই মণ্ডলজী মূর্খ হইলেও পণ্ডিত। আর লেখা পড়া জানা লোকেরা কেহ কেহ তাঁর অধীনে আদায়কারী হইতে পাইলেই কৃতার্থ। এই ত পাড়াগাঁয়ের দোষ। সহরে এই দোষ নাই বলিয়া সকলের বিশ্বাস। কেননা সেখানে প্রায় সকলেই শিক্ষিত। থানা আছে, পুলিশ আছে, আদালত আছে, কোন বড় লোককে কেহ গ্রাহ্য করে না এই ত জানিতাম। ও বাবা! এ আবার পাড়াগাঁয়ের বেহদ্দ! এখানেও সরস্বতীর বরপুত্রগণ মা লক্ষ্মীর বরপুত্র ধনকুবেরগণের শ্রীচরণের ছুঁচো। ওঠ্ বলিলে ওঠে, বস্ বলিলে বসে। ইহাও কি দারিদ্রতার পীড়নে? না তা ত নয় যাঁহাদের বেশ অন্ন বস্ত্রের সংস্থান আছে তাঁহারাও যে তদবস্থ। তবে পাঁড়াগেয়ে লোকদের দোষ কি দিব? তাহারাও বলিবে 'গ্রামস্য মণ্ডলা রাজা'।

এখন বুঝিলাম পাড়াগাঁও যেমন সহরও তেমনি।

এক ভস্ম আর ছার
দোষ গুণ দিব কার
আমি ম'লে ফুরায় জঞ্জাল।

'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।'

১৩২৩ সাল—৩য় বর্ষ—২৩শ সংখ্যা॥

দিন দিন দেশের অবস্থা যেরূপ হইতেছে, তাহাতে আর কাহারও ঘুমাইয়া থাকা শোভন নহে, কাহারও আর বধির সাজিয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। ভাই বঙ্গবাসী, তুমি তোমার সম্যক্ অবস্থা একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিয়াছ কি? আজ হয়ত তুমি পায়সান্নে উদর পূরণ করিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুগন্ধ তাম্রকূট সেবনে বিভোর হইয়া আছ, আজ হয়ত তুমি তোমার চক্রবৃদ্ধির হিসাবে তন্ময় হইয়া আছ, আজ বাহিরের কোন-কিছু তোমার কর্ণ-কুহরে পেঁৗছিতেছে না; তোমার হৃদয় এমন আনন্দ-রসে রসিয়া আছে যে, অনশন-ক্লিষ্ট দীনের কাতর ক্রন্দন ব্যঙ্গের কশাঘাত সহ্য করিয়া ভগ্ন বক্ষে তোমার সিংহদ্বার দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, তাহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়ত দুই একদিন দেখিয়া থাকিবে।

আর আজ, হে দেশবাসী, হে দীন দরিদ্রের পিতামাতা, একবার দামোদর-অজয়ের বন্যা-প্রপীড়িত হতভাগ্যদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দামোদরের বন্যায় প্রায় ৩০০০ ও অজয়ের বন্যায় প্রায় ২০০০০ গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে! একবার ভাবিয়া দেখ—আজ কত লোক অসহায় অবস্থায় তোমার পানে চাহিয়া আছে। এই ২৩০০০ গৃহের অধিবাসিবৃন্দ অনিমেষ নয়নে তোমার অনুগ্রহের জন্য লালায়িত। এই হতভাগ্যদের একখানি ছবি দেখিবে কি?—পত্রান্তরে প্রকাশ—রামপুরহাটের জনৈক স্বেচ্ছাসেবক স্বীয় সম্প্রদায় সহ নান্নুর অঞ্চলে 'রিলিফ' কার্য্যে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"আমরা যখন বহু কষ্টে গ্রাম-গুলিতে পেঁৗছিলাম, তখন গ্রামে দেখিলাম, কেবল গৃহস্তূপ। কেহ কেহ ভাঙ্গা চালা করিতে ব্যস্ত। আমাদিগকে দেখিয়া লোকেরা 'রক্ষা করগো, অনাহারে

'আর বাঁচি না' বলিয়া আমাদের পায়ে পড়িতে আসিল। গ্রামের অবস্থা দেখিয়া আমাদের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। পরিদর্শন করিয়া দেখিলাম, গ্রামের অবস্থা একান্ত শোচনীয়। লোকে আহারহীন, আবাসহীন দুইই হইয়াছে, তবে শুনিলাম, কোন লোক নষ্ট হয় নাই ; যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল ইহাদের কষ্ট দূর করা আমাদের সাধ্যাতীত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।"

দাও ভাই, এই হতভাগ্যদের মুমূর্ষু দেহে জীবনী সঞ্চার করিয়া দাও। উপায় তোমাদেরই হাতে। একটু মুক্তহস্ত হও ; স্বেচ্ছাসেবকেরা অর্থের প্রত্যাশী হইয়া চাহিয়া আছে। তোমরা তাহাদিগকে অর্থ সংকুলান করিয়া দাও, তাহারা দেহ-পাত করিয়া কর্ম্মে ব্রতী হউক। অধুনা ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, একটা পরার্থপরতার ভাব তাহাদের অন্তরে উদ্দীপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেবক সম্প্রদায় এই ভাব-সম্পদের স্রষ্টা। তাঁহারা তাঁহাদিগকে শোণিতের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত জল করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন, তোমরা তাঁহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য কর।

ভাবিয়া দেখ,—আজ বরিশাল, কাল উড়িষ্যা, পরশ্ব বর্দ্ধমান এইরূপে দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আজ বীরভূম-বর্দ্ধমান তোমাদের নিকটে একমুষ্টি অন্নের আশায় কৃতাঞ্জলিপুটে, দণ্ডায়মান, কাল যে তোমাকে ঐ অবস্থায় দাঁড়াইতে না হইবে, তাহা কে বলিল ? সংসারের নিয়মই ঐরূপ। আজ তুমি হয়ত কমলার বরপুত্র, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্তী হইয়া তোমাকে ঐ দীনের কুটীরে বাস করিতে হইবে, আর সেই পর্ণকুটীরবাসীকে তোমার রত্নসিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। অনুসন্ধান কর--এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। অতএব, বর্দ্ধমান, বীরভূমের বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া হাসিও না। তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বোঝ যে, ঐ উনানে এক দিন তুমিও প্রবেশ করিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইবে।

বঙ্গের ভাগ্য বিধাতা।

১৩২৩ সাল—৩য় বর্ষ—২৯শ সংখ্যা॥

আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার স্থানে লর্ড রোণাল্ডশে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় যে ভাবে এতদিন কার্য্য পরিচালনা করিলেন, তাহাতে দেশবাসী তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিতেছে না। তাঁহার কার্য্যকাল বাড়াইয়া দিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। যাহাতে লর্ড রোণাল্ডশের নিয়োগ না হয়, তজ্জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে শ্রীযুত সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবাসী যে সকল ন্যায্য অধিকারের জন্য রাজানুগ্রহের প্রত্যাশী, ইনি নাকি তাহার বিরুদ্ধভাবের পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের কেরানীকুলের—তথা বাবুবৃন্দের প্রতি ইনি বিশেষ বিরূপ। পত্রান্তরে প্রকাশ, "লর্ড রোণাল্ডশের বাবুবিদ্বেষ তাঁহার রচিত গ্রন্থাদিতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বাবু অর্থে শুধু বাঙ্গালী নয় কিন্তু এ দেশের যে কোন জাতীয় কেরাণী। একখানি গ্রন্থে তিনি

লিখিয়াছেন—রওয়ালপিণ্ডীতে তিনি টঙ্গা ভাড়া করিতে গিয়াছিলেন। টঙ্গায় চড়িয়া কাশ্মীরে যাইবেন। টঙ্গা অফিসের বাবু প্রথমে এত অল্প সময়ের মধ্যে টঙ্গা দিতে অস্বীকার। বাবু জাতিকে লক্ষ্য করিয়া লেখক বলিয়াছেন, তাহারা কোন কাজই সহজে করিতে চায় না। অবশেষে বাবুকে কয়েকটী রজত মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া টঙ্গা পাওয়া গেল। যে ভাষায় তিনি লিখিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক।"

তোরা ঘরের পানে তাকা।

১৩২৩ সাল—৩য় বর্ষ—৩১শ সংখ্যা॥

ভাই বাঙ্গালী, আজ তোমরা এলাহাবাদে ডঙ্কা বাজাইতেছ, বাঁকিপুরে তূর্য্যনিনাদ তুলিতেছ, কলিকাতায় বক্তৃতার ভীম ভৈরব রবে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিতেছ; সবই করিতেছ। কিন্তু কি করিতেছ, একটু বুঝিয়া দেখিয়াছ কি? তোমাদের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি সুশিক্ষিত আছেন, তোমাদের বক্তৃতায় অগ্নুদ্গম হইতে পারে, সব জানি। কিন্তু তোমরা একবার তোমাদের দিগন্ত প্রসারী দৃষ্টিকে একটু সঙ্কুচিত করিয়া একবার তোমার নিজের ঘরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত ভাই! তোমার গৃহশ্রী দ্বন্দ্বের কালিমায় মলিন হইয়া রহিয়াছে। তোমার মাঠ আজ শস্যশূন্য, তোমার বৃক্ষ আজ ফলশূন্য, তোমার তড়াগ আজ বারিবিহীন,—দুরদৃষ্টক্রমে পতিতপাবনী জাহ্নবীও আজি মরুভূমালিনী। তোমার সাধের পল্লী আজ ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তোমার প্রতিবেশী আজ বরপণের করালকবলে নিপতিত! তোমার এই সাধের গৃহখানির প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-বিরোধকলঙ্কিত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সভায় বক্তৃতা করিতে চলিলে; তথায় উচ্চ তানে মহৎ প্রাণে উদার হৃদয়ে বক্তৃতা দিয়া যশোমাল্য-বিভূষিত হইয়া আবার সেই গৃহেই, সেই দ্বন্দ্বের ক্রীড়াভূমিতে ক্রীড়নক হইলে। বেশ! তোমরা যেন থিয়েটারের সাবিত্রী। বারাঙ্গনা সাবিত্রীর অংশ অভিনয় করিয়া বক্তৃতায় দর্শক ও নেতৃবৃন্দকে কাঁদাইয়া, সতীত্বের পূর্ণমাত্রা প্রকটিত করিয়া বাড়ী গেল। বাড়ী গিয়া 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।' তোমরা কি তদ্রূপ সাবিত্রীর অংশ অভিনয় করিতেছ না? এখন কথা এই, যাহাতে ঘরে গিয়াও সাবিত্রী হইয়া থাকিতে পার তাহাই কর। ঘর যে কলুষিত হইয়া রহিয়াছে সেটা যে—

"কফ ভরা রুমালের মত
বাইরে একটু আতর মাখা।"

আপনি না মজিলে,
পরকে কি মজাতে পার?

১৩২৩ সাল—৩য় বর্ষ—৩৪শ সংখ্যা॥

জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন, "তুমি অন্যকে যেরূপ দেখিতে চাও, আগে নিজেকে সেইরূপে পরিণত কর।" কথাটি বড় ঠিক। আজ এই নীতির

অপব্যবহার করিয়া আমরা আমাদিগের সকল সদনুষ্ঠান পণ্ড করিয়া দিতেছি ; পরন্তু সাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া পড়িতেছি। শুনিলাম—গত খ্রীষ্ট মাসের সমিতি মরসুমে কোনও একটি সামাজিক সমিতির অধিবেশনে জনৈক সমাজহিতৈষী বেশ উদারতার (?) পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জনৈক কন্যাদায়গ্রস্ত স্বজাতি স্বীয় দুঃখের কাহিনী বর্ণন করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধারের আবেদন করেন। বলা বাহুল্য, প্রাগুক্ত সমাজহিতৈষী মহোদয়ের একটি অবিবাহিত শিক্ষিত পুত্র বর্ত্তমান। কন্যাদায়গ্রস্তের উদ্দেশ্য—উক্ত পাত্রটির সহিত বিনা পণে স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু সমাজহিতৈষী মহোদয় "দাঁও" পাইয়া পুত্রের 'সরকারী ডাক' কয়েক হাজার টাকা হাঁকিয়া বসিলেন। (কন্যাদায়গ্রস্ত বেচারী নাকি অধিবেশনে এই ঘটনাটি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনেকে বাধা দেওয়ায় তাঁহাকে উক্ত প্রসঙ্গ বর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।) এই ত আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা! এই জল্লাদের প্রাণ লইয়া আমরা সমাজের নেতা সাজিতে বসিয়াছি!

একটা ভীষণ ভণ্ডামীতে আমাদের দেশ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নির্লিপ্ত থাকা বরং ভাল, কিন্তু ভণ্ডামী বড় ভয়ংকর—বড় অমঙ্গলজনক। এইরূপ ভণ্ডামীতে আমাদের সমাজ ক্রমশঃ শ্মশানে পরিণত হইতেছে। যদি সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, যদি মুমূর্ষু সমাজকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিতে চাও,—উন্মুক্ত প্রাণে সকলের সম্মুখে উপস্থিত হও। ভণ্ডামির মুখোস দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাধারণের নিকট স্বরূপ প্রকাশ কর। যদি তোমার সে রূপ কদাকার হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার জন্য যত্নপরায়ণ হও। "ভাবের ঘরে চুরি করিও না।" মনে রাখিও—যাহা সত্য, তাহা নিত্য, শাশ্বত সনাতন। তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। মিথ্যা কোন কালে কখনও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। যে দিন সত্য-সবিতা পূর্ব্বাশারে সমুদিত হইবে, সে দিন তোমার ভণ্ডামীর কুহেলী পলাইবার পথ পাইবে না। তাহার অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তি ভীম প্রভঞ্জন বেগে তোমায় মিথ্যার আপাত-সুরম্য সৌধকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া তথায় আপনার দেব-মন্দির নির্ম্মাণ করিবে। সত্যের এত শক্তি। অতএব, হে সমাজহিতৈষী নেতৃবৃন্দ, একবার সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সত্য ও প্রেমে নিজেকে ডুবাইতে না পারিলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না,—পরকে আপন করা যায় না। তোতাপাখীর কৃষ্ণনামের মত বক্তৃতায় কোনও ফলোদয় হইবে না। সত্যের সারে কর্ম্মের বীজ বপন করুন, প্রেমের বারিসেকে অচিরাৎ তাহা অঙ্কুরিত হইবে। দেখিবেন, তাহাতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কালে এক বিশাল মহা-মহীরুহে পরিণত হইবে।

বাবুগিরি কি ঝকমারি।

১৩২৩ সাল—৩য় বর্ষ—৩৯শ সংখ্যা ॥

যিনি খান ভাল, পরেন ভাল, রাতদিন ফ্যাসানে ও বিলাসে মত্ত থাকেন আমরা তাঁহাকেই বাবু বলি। যাঁহাদের দুপয়সার সংস্থান আছে তাঁহাদের বাবুগিরি বরং সাজে। কিন্তু পয়সা হীনের বাবুগিরি এক প্রকার ব্যাধি বলিলেই

হয়। এই ব্যাধি এতই সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে, যে ইহা ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত স্বীয় প্রকোপ বিস্তার করিয়াছে। ফলে দেশে আসল বাবুর অপেক্ষা নকল বাবুর সংখ্যাই অধিক হইয়াছে। দিনান্তে কায়ক্লেশে সঞ্চিত শক্তু মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া একটী পান মুখে দিয়া পোলাও কালিয়ার উদ্‌গার তোলা অনেকেরই স্বভাব সিদ্ধ হইয়াছে।

এই কৃত ব্যাধির জন্য লোকের অভাব এত বৃদ্ধি হইয়াছে, যে সে অভাব পূরণ করা অসম্ভব। পূর্ব্বে সাধারণ গৃহস্থেরা মোটা ভাত মোটা কাপড়" পাইলেই সন্তোষলাভ করিত, এক্ষণে কেহই স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। সকলেই গতানুগতিক। কাজেই কৃষকগণ চাষ কার্য্যকে হেয় জ্ঞান করিয়া কিসে বাবুর দলে মিশিবে, কিসে বাবু আখ্যা পাইবে, এই জন্য ব্যস্ত। স্বীয় পুত্রকে আর চাষ কাজ করিতে না দিয়া "যেমন তেমন চাকরী ঘি ভাত" বলিয়া গোলামীকে গৌরবের কার্য্য মনে করিয়া চাকরীর জন্য দ্বারে ফিরিতেছে।

শিল্পী ও কারিকরগণ আর কারখানায় কাজ শিখিতে নারাজ, কেননা তাহা হইলে হয় "মিস্ত্রী" না হয় "কারিকর" বলিয়া ডাকিবে কেহ বাবু বলিবে না। সেই জন্য চাকুরীকেই তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় জানিয়া ১০।১৫ টাকায় চাকুরীর জন্য লালায়িত।

বাঙ্গালীর এই বাবুগিরি ব্যাধিই দেশীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের অভাবের অন্যতম কারণ। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে ভাত ও কাপড় সর্ব্বপ্রধান। কৃষকগণের কৃষি কর্ম্মে ঔদাসীন্যে অন্নের অভাব হইয়াছে। আর বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায় সম্প্রদায়ের স্বীয় ব্যবসায়ে বীত শ্রদ্ধার জন্য বিদেশ জাত বস্ত্র ভিন্ন আর আমাদের গত্যন্তর নাই।

বস্ত্রের অভাব জন্য যে কেবল তন্তুবায়গণ একাই দায়ী তাহা নহে। দেশীয় মোটা বস্ত্রের উপর সাধারণেরও বড় একটা রুচি নাই। বিদেশজাত সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ফেলিয়া স্বদেশী মোটা কাপড় ব্যবহার করিয়া অসভ্যতার প্রশ্রয় দান যেন লোকে মহাপাপ বলিয়া মনে করে।

যদিবা অভাবের তাড়নায় কর্ত্তাদের মোটা কাপড়ে আস্থা জন্মে, কিন্তু গিন্নিরা তাঁতির সুতী কাপড় দেখিলেই মুখ বাঁকান, কাজেই বাধ্য হইয়া স্বদেশী বস্ত্র বর্জ্জন কর্ত্তাদের Compulsory হইয়াছে।

এখন যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য বিদেশীয় মাল আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়াছে। বিদেশী দ্রব্যের দর আগুন। যদি ঠেকিয়া লোকের আক্কেল হয়।

'নাই মামা চেয়ে কাণা মামা ভাল' বিবেচনায় বিদেশী মোটা মালের উপর শ্রদ্ধা জন্মে তবেই মঙ্গল! নচেৎ আসল বাবুর সহিত পাল্লা দিতে গিয়া নকল বাবুদের প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিবে।

আর যদি দেশীয় কৃষি ও শিল্পের প্রতি একটু আস্থা স্থাপন করিয়া মোটা ভাত মোটা কাপড়েই সন্তোষলাভ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের কিসের দুঃখ ?

দেশ জুড়ে ভিখারী হ'লে ভিক্ষা দিবে কে ?

১৩২৩ সাল—৩য় বর্ষ—৪৩শ সংখ্যা॥

প্রাচীন ভারতে জাতি বিভাগ অনুসারে কর্ম্মের বিভাগ ছিল। এক এক

সম্প্রদায়ের লোক এক এক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। সেই জন্য বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রত্যেক বিষয়েই ভারত উন্নত হইয়াছিল। কোন সম্প্রদায়ই অন্নাভাব বোধ করিত না। এক্ষণে কতকগুলি কর্মে দেশবাসীর ঝোক পড়িয়াছে। স্ববৃত্তিকে হেয় জ্ঞান করিয়া শ্ববৃত্তিকে লোকে সাদরে বরণ করিয়া সুধাভ্রমে বিষ পান করিতেছে। আজকাল স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিবার স্পৃহা যদিও বলবতী হইয়াছে তথাপি লোকে স্ববৃত্তির আদর শিখে নাই।

স্বাধীন ব্যবসার মধ্যে ওকালতী, চিকিৎসা দোকানদারী প্রভৃতি কয়েকটী ব্যবসায় অধিকাংশ লোকেই পছন্দ করিয়া তাহাই জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। ফলে মক্কেল অপেক্ষা উকীলের সংখ্যা, রোগী অপেক্ষা চিকিৎসকের সংখ্যা, ক্রেতা অপেক্ষা দোকানদারের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই পেট ভরিয়া অন্ন পাওয়া দায় হইয়াছে।

ধানটেক সোণা পালটেক সেঁকড়া হইলে যাহা হয় তাহাই হইতেছে।

যতদিন শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষি ও শিল্পকে হেয় কর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করিবে, যতদিন আফিসের কর্মকে উপাস্য বলিয়া জ্ঞান করিবে ততদিন অন্ন সংস্থান হওয়া সুকঠিন।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি

ইং ২৬শে এপ্রিল ১৯১৬

১৩২৩ সাল ১৩ই বৈশাখ—২য় বর্ষ—৪৬শ সংখ্যা ॥

অদ্য বেলা ৮টার সময় জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যগণের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় ১৮জন কমিশনারই উপস্থিত হইয়াছিলেন, চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পুনর্নির্ব্বাচন হইবে কিনা তাহাই এই সভায় আলোচ্য বিষয়। অনেক তর্ক বিতর্কের পর অধিক সংখ্যক সদস্যের মতে ছানি ইলেকশন্ করিতে হইবে ইহাই স্থির হইল।

সভা মধ্যে বাৎসল্য ভাব। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর সভার জনৈক সদস্য অন্যান্য সদস্যগণের অনেককেই 'তুমি' 'তুমি' সম্বোধন করিতেছিলেন তাহাতে আমরা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। বাহিরে লঘু গুরু ধনী নির্ধন তারতম্য থাকিলেও সভাস্থলে সকলেই সমান মর্যাদা সম্পন্ন, কেননা সকলেই ত কমিশনার ? একটি দৃষ্টান্তও দিতেছি প্রবীণ উকিলবাবু ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পর্কে যুবক উকিলবাবু নলিনাক্ষ ভারতী মহাশয়ের খুড়ো হন। বাড়ীতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতী মহাশয়কে 'তুমি' এমন কি 'তুই' সম্বোধন করিয়া থাকেন কিন্তু সভাস্থলে তিনিও নলিনাক্ষ বাবুকে আপনি সম্বোধন করিতেছিলেন। আর পূর্ব্বোক্ত সদস্য মহাশয় যুবক সদস্যগণের কথা দূরে থাক বৃদ্ধ সদস্যগণের প্রতিও সেই 'তুমি' সর্ব্বনাম প্রয়োগ করিতেছিলেন। আমরা অন্যান্য সদস্যগণের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও মহত্ত্বের প্রশংসা করি কেননা তাহার 'তুমি' সম্বোধনে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি 'পড়াবি ত পড়া পো না পড়াবি সভার থো'। কিন্তু এই মিউনিসিপ্যাল সভায় অনেক অনেক শিখিবার জিনিস আছে তবে "তুমি" টুকু বাদ দিয়া।

নিজেরে কেবলই করি অপমান

১৩২৩ সাল—৩য় বর্ষ—৪৮শ সংখ্যা ॥

'উন্নত হইবে যদি নত হও আগে।' কথাটি আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে আমরা অনেকেই শিখি নাই। নত হইলে উন্নত হওয়া যায় এ বিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই। সেই কারণে আমরা বাল্যাবধি "হামসে দিগর নাস্তি" এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সর্ব্বদা নিজের প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত হইয়া থাকি। ফলে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" হইয়া পড়ি। চড়ুই হইয়া খঞ্জনের চালে চলি। নিজের সমকক্ষ, স্বজাতি বা স্বশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত মিলিতে মিশিতে ঘৃণা বোধ করি। উচ্চতর শ্রেণী ও উচ্চতর পদের লোকের সহিত মিলিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি। ক্ষমতার অতিরিক্ত হইলেও উচ্চতর শ্রেণীর হাব ভাব, উচ্চ শ্রেণীর চাল চলন, উচ্চ শ্রেণীর মেজাজ এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি। তাঁহারা যে আমার মত লোকের সহিত মিলিতে ঘৃণা বোধ করেন, তাহা অনুভব করিবার ক্ষমতা তখন থাকে না। আবার সমশ্রেণীর লোকেরাও অহঙ্কার ও দুরাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলেই তখন পর হইয়া যায়। যশঃ প্রার্থী হইয়া ক্রমশঃ অযশ অর্জ্জনই অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। সম্মান লাভ করিতে গিয়া পদে পদে অপমানিত হই। ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বন্ধু জ্ঞানে তাঁহার সহিত আত্মীয়তা করিতে গিয়া তাঁহার দ্বারী, প্রহরী ও কর্ম্মচারীবর্গের নিকট অপমানিত হই। সম্মান লাভ করিব বলিয়া যেখানেই গিয়া প্রভুত্ব বিস্তারে চেষ্টা করি সেই স্থানে অপমান কালিমা মুখে মাখিয়া প্রত্যাগত হই। ইহার কারণ কি তাহা বেশ করিয়া ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, নিজের ওজন বুঝিয়া চলিতে না জানাই ইহার কারণ। "নির্গুণে সাপের কুলো পানা চক্র'ই এই অপমানের কারণ। গুণী লোক যতই নত হউন না কেন সাধারণে তাঁহার গুণ উপলব্ধি করিবেই করিবে তিনি যতই নিম্ন স্থানে অবস্থিত করুন না কেন লোকে তাঁহাকে মাথায় করিয়া তুলিয়া উচ্চ স্থানে স্থাপন করিবে। পণ্ডিতেরা বলেন—

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ
শুষ্ক কাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চাভিদ্যতে ন চ নম্যতে।

নত হওয়া গুণী লোকের অন্যতম লক্ষণ। আজ কাল আমাদের অন্যান্য অভাবের মধ্যে বিনয়ের অভাবও পরিলক্ষিত হইতেছে। এই বিনয় গুণ হারাইয়াই আমরা পদে অপমানিত হইতেছি।

মাতৃহারা হনুমান শিশু ও বৎসহারা ছাগী।

১৩২৪ সাল—৪র্থ বর্ষ—৫ম সংখ্যা ॥

রঘুনাথগঞ্জের ধর্ম্মদাস বৈরাগী নামক একটী বালক একটী হনুমানের বাচ্চা কুড়াইয়া পাইয়াছে। বাচ্চাটীর মাতা মরিয়া গিয়াছিল বলিয়া সে নিরাশ্রয়

অবস্থায় ছিল। ধর্ম্মদাসের একটী ছাগী আছে কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার বৎসগুলি মারা পড়ে। ধর্ম্মদাস হনুমানের বাচ্চাটিকে লইয়া আসিয়া ছাগীর বাঁটে মুখ দিয়া দুধ টানিয়া খাওয়া অভ্যাস করাইয়াছে। এক্ষণে ছাগীটী হনুমান শিশুকে দুধ দিতে কোনও আপত্তি করে না। হনু শিশুটীও ছাগীর পিঠে চড়িয়া বেড়ায় এবং ক্ষুধা পাইলেই তাহার বাঁটে মুখ দিয়া দুগ্ধ পান করে। কোন রমণীর সন্তান মরিয়া গেলে অন্য মাতৃহীন শিশুকে আপনার করিয়া স্তন্য দানে প্রতিপালন করিতেছে এরূপ ঘটনা কিন্তু বিরল। এ ব্যাপারে মানুষ অপেক্ষা পশু যেন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

পল্লী-জীবের দশা।

১৩২৫ সাল—৫ম বর্ষ—২৫শ সংখ্যা ॥

পল্লীগ্রামগুলি বুঝিবা জনশূন্য হয়। এমন পল্লী নাই যাহার অধিবাসী-বর্গ সুস্থদেহে দিন যাপন করিতেছে। অধিকাংশ পল্লীতেই প্রত্যেক ব্যক্তিই রোগের যন্ত্রণায় "ত্রাহি ত্রাহি" করিতেছে। কে কাহাকে দেখিবে, সকলের অবস্থাই সমান। আজকাল এক একটি গ্রামে শতাধিক ও কোথাও দ্বিশতাধিক লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। হিন্দুর শবদেহের সৎকার করার ও মুসলমানের শবের গোর দিবার লোক পাওয়া যায় না। কোন কোন গ্রামে গোগাড়ী বোঝাই করিয়া মৃতদেহ বহন করা হইতেছে। এক এক গৃহস্থের বাড়ী উজাড়। কেহ জীবিত নাই। মির্জাপুর থানার মুনিগ্রামের দশাই এইরূপ।

আমাদের জঙ্গিপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট কয়েকখানি গ্রামে সরকার হইতে ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন কিন্তু ক'খানি গ্রামের জন্য এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে? এত ডাক্তারই বা কোথা পাওয়া যাইবে। ডাকঘরের কুইনাইন তাও পাওয়া যায় না। আবার অনেক গ্রামে ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জার উপর আবার কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। গেল, পল্লী উৎসন্নে গেল। বাঙ্গালার জীবনস্বরূপ পল্লীবাসী কৃষককুল বুঝি নির্ম্মূল হয়!

হলো কি!

১৩২৫ সাল—৫ম বর্ষ—২৫শ সংখ্যা ॥

মনে হইত একটু শীত পড়িলেই বোধ হয় রোগ ব্যাধি কমিবে। কিন্তু না কমিয়া এক্ষণে বরং আরও মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এক একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে দৈনিক ১৬।১৭ জন মরিলে তাহা জন শূন্য হইতে ক'দিন লাগিবে? আমাদের জঙ্গিপুরের নিকটবর্ত্তী হিলোড়া, বংশবাটী বাড়ালা প্রভৃতি গ্রামে হিন্দুর শবের সৎকার ও মুসলমান শবের কবর দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কে মড়া বহিবে? কে কবর খুঁড়িবে? সকলেই যে পীড়িত। হিন্দুর সমস্ত শব আর গঙ্গাতীরে আসে না, গ্রামের প্রান্তে আস্ত ফেলিয়া দিতে হইতেছে। শৃগাল, কুকুর, শকুনিরও মরায় অরুচি হইয়াছে।

রোগীর সেবার জন্য গ্রামান্তর হইতে আত্মীয় স্বজন আর আসে না। কেননা অনেক ক্ষেত্রে রোগীর অগ্রেই শুশ্রূষাকারী বা শুশ্রূষাকারিণী ২/১ দিনের জ্বরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, এক সঙ্গেই মহাযাত্রা করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ দুই এক স্থলে চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন বটে কিন্তু অত চিকিৎসক পাইবেন কোথায় ? এক এক গ্রামে কেবল মাত্র রোগীর নাড়ী দেখিতেই একজন ডাক্তারের একদিন কাটিয়া যায়। চাউলও টাকায় ৬/৭ সের হইয়াছে। এখন কেবল ভরসা—"ন দেবো সৃষ্টি নাশকঃ"।

ব্যাধি কোথায় ?

১৩২৫ সাল—৫ম বর্ষ—৩৫শ সংখ্যা ॥

আজ আমাদের দেশ কোন্ স্তরে উপনীত, তাহা সকলেরই চিন্তা করিবার বিষয় হইয়াছে। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পর হইতে দেশে একটা জাগরণ ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আমাদের নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুলের জন্য দাবি করিতেছেন। আমাদের মহিমান্বিত সম্রাট বাহাদুরও আমাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন নাই। এই আন্দোলনের ফলে, আমাদিগের ভাঙ্গা দেশ জোড়া লাগিয়াছে, ফ্রান্সে ও মেসোপোটেমিয়ায় প্রবাহিত ক্ষাত্র-শোণিত আমাদিগের কলঙ্ক-কালিমা ধৌত করিয়া দিয়াছে, ভবিষ্যৎ দান-লীলার গৌরচন্দ্রিকা-স্বরূপ রিফর্ম স্কীমের কলতানও আমরা শুনিতে পাইতেছি, অপমানিত ও বিজিত বলিয়া আমাদিগের যে অভিমান ছিল, সার সত্যেন্দ্র প্রসন্নের "লর্ডত্ব" তাহা মধুর স্পর্শে মুছিয়া দিয়াছে।

কিন্তু হে বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ ! তোমাদিগের মহতী দৃষ্টি কেবল উন্নতির শিখর দেশে নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। শিখরকে যদি উত্তুঙ্গ ও অত্যুজ্জ্বল দেখিতে চাও, তাহা হইলে নিম্নস্তরটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুন্দর কর। ভিত্তি দৃঢ় না হইলে তোমার সাধের সৌধ ঝটিকার একটি হিল্লোলের ভারও সহ্য করিতে পারিবে না। তোমাদিগের পল্লীজীবন বর্ত্তমানে সহরের সুসভ্য-সমীরণ স্পর্শে অতীতের অসভ্যতা দূর করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ—এই পল্লীজীবনই তোমাদিগের বিরাট জাতীয় জীবনের ভিত্তি। মহামারী, জল-প্লাবন ও দুর্ভিক্ষে পল্লীজীবন ক্ষণভঙ্গুর হইয়া "শেষের সে দিন"গুলি স্মরণ করিতেছে। বৎসরের পর বৎসর এই মহাপ্রলয় যেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে বুঝি বা পল্লীবাসী জীবন শূন্য হইয়া পড়ে। বুঝি বা হোমরুল-পতাকা ধারণ করিবার শক্তিটুকুও তাঁহাদিগের রোগজর্জ্জর অনশনক্লিষ্ট বাহু-যুগল হইতে অন্তর্হিত হয়।

স্বায়ত্তশাসন প্রত্যেক মানুষেরই প্রাপ্য ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কলরবে দিনাতিপাত করিলে বিশেষ কোনই সুফল প্রসূত হইবে না। যদি দেশকে উন্নত করিতে চাও, যদি তোমাদের সকল আশাকে সুফলপ্রসূ করিতে চাও, তাহা হইলে সহরের উচ্চ মঞ্চ হইতে মুমূর্ষু পল্লী-প্রান্তরে অবতরণ কর। দেখিবে—নিরন্ন, নিরক্ষর কঙ্কালসার পল্লীবাসীর প্রেতমূর্ত্তি তোমাদিগের নয়নদ্বয়কে অশ্রুপ্লাবিত করিবে ; তাহাদিগের অরন্তুদ

মন্ত্রণার করুণ কাহিনী তোমাদের কর্ণপটহ দীর্ণ করিয়া ফেলিবে। তখন বুঝিবে তোমাদের মূল সূত্র কোথায়!

অতএব, আজ দেশ রক্ষা করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধীর মত দেব-মূর্ত্তিতে দেশময় ছড়াইয়া পড়। দেশের দুর্দ্দশা ঘুচাইয়া দাও,—দেশ শিক্ষার স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ উঠুক। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়া দেশও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হউক।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ স্বত্ব।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম—যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণগ্রস্ত বহু-লোককে ঋণের দায় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ ঋণের দায়ে তাঁহার যাবতীয় অমূল্য গ্রন্থ স্বত্ব প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইল। ঝামাপুকুরের শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় ১৯২০০ টাকাতে তাঁহার গ্রন্থ স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। আবার শুনিতেছি তাঁহার বাটীখানিও বিক্রয় হইবে। এই নীলামে ঁঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি বোধ হয় বিক্রয় হইতে চলিল। এমন বাঙ্গালী নাই যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ঋণী নহেন। তাঁহার স্বর্গীয় আত্মা বোধ হয় সেই ঋণ অনাদায় দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন।

জাপানের পৌষমাস ভারতের সর্ব্বনাশ।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

বিগত যুদ্ধের পরে এক কলিকাতা সহরে গড়ে প্রতি বৎসর ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার জাপানী মাল বিক্রয় হইত। গত ১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলিকাতায় ৬ কোটী ৩ লক্ষ টাকার মাল কাটতি হইয়াছিল গত বৎসর ১১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতের অন্যান্য সহর ত আছেই। আমরা ভারতবাসী পরের প্রস্তুত দ্রব্যাদি লইয়া বাবু সাজিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া গোলামী করা অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছি। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুগুলির জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া ফাঁকা স্বায়ত্তশাসনের জন্য কামড়াকামড়ি করিতেছি।

জঙ্গিপুরের দশা।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ২২শ সংখ্যা

খাদ্য।—আজ পৌষ মাস, নূতন ধান উঠিয়াছে। খাদ্যের মহার্ঘতা এই সময়েই দূরীভূত হইবার কথা। প্রধান খাদ্য চাউল—তারই দর মোটা ৬॥ সাড়ে ছয় সের, সরু, ৫॥ সের। আর আশা নাই। দুর্ম্মূল্যতা বোধ হয় চিরস্থায়ী হইল।

পরিধেয়।—ভদ্রনামধারী ব্যক্তিগণ কায়ক্লেশে কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া চলিতেছেন। গরীব শ্রেণীর লোকেরা জানু, ভানু, কৃশাণুর আশ্রয়ে শীত নিবারণ করিতেছে। একেবারে উলঙ্গ লোক পরিদৃষ্ট না হইলেও অর্দ্ধোলঙ্গ লোক বিরল নহে।

বরপণ প্রথার বিষময় ফল।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওভারসিয়ারী পরীক্ষোত্তীর্ণ উপার্জ্জনশীল কোন ভদ্র বংশীয় যুবক তাঁহার পিতাকে দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার বিবাহে যেন কন্যা পক্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও পণ স্বরূপ গ্রহণ করা না হয়। কারণ বিনাপণে বিবাহ করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিষয়ী পিতা পুত্রের এ প্রস্তাবে মুখে বলিলেন, "হাঁ" কিন্তু গোপনে ব্যবস্থা করিলেন উল্টা। এক স্থানে বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু পিতার চালাকি বিবাহের পূর্ব্বে যুবক বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। পরে জানিতে পারিলেন যে এই উপলক্ষে তাঁহার পিতা, তাঁহার শ্বশুরকে শোষণ বড় কম করেন নাই। ইহাতেই যুবকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে—ফলে তিনি এখন বদ্ধ পাগল।

জঙ্গিপুরে ত্র্যহস্পর্শ।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা

এবার আর মঙ্গল নাই জঙ্গিপুরে সকল ঋতুতেই একটা না একটা ব্যারাম স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকে। আজকাল তিনটী রোগ যুগপৎ স্ব স্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। রোগ তিনটী আবার যা' তা' নয়, নিউমোনিয়া—কলেরা—বসন্ত। যাঁহাদের বাটীতে রোগ ঢুকিয়াছে তাঁহারা ত অস্থির হইয়াছেন, আর যাঁহারা এখনও সুস্থ আছেন তাঁহাদের কি হইবে বলিয়া আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার যোগাড় করিতেছে। জঙ্গিপুর মহুকুমার পল্লীগ্রামগুলির স্বাস্থ্য খুব ভাল না হইলেও সহর অপেক্ষা ভাল বলিতে হইবে। সহরের মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণ একটু অবধান করুন। সহরের পরিষ্কৃতি পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। অদ্য সহরে ডঙ্কা দিতে শুনিলাম—কেহ গঙ্গার জলে ময়লা কাপড় ইত্যাদি কাচিয়া জল অপরিষ্কার করিলে ফৌজদারী সোপরদ্দ হইবে। কিন্তু শ্মশান ঘাটে ঘাটে যে গোটা গোটা মরা পচিতেছে। চোখের সামনে সূচ পালাইতে পারিবে না পিছনে যে হাতী পালাইতেছে!

অভিশপ্ত নগরী।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা

করুণাময় জগদীশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জগতের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জে যে করুণাবর্ষণ করিতেছেন তাহাতে

তাঁহার দয়াময় নামে আমাদের পাপমন কিছু সন্দিগ্ধ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র নগরে যে প্রকার রোগ ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে প্রতি মুহূর্তে ইহার ধ্বংসের আশঙ্কা হইতেছে। এখানে লোকক্ষয়কারী ম্যালেরিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে প্রজা রক্ষার জন্য ডাক্তার বেণ্টলীর ড্রেনেজ স্কীম আরম্ভ করিয়াছেন। এই স্কীমের ফল হইতে না হইতে কাল নিউমোনিয়া সংহার মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। কয়েকটী সঙ্গতিপন্ন পরিবারে এই রোগ প্রবেশ করিয়া অভাবনীয় সংহার আরম্ভ করিয়াছে। লোকে ইহাকে নিউমোনিক প্লেগ নাম দিয়াছে। নিউমনিক প্লেগে মানব তুরন্তলীলা সম্বরণ করে। আর এই প্লেগে ভুগিয়া ভুগিয়া মরিতেছে। কাজেই ধনক্ষয় ও প্রাণক্ষয় এক সঙ্গেই সংঘটিত হইতেছে জানি না কোন অভিসম্পাতে রঘুনাথ-গঞ্জের এরূপ অবস্থা হইল। তাই বলি হে করুণাময় তোমার এ কেমন করুণা? আমরা জানি "ন দেবাঃ সৃষ্টি নাশকাঃ"। তবে কি আমাদের এ বিশ্বাস ভুল?

অসবর্ণ বিবাহ বিলের প্রতিবাদ সভা।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা

গত রবিবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ পাঠশালায় জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্যতম কমিশনার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগে এক সভা আহূত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামতারণ ঘোষাল মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত বিলের প্রতিবাদ করিয়া এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ বাগচী ডাক্তার প্রভৃতি কয়েকজন উক্ত বিলের কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে স্থানীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এবং অন্যান্য অনেক হিন্দু ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন! সভাস্থলে উপস্থিত সকলেই এই বিলের ঘোরতর আপত্তিজনক মত প্রকাশ করেন। সভার মতামত জ্ঞাপন করিয়া উক্ত বিল যাহাতে আইনে পরিণত না হয় তজ্জন্য সরকারের নিকট তার যোগে অনুরোধ করা হইয়াছে। দেখা যাক সরকার কি করেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গাহিয়াছিলেন—

একটা নূতন কিছু কর, একটা নূতন
কিছু কর।

হিন্দু সমাজে এমন একটা আজগুবী নূতন জিনিস প্রবেশ করিয়া স্বর্গীয় কবির ব্যঙ্গ-সঙ্গীত কার্য্যে পরিণত না করে।

অনাবৃষ্টি

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

এবার বৃষ্টি অভাবে সৃষ্টি লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কালবৈশাখী হইয়া অন্যান্য বৎসর বারিপাত হইয়া থাকে। এবারে একেবারে বরুণ দেবের অনুগ্রহে পৃথিবী বঞ্চিত যদিও মেঘ উঠিতেছে, পবন দেবের আবির্ভাবে তাহাও

তিরোহিত হইতেছে। মধ্যে ধূলি ভিজা মত জল হওয়ায় বাগরীর কৃষককুল আশার কুহকে ঘরের ধান মাঠে ফেলিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধান্য আদৌ অঙ্কুরিত হয় নাই। আর যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহাও প্রখর রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া গেল। হৈমন্তিক ধান্যের বীজ বপনের সময় যায় যায় হইয়াছে। শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবী। দেশে হাহাকার উঠিবে।

কাণা কন্যার নানা রোগ।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

১২ই জ্যৈষ্ঠ ইংরাজী ২৬শে মে তারিখের কাগজ ছাপা হইতেই আমাদের ভাঙ্গা যন্ত্রটী আরও ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া ১৯শে ও ২৬শে জ্যৈষ্ঠের জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমাদের দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়াও কাগজ মুদ্রণের কোনও উপায় ছিল না। নূতন যন্ত্র ক্রয় না করিলে আর উপায় নাই। প্রায়ই কসুর হইতেছে।

ভাঙ্গা কপাল কেবল ভাঙ্গে
এইত খেলার প্রহসন।
জ্বলন্তে আগুন দ্বিগুণ জ্বালে
গুণমণি প্রভঞ্জন।

আমাদেরও ভাঙ্গা কপাল প্রায়ই ভাঙ্গিতেছে।
এখন ভরসা কেবল গ্রাহকগণের সহানুভূতি।

আসল ও মেকি।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

প্রেসিডেন্সিবিভাগের কমিশনার মিঃ ব্লাকউড সাহেব তাঁহার গত বারের সফরে বহরমপুর ফেরীঘাটে যে অভিনয় দেখাইয়াছেন তাহা শুনিলে সাহেবকে হাজার সেলাম দিতে ইচ্ছা করে। ব্যাপারটী এই—তিনি যখন নৌকায় উঠিয়া নদীর কিয়দ্দূর আসিয়াছেন সেই সময়ে জনৈক ভদ্রলোকও একজন স্ত্রীলোক ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। যে নৌকায় সাহেব—যে সে সাহেব নহে কমিশনার সাহেব—আছেন সেই নৌকা ফিরাইয়া কালা আদমীকে নৌকায় তুলিয়া লওয়া মাঝির চৌদ্দ পুরুষের সাধ্যাতীত। সাহেব বাহাদুর কিন্তু ভদ্রলোক ও স্ত্রীলোকটীর রৌদ্রে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার কষ্ট অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ মাঝিকে নৌকা ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে তুলিয়া লইবার আদেশ করিলেন। তাঁহারা নৌকায় উঠিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসাইয়া তাঁহার মস্তকে ধৃত ছত্রের ছায়ারও অংশ প্রদান করিয়া প্রকৃত আসল সাহেবের বংশ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আর একটী ঘটনা।

আমাদের বলিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু এক্ষেত্রে বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই ব্যাপারের অভিনেতা একজন স্থানীয় বাঙ্গালী

সাহেব। এ সাহেবের কিম্মত শতাবধি টাকার বটে। হ্যাট একটী হাফপ্যাণ্ট ও কোট ঘরে ২।৩টীর বেশী নাই। যাঁহার বাটীতে মাঝে মাঝে পোড়া পেটের জন্য পাত পাতিতেও হইয়াছে, এমন পরিচিত ভদ্রলোক একটি স্ত্রীলোককে ঠিকাগাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া দিয়া সাহেবী চাল বজায় রাখিয়াছেন। এই সকল মেকী সাহেবের এই সকল আসল সাহেবের ব্যবহার দেখিয়া একটু জ্ঞান সঞ্চার হইবে কি? কি জানি বাঙ্গালী কোট প্যাণ্ট পরিলেই যেন ধরাকে সরার মত জ্ঞান করে।

লাক্ষা ব্যবসায়ে জঙ্গিপুর।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এতদঞ্চলের পল্লীগ্রামে একটী প্রবাদ চলিত আছে যে আজকাল টাকা—

পাটের ছালে
খাসীর খালে
কুলের ডালে।

পাটের ছালে অর্থাৎ পাট আবাদ করিলে, খাসীর খালে অর্থাৎ চামড়ার ব্যবসা করিলে, কুলের ডালে অর্থাৎ লাক্ষা উৎপন্ন করিতে পারিলে বেশ লাভবান হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত দুই দ্রব্যের মূল্য কিছু কমিয়াছে, কিন্তু লাক্ষা বা লাহার দর আজকাল ১২০৲ একশত কুড়ি টাকা মণ। জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ানের বহু ব্যক্তি এই শেষোক্ত দ্রব্যের আবাদ ও ব্যবসা করিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করিতেছে। মেহনতও যে খুব বেশী তা নয়। কুলগাছগুলির ডাল কাটিয়া দিয়া যদি তাহাতে জীবন্ত লাক্ষা কীটযুক্ত কুলের ডাল বাঁধিয়া দিলে কীটগুলি কুলগাছের সমস্ত শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একটি মাঝারী গাছে প্রায় আধমণ পঁচিশ সের হিসাবে লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদঞ্চলের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক কুলগাছেই লাক্ষা আবাদ হইতেছে। ব্যবসায়ীগণ অধিকাংশই মুসলমান। তাহারা বদরী-বৃক্ষ-স্বামীর নিকট সামান্য খাজনায় গাছগুলি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া প্রচুর লাভ পাইতেছে। বলিতে কি এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে অনেক শ্রমজীবী মুসলমান এই ব্যবসায় করিয়া দুর্ম্মূল্যতা অনুভব করিতে পারিতেছে না। মোট কথা লাক্ষাতে এদেশের অনেক অনেক অভাব দূর করিতেছে। এই ব্যবসা ক্রমশঃ হিন্দুগণও আরম্ভ করিয়াছে। দেশের কুলগাছে সকল ব্যবসায়ীর আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে না পারায় এক্ষণে তাহারা রাজসাহী, পাবনা ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় গিয়া কুলগাছ বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া এই ব্যবসা বিস্তার করিতেছে। কিন্তু এই ব্যবসায় প্রসার হইতে না হইতেই দুষ্টবুদ্ধি ব্যবসায়ীগণ লাক্ষার মধ্যে খাদ দিয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার চেষ্টা করিতেছে। লাক্ষার মধ্যে মেশাইতেছে জিউলী গাছের আঁটা ও পুরাতন বাবলা গাছের চটা। ফলে জিউলী আঁটা ও বাবলা চটা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

জঙ্গিপুরের বাজার।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

ছিল একদিন যখন রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরের হাটে ৵০ দুই আনা পয়সা দিলে একটী বড় ইলিশ মৎস্য পাওয়া যাইত, ১৫ পয়সায় ১১ সের পটল মিলিত তা ছাড়া অন্যান্য তরীতরকারী সস্তার চূড়ান্ত ছিল। আজ ইলিশ মাছ দূরের কথা সামান্য চুনো মাছ ৷৵০ আনা সের পটল ১১০ এমন কি ৵০ আনা সের ও কিনিতে হইতেছে। শাক ডাঁটাগুলিও নিক্তির তৌলে ওজন করিয়া বিক্রয় হইতেছে। কায় ক্লেশে দুটী অন্ন যোগাড় করিতে পারিলেও কিসের যোড়ে যে কোঁৎ করিবে তাহার উপায় নাই। অন্নবস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতাই সমস্ত দ্রব্য দুর্ম্মূল্য করিয়া ফেলিল। আর বোধ হয় সে দিন ফিরিয়া আসিবে না।

ষ্টেটস্‌ম্যানের ক্ষতি।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

কলিকাতার চৌরঙ্গী হইতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র ষ্টেটস্‌ম্যানের একটী নাম Friend of India অর্থাৎ 'ভারতবন্ধু'। এই 'ভারতবন্ধু' ভারতবাসীর প্রকৃত বন্ধু পরলোকগত লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাক্ এই স্বর্গীয় মহাত্মার নিন্দাবাদ করিয়াছেন বলিয়া ভারতবাসী মাত্রেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ স্থানে স্থানে সভা করিয়া সকলে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন যে তাঁহারা কেহ উক্ত সংবাদ পত্রের গ্রাহক ও পাঠক হইবে না। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এইরূপ প্রতিজ্ঞা হইয়াছে। যাঁহাকে সকলে ভক্তি করে সে ভক্তি নষ্ট করা গলাবাজি বা কলমবাজির কর্ম্ম নয়।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্য নির্ব্বাচন।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ৫নং ওয়ার্ডের অন্যতম কমিশনার বাবু ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থানে জনৈক কমিশনার নির্ব্বাচনের দিন ছিল গত ২৮শে জুলাই। প্রার্থী ছিলেন দুইজন শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ সেন ও শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা অধিক সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হইয়া কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে একটু আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে, যেহেতু নির্ব্বাচিত ব্যক্তি শিক্ষিত বা ধনাঢ্য নহে। তবে সাধারণের ভৃত্য হইবার যোগ্যতা যদি ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ১৵০ দিলেই হয় তবে তাহাকে অযোগ্য বলা যায় না। করদাতাগণ যাহাকে যোগ্য বিবেচনা করেন তিনিই যোগ্য। শুধু কমিশনার হইলে হয় না দেশের কাজ করিবার প্রবৃত্তি থাকা চাই।

সব বন তুলসী ভাবে সব সে শিলা শালগ্রাম।
সব পানি গঙ্গা ভাবে যব ঘটমে বিরাজে রাম।

দেখা যাক সাহাজীর দ্বারা কি কাজ হয়।

লোকমান্য তিলকের পরলোক।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

ভারতমাতার কপালের উজ্জ্বল তিলক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকুলতিলক লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক গত ৩১শে জুলাই রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় কাল নিউমোনিয়া রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত এই মহাপুরুষের শোকে মুহ্যমান। তিলক মহারাজের তিরোভাব জন্য ভারতমাতার যে অভাব হইল তাহা বোধ হয় আর কখনও পূরণ হইবে না। যীশুখ্রীষ্ট যেমন পাপীর মঙ্গলার্থ ক্রুশে আবদ্ধ হইতে কষ্টবোধ করেন নাই, মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্যদেব যেমন মানবের মঙ্গলার্থ কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন তেমনি এই মহাপুরুষ স্বদেশ ও স্বদেশীর মঙ্গল জন্য অশেষ যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন। আজকালকার দিনে, এই স্বার্থপরতার যুগে এমন নিঃস্বার্থ জন-নায়ক ভারতে আর নাই। ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে এই পরলোকগত মহাত্মার জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। দেবোপম ব্রাহ্মণ! এই পাপপূর্ণ মর্ত্ত্য তোমার যোগ্য আবাস স্থান নহে, তুমি দেবতা, দেবলোকই তোমার আবাস যোগ্য স্থান। ভারতের তিলক মুছিল বটে কিন্তু এ তিলকের চিহ্ন মুছিবার নহে, এ তিলকের দাগ চিরস্থায়ী।

মশক নিধন।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের বড় সাহেব ডাঃ বেণ্টলীর উদ্ভাবিত ড্রেনেজ স্কীমের পরীক্ষাস্থল আমাদের ম্যালেরিয়ার পুরী জঙ্গিপুর। ধৌতি প্রকরণ দ্বারা ম্যালেরিয়ার প্রধান জন্মদাতা মশক কুল ধ্বংস হইয়া ম্যালেরিয়া দূর করাই এই বিজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের উদ্দেশ্য। সরকারও এই নূতন প্রণালী পরীক্ষার্থ জঙ্গিপুরে বহু অর্থ ব্যয় করিলেন। আগামী সপ্তাহেই ডাক্তার বেণ্টলী ও অন্যান্য দু এক জন বিশেষজ্ঞ জঙ্গিপুরে শুভাগমন করিবেন। আমরা তাঁহাদের ড্রেন পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আরও এক বিষয় পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা দয়া করিয়া দেখুন যে তাঁহাদের ড্রেনে সংযোজিত পুকুর ডোবা ভিন্ন শহরে অন্য কারণে মশকোৎপত্তি হইতেছে কি না। মিউনিসিপ্যালিটীর সেস্‌পুলগুলি, স্থানে স্থানে সঞ্চিত আবর্জ্জনা ও অন্যান্য অপরিচ্ছন্নতার জন্য মশক বৃদ্ধি হইতে পারে কি না। নগরের মধ্যে স্বাস্থ্যের হানিকর অন্য কোন কারণ বর্ত্তমান থাকিলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীকে তাহা দূরীকরণ জন্য পরামর্শ দিতে অনুরোধ করি।

রেলের চোর।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যা

রেলগাড়ীতে কোনও মাল চালান দিলে তাহা আস্ত পৌঁছিবেই না। ইহা যেন একটী স্বতঃ সিদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ঘি পাঠাও টিন ফুটাইয়া

লইল, কাপড় পাঠাও গাঁটের উপর অক্ষত রাখিয়া ভিতর হইতে বেমালুম মাল বাহির করিয়া লইবে, ফল ইত্যাদি পাঠাও কেবল ঝুড়িটী গন্তব্যস্থানে পেঁছিয়া প্রেরককে কৃতার্থ করিবে। এ চোর ধরা দুঃসাধ্য। যে ষ্টেশনে মাল বুক করা হইল, তথাকার বাবুরা ভদ্রলোক, যেখানে ছাড় করা যাইবে তথাকার বাবুরাও তাই। রেলের কুলি খালাসীরাও সাধু কেননা তাহারা কোম্পানী চাকর। গার্ড সাহেব তো সাহেব তবে চোর কে? হয় প্রেরক না হয় গৃহীতা। সুতরাং এ চোর ধরা পড়িবে না।

ডালভাত বনাম রোটি।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা

গত ২১ শে অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রিকালে লালগোলায় সত্য সত্যই বীরে বীরে লড়াই হইয়া গিয়াছে। একবীর ভত্তুয়া বাঙ্গালী, অন্য বীর পশ্চিম দেশীয় বিশালবপু জনৈক ঘিউ রোটী খোর পালোয়ান। লালগোলা কৃষ্ণপুরের বিখ্যাত কুস্তিগীর শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় বাজীর টাকা দিয়াছিলেন। জঙ্গিপুরের সবরেজিষ্ট্রার বাবুও লালবাগের মুন্সেফ বাবু এই কুস্তি ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালী বীরটা বাঙ্গালীর সুপরিচিত ব্যায়ামবীর মহেন্দ্রনাথ। পশ্চিমদেশীয় পালোয়ানজীর নাম এখনও শুনা যায় নাই। ৫ মিনিট কুস্তির পরেই মহেন্দ্রনাথ পশ্চিমদেশীয় পালোয়ানকে পরাস্ত করিয়াছেন। এইবারে যখন কোনও দেশোয়ালী ভাই বাঙ্গালীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিবে ঃ—

'ডাল বানাবে ভাত বানাবে
পরবল কা তরকারী
মছ্‌লী মার্ মার্ ভাত বানাবে
অধম জাত বাঙ্গালী ॥'

তখন কিন্তু তাহাদের পাল্টা জবাব দিবার সুযোগ আজ মহেন্দ্রনাথ আমাদিগকে দিয়া গেলেন।

অধিবাসের ঠেলা।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ২২শ সংখ্যা

ফাঁকে ফাঁকে এবার ত গেল। আবার তিন বছর পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমিতির সভ্য পদ প্রার্থী হইব বলিয়া মনে মনে আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে যে এত নির্ব্বাচন নয় নির্ব্বাসন। বাপরে! আমাদের মত লোক খরচও করিতে পারিবে না আর এই দেবদুর্ল্লভ সমিতির সভ্য হইতেও পারিবে না। নির্ব্বাচিত হইয়াও নিস্তার নাই। প্রতিদ্বন্দ্বীদল লাট দরবারের ফটক পর্য্যন্ত তাড়া করিতে ছাড়িবে না। ভোটের ঠেলা, মামলার ঠেলা, সহ্য করিয়া তবে মেম্বর হইতে হইবে। এই নির্ব্বাচন রহস্য দেখিয়া আমার সেই পুরাকালের নাপিত ও ব্যাঘের গল্প মনে হইল। গল্পটী এই—

এক নাপিত একদিন এক বনের মধ্য দিয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিল। বনের মধ্যে এক বাঘ তাহার ঘাড় মটকাইবার জন্য তাহাকে আক্রমণ করিল। নাপিত বাঘকে বিবাহ দিবার প্রলোভন দিয়া বলিল 'দেখ আমাকে মারিও না আমি এক মাসের মধ্যে তোমার বিবাহ দিয়া দিব। বাঘেরও বাঘিনী ছিল না, সে সেই প্রস্তাবে রাজী হইল। তারপর দিন হইতে বাঘটী অলংকার ও টাকা সমেত একজন লোককে দেখিয়া তাহাকে হত্যা করিল। নাপিতের বাড়ীতে সেইগুলি হাজির করিয়া বলিল "দেখ এই গুলি পাত্রী ও বিবাহের খরচের জন্য দিলাম। একমাস পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব যদি বিবাহ না দাও তবে তোমার আন্ডা বাচ্চা সবকে খাইয়া ফেলিব।"

নাপিত টাকা ও গহণা পাইয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইল এবং মনে মনে ফন্দী করিল যে বিবাহ করিতে হইবে না অধিবাসের স্ত্রী আচারেই বাঘকে সাবাড় করিবে। এক মাস পর যখন বাঘ আবার নাপিতের বাড়ী আসিল তখন নাপিত এক প্রকান্ড বস্তা আনিয়া বাঘকে বলিল "এদেশের অধিবাসের স্ত্রী-আচার এইরূপ যে বস্তার মধ্যে বরকে প্রবেশ করিতে হয়।" বাঘ তাহাই করিল। নাপিত তখন বস্তার মুখ খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লাঠির দ্বারা প্রহার আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পর বাঘের নড়ন চড়ন নাই দেখিয়া মৃত জ্ঞানে নিকটস্থ নদীতে বাঘকে বস্তাবন্দী অবস্থায় নিক্ষেপ করিল। স্রোতের বেগে বস্তাটী এক দ্বীপে গিয়া লাগিল। সেই দ্বীপে এক বাঘিনী বাস করিত। বস্তাটির মধ্যে কি নড়িতেছে দেখিয়া সে দন্তের দ্বারা বস্তার মুখ খুলিয়া সেই অর্দ্ধমৃত ব্যাঘ্রকে দেখিতে পাইল। বাঘটী একটু সাব্যস্ত হইয়া বাঘিনীকে দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিল। কয়েকদিন পর সে আবার নাপিতের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং বাঘিনী প্রাপ্তির সংবাদ দিয়া বলিল "ভাই বিবাহ ত হইল কিন্তু অধিবাসের ঠেলা বড় বিষম। সেই ঠেলায় বাঁচিয়াছিলাম বলিয়া পত্নীপ্রাপ্তি রইল নচেৎ অধিবাসেই সব শেষ হইত।" সমিতির আসন প্রাপ্তি সুখের বটে কিন্তু অধিবাস সামলান খুব কঠিন।

ভারত মাতার ছিন্ন অঞ্চল হইতে একটী মহারত্ন হারাইলেন।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩০শ সংখ্যা

গত রবিবার রাত্রি ১টার সময়ে বাঙ্গলার সুসন্তান অদ্বিতীয় দানবীর স্যর রাসবিহারী ঘোষের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পূর্ণ ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

স্যর রাসবিহারী অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পুরুষ। ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। আজ কোন স্থানে তাঁহার মত আর একটী উর্ব্বর মস্তিষ্ক ও উদার হৃদয় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এক উইল করিয়া গিয়াছেন। গত ১লা মার্চ্চ তারিখে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার পর স্যর রাসবিহারী ঘোষের উইল খোলা

হইয়াছে। তিনি কত টাকা মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এত শীঘ্র স্থির করা সম্ভবপর নহে। মোটের উপর তিনি নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়া গিয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আড়াই লক্ষ টাকা, ঐ টাকায় কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়ে ভ্রমণকারী বক্তা নিযুক্ত করা হইবে। তাঁহার নিজ গ্রামের বিদ্যালয়ের জন্য দেড় লক্ষ টাকা ও তাঁহার আইন পুস্তক ভিন্ন আর সমস্ত পুস্তক। তাঁহার গ্রামে শিব প্রতিষ্ঠার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ও জমিদারী সম্পত্তি। তাঁহার কর্ম্মচারী, ভৃত্য আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতিকে যথাযোগ্য দান করিয়া অবশিষ্ট প্রায় দশ লক্ষ টাকা তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে দিয়াছেন।

এমন অদ্ভুত দান এদেশে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। রাসবিহারী বাবু নিজগুণে অপরিমেয় উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এত উপার্জ্জন এদেশে ইংরাজ বা দেশীয় কেহ কখনও করেন নাই। শেষ কয় বৎসর তিনি কলিকাতায় প্রাত্যহিক এক হাজার ও বাহিরে দুই হাজারের কমে কার্য্য করিতেন না। কিন্তু এই যে উপার্জ্জন করিতেন তাহা নিজের জন্য নহে, দেশের জন্য করিতেন, এবং দেশকে দিয়া গিয়াছেন। ধন্য তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতা, ধন্য তাঁহার জীবন এবং ধন্য তাঁহার দান। স্বর্গ হইতে একটী দেবতা পৃথিবীতে নামিয়া দেবোচিত কার্য্য করিয়া পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

দেশের দশা।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩২শ সংখ্যা

খুব গরম পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হইতেছে। ভোর রাত্রির শীত কিন্তু যায় নাই। নিউমোনিয়াও আশে পাশে ঘুরিতেছে। বাগ পাইলে দুই একটী ছোঁ মারিতেছে। বৃষ্টি নাই। ভাদুই ধান্য রপণের সময় যাইতেছে। মধ্যে একদিন একটু বৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু জল অপেক্ষা শিলা বৃষ্টিই বেশী। ইহাতে উপকার ত হয় নাই, বরং আমের দফা রফা করিয়াছে। রাস্তার ধূলিও ভিজে নাই। চাউলের দর ৵৬৸ পোনে সাত সের। সরকার রপ্তানির হুকুম দিয়াছেন কিন্তু রেল কোম্পানি গাড়ী যোগাইতে পারিতেছে না বলিয়া চাউলের দর পোনে সাত সের আছে নচেৎ পাঁচ সেরে দাঁড়াইত।

কাষ্ঠ হইতে চিনি।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা

পত্রান্তরে প্রকাশ, আমেরিকান নিউইয়র্ক সহর হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথাকার পিটর্সবর্গ নামক স্থানে করাতের গুঁড়ো হইতে চিনি বাহির করিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় করাতের গুঁড়াকে যে চিনিতে পরিণত করা যায়, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের সন্দেহ নাই। আধ সের করাতের গুঁড়া হইতে ছয় ছটাক চিনি বাহির হইতে পারে এবং তাহাতে দুই আনার অধিক ব্যয় পড়িবে না। ক্যাবাৎ! আর ভাবনা নাই! এইবারে

রসগোল্লা সস্তা হইবে বোধ হয় আয়তনেও মিষ্টান্নগুলির বৃদ্ধির আশা করা যাইতে পারে। খর্জ্জুর চিনি ইক্ষু চিনি বীট চিনি খাইয়াছেন। এক রকম দারুচিনিও খাইয়াছেন এবার চিনির মত দারুচিনি খাইতে পাইবেন। শুভস্য শীঘ্রং। চিনির যেমন দর হইয়াছে তাহাতে এই নবাবিস্কৃত চিনির সত্বর আমদানী প্রার্থনীয়।

ভাঁড় আছে—তাতে কর্পূর নাই।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ২২শ সংখ্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমিতির মেম্বরগণ পূর্ব্বে 'মান্যবর' উপাধি পাইতেন। এখন সরকার সে উপাধি রদ করিয়াছেন। অনেক স্থানে যে সকল ব্যক্তি উক্ত পদ পাইবার জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন তাহাতে সাধারণের মত এইরূপ যে ইঁহাদের অনেকেই 'কামকাবাস্তে' নহে 'নামকাবাস্তে' পদপ্রার্থী। মারামারি, কাড়াকাড়ি, তাড়াতাড়ি কসুর কেহই করেন নাই। শেষে যখন একব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইলেন। তবুও ছাড়াছাড়ি নাই, ভোটযুদ্ধে পরাজিত হইয়া মামলা যুদ্ধের আয়োজনের ত্রুটি হইতেছে না। 'মান্যবর' উপাধি না পাইলেও মাণিকের খানিক ভাল এই ভাবিয়া কর্পূর শূন্য ভাণ্ড লইয়া এত কাণ্ড।

গ্রাম্য চৌকিদার।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ২৭শ সংখ্যা

গ্রাম্য চৌকিদার নামক যে ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি প্রজার অর্থে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহাদের চাকরী ছোট হইলেও কর্ম্মের গুরুত্ব বড় কম নহে। রাত্রি ১০টা হইতে চৌকী পাহারা দিতে হয়, হপ্তায় হপ্তায় থানায় হাজিরা দিতে হয়, প্রেসিডেণ্ট হাকিমের নিকট পালা অনুসারে হাজির থাকিতে হয়, থানায় আসিয়া দারোগা হইতে কনেষ্টবল পর্য্যন্ত সকলের ফরমাইস খাটিতে হয়, প্রেসিডেণ্টের মেয়ের বাড়ীতে তত্ত্ব লইয়া যাইতে হয়, ঠিকাদার বাবুর সঙ্গে ঘুরিতে হয়, লোক গণনার ইনুমারেটরগণের হুকুম তামিল করিতে হয়, যে তাহাদিগকে শালা বলিয়া সম্বোধন করে, উর্দ্ধতন হুজুর ভাবিয়া তাঁহারই বাক্স পেটরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া যাইতে হয়, গ্রামে চুরি হইলে তদন্ত কারী ক্রোধ প্রশমনের জন্য অশ্রাব্য গালাগালি শুনিতে এবং সময় সময় পিঠ পাতিয়া দিতেও হয় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক অনেক কর্ম্মের ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত আছে। ইহাদের মাসিক বেতন ৫ টাকা মাত্র। তাও মাসে মাসে পায় না। তিন মাস অন্তর বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা। পেট তিন মাস মানে না কাজেই আদায়কারী পঞ্চায়েত মহাশয়ের নিকট কান্নাকাটি করিয়া হয় সুদ অঙ্গীকার করিয়া না হয় বিনা সুদে অগ্রিম লইয়া থাকে। বেতন বিলির দিন আবার প্রতি চৌকিদার মাহিনা পাইল কি না তাহা দেখিবার জন্য হাকিম বাবু বা কোন উচ্চ পদস্থ অফিসার থানায় উপস্থিত হইয়া চৌকিদারের হাতে তিন

পাঁচ পনের টাকা দেখিয়া তবে ছাড়েন। পঞ্চায়েৎ বেচারা কি করে হাত ফিরি করিবার জন্য কোন প্রকারে সমস্ত টাকা দিয়া হাকিম বাবুর চক্ষের বাহিরে অগ্রিম দেওয়া টাকা কাটিয়া লয়। সরকার সমস্ত চাকুরের মাহিনা বাড়াইলেন আর এই লাঞ্ছিত প্রাণীগুলির কিছু ব্যবস্থা করিলেন না।

বিলাসিতা বর্জ্জন।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ২৯শ সংখ্যা

নন-কো-অপারেশনে আর কিছু হউক আর নাই হউক আমরা হাতে হাতে একটী ফল দেখিতে পাইতেছি। অনেক বালক ও যুবক এক আনা পনর আনা চুল ছাঁটা, বিকৃত আকারের গোঁপ কামান, জামা, কোট, জুতা ত্যাগ করিয়া সাদাসিদে ভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এভাব স্থায়ী হইলে ভালই বলিতে হইবে। এই অন্ন-বস্ত্র-ক্লিষ্ট দেশে বাবুগিরি কমাইয়া মোটা ভাত মোটা কাপড়ে দিন কাটাইতে পারিলে কোন রকমে চলিয়া যাইতে পারে। অনেক বাবাজীরা উপার্জ্জন করেন না এক কড়া, কিন্তু বাপ খুড়োর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করেন কাঁচি মার্কা সিগারেট ইত্যাদিতে। এই 'নির্গুণে সাপের কুলোপানা চক্র' একটু খাঠো হইতে দেখিয়া আমরা খুব আশ্বস্ত হইয়াছি। বেঁচে থাক বাপ সকল খবরদার যেন কদম ভাঙ্গিও না, তোমাদের এই বিলাসিতা বর্জ্জন যেন শ্মশান বৈরাগ্যের মত ক্ষণস্থায়ী না হয়। দুদিন বাবুগিরি ছাড়িয়া আবার—

'বৈরাগ্য যোগ করম কঠিন মেঁই না করব হো' বলিয়া পাশা ঘুঁটি কাঁচিও না। দেখিবে অভাব হইবে না। মনে রাখিও ঃ—

বাবুগিরি কি ঝকমারী টেরী কাটা রোগ।
পয়সা হীনের বাবুগিরি চুল ক'গাছার কর্ম্মভোগ।
বাজার ক'রে আনুলে লোকে বাবু বলবে না,
দু'বেলা অন্ন জোটে না,
কিন্তু নুন দিয়ে তাত গিলতে গেলে
প্রাণ যে আবার হয় বিয়োগ।
হাতে ছড়ি, ট্যাকে ঘড়ি ফুলবাবু সেজে
অনেকে ফিরেন সমাজে
কাপড় আনেন ভাড়া ক'রে
ধোপার সঙ্গে যোগাযোগ।
তাই বলি বাবা সকল আর কেমিকেল বাবু হইও না।

ফ্যাসানে ফ্যাসাদ।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ২৯শ সংখ্যা

ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সাহেবী ফ্যাসান স্বীয় অস্তিত্ব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই। ফলে আজ ভারতের মজ্জায় মজ্জায়

সাহেবী 'এটিকেট' প্রবেশ করিয়াছে। আজ ভারতীয় নেতৃবর্গ স্বরাজ প্রাপ্তি উপলক্ষে বিদেশীয় ভাব বর্জ্জনের উপদেশ দিতেছেন। বক্তাগণের বক্তৃতা দিবার সময়ে স্বদেশী ভাষা যোগাইয়া উঠিতেছে না। তাঁহারা উপদেশামৃতের মধ্যে ইংরাজী বুকুনী অনেক ব্যবহার করিয়া তবে মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। মূল বিষয় "সহযোগিতা বর্জ্জন" বলিলে কেহ হয়ত তাহার মানেই বুঝিবে না কিন্তু "নন-কো-অপারেশন" বেশ বোধগম্য হইতেছে।

শুনিয়াছি বহুদিন পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালা সাহিত্যিক বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য বক্তৃতা দিতে দিতে বলিয়াছিলেন "হে নেটিভ ব্রাদারগণ" তোমরা 'ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ' পরিত্যাগ করিয়া 'মাদার ল্যাঙ্গোয়েজ ব্যবহার কর।'

এই সাহেবী ধরণে হাসা, সাহেবী ধরণে কাসা অভ্যাস করিতে যেমন অনেক সময় লাগিয়াছে তেমনি তাহা ভুলিতেও বহু বৎসর লাগিবে। ব্যাধি তাল প্রমাণ হইয়া বাড়ে কিন্তু তিল প্রমাণ হইয়া কমে। হিন্দুগণের পূজা-পার্ব্বণ ও শাস্ত্রীয় সংস্কার উপলক্ষে বাটীর প্রবেশদ্বার হিন্দুরীতি-নীতি অনুসারে কদলী বৃক্ষ ও পূর্ণঘটে সুসজ্জিত করার ব্যবস্থা আজও লোপ হয় নাই বটে কিন্তু তোরণ দ্বারের শিরোভাগে রঙ্গিন অক্ষরে WELCOME স্থান পাইয়াছে। WELCOME এর এত দিনের দখলী স্বত্ব উড়াইয়া দেওয়া বড় সহজ হইবে না।

যেখানে দশজন ব্রাহ্মণ একত্র সম্মিলিত হন সেখানে কোন নবাগত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যদি "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রণাম করেন, তাহা হইলে আজকালকার যুবকবৃন্দ যতটা বিস্মিত হইয়া উঠেন বোধ হয় 'গুড্ মর্নিং' বা 'গুড্ ইভনিং' বলিলে তত চমকাইয়া উঠেন না। আজকাল বাবা বলা কঠিন কিন্তু ফাদার বলা সহজ, মা বলা খুব শক্ত কিন্তু জিহ্বা মাদার বলিতে একটুও কষ্ট পায় না। 'ওয়াইফ' না বলিয়া যদি কেহ স্ত্রী বলে তখন যেন তাহাকে অনেকে বর্ব্বর ভাবিল বোধ হয়।

পত্রাদি লিখিতে হইলে মাই ডিয়ার ফাদার, মাই ডিয়ার আংকেল্, মাই ডিয়ার ব্রাদার, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড এর পরিবর্ত্তে শ্রীচরণ কমলেষু, প্রণামান্তর নিবেদন মিদং, কল্যাণ বরেষু, অভিন্ন হৃদয়েষু, নিরাপৎসু ইত্যাদি লেখা কত কঠিন। এমন কি আজকালকার উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বাবুর দল কাহাকে কি পাঠ লিখিতে হইবে তাহা জানেন কি না সন্দেহ।

কাহারো সম্বর্দ্ধনা করিতে হইলে টি পার্টি, ইভনিং পার্টি, গার্ডেন পার্টির পরিবর্ত্তে যে কি করা যাইবে তাহা দেশীয় প্রথায় আবিষ্কার করা বড়ই কঠিন হইবে।

তাই বলি এই ফ্যাসান পরিত্যাগ করা কি কম ফ্যাসাদের কথা।

জঙ্গিপুরের অঙ্গচ্ছেদ।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩১শ সংখ্যা

ইতিপূর্ব্বে আমরা জঙ্গিপুর মহকুমার লালগোলা থানার এলাকা লাল-বাগের অন্তর্ভুক্ত করার কথা অবগত হইয়া সরকার বাহাদুরের নিকটে উক্ত

ভাঙ্গা গড়ার ব্যাপার স্থগিত রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। জানিনা সরকার কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আজ আবার বলিতেছি দোহাই সরকার বাহাদুর যাহাতে অধিকাংশ লোকের অসুবিধা হইবে সে ব্যবস্থা না করাই সমীচীন। সরকার এ বিষয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে এতদ্দেশের শতকরা নব্বইজন গৃহস্থই দেনাদার ও গরীব। অনেকেরই সুচারু রূপে সংসার চলে না। কিন্তু কায়দায় পড়িয়া নিরীহ লোককেও মামলা মন্দিরে আসিতে হয়। মামলার খরচা যোগাড় করিতেই অনেকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়ে। জঙ্গিপুর হাঁটিয়া আসা যায় কিন্তু লালবাগ যাইতে হইলে মামলা খরচার উপরে রেলের ভাড়া বোঝার উপর বোঝা হইয়া পড়িবে। গরীব পক্ষ সাক্ষীগণকে বা তদ্বিরকারককে হাতে পায়ে ধরিয়া কোনরূপে হাঁটিয়া জঙ্গিপুর আসিতে রাজি করে না হয় ত একখানি গোগাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে তিন চারিজনকে লইয়া আসিয়া তাহাতেই ফিরিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু লালবাগ যাইতে হইলে সাক্ষী বা তদ্বিরকারক সকলেই ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হইবেন। প্রত্যেকের যাতায়াতের ভাড়া দিতে হইবে। লালগোলা হইতে লালবাগে ট্রেনে গিয়াই বা সুবিধা কি? বর্ত্তমানে লালগোলা হইতে লালবাগে যাইতে মোটে তিনবার ট্রেন পাওয়া যায় (১) রাত্রি ১১টা ২৭ মিনিটে এই ট্রেন মুর্শিদাবাদে পেঁৗছে রাত্রি ১২টা ৩৯ মিনিটের সময় (২) এই ট্রেন লালগোলায় আসে প্রাতে ৭টা ২৭ মিনিটে মুর্শিদাবাদ পেঁৗছে ৮টা ৩৩ মিনিটের সময় (৩) এই গাড়ী লালগোলায় আসে বৈকাল ৩টা ৩৮ মিনিটে এবং মুর্শিদাবাদ পেঁৗছে ৪টা ৩৭ মিনিটের সময়। মামলাকারীগণের পক্ষে কোনও ট্রেন সুবিধাজনক নহে। ১নং ট্রেনে খাস লালগোলার অধিবাসীগণকেও রাত্রি ভোগ করিতে হইবে, দূরবর্ত্তী স্থানের লোকগণের ত কথাই নাই। ২নং ট্রেন কেবলমাত্র লালগোলার লোকের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও দূরাগত ব্যক্তিগণের পক্ষে অনাহারে ভোর রাত্রিতে বা স্থান বিশেষে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে যাত্রা না করিলে উপায় নাই। ৩নং বৈকালের গাড়িতে কাহারও সুবিধা নাই।

আবার লালবাগ হইতে ফিরিতে হইলে মুর্শিদাবাদে যথাক্রমে (১) দিবা ১০—২৮ (২) রাত্রি ৮টা ৪ মিনিটে ও (৩) রাত্রি ৩টা ৫১ মিনিটে ট্রেন মিলিবে ১নং টীত কাছারীর সময় (২) এক খাস লালগোলাধিবাসী ভিন্ন সকলেরই অসুবিধা (৩) রাত্রি ৩টা ৫১ মিনিটে ট্রেন ধরিয়া বার কত যাতায়াত করিলেই লীলা সাঙ্গ।

লালবাগে বিনামূল্যে থাকিবার স্থান নাই জঙ্গিপুরে লালগোলার রাজা বাহাদুরের কল্যাণে বিনামূল্যে থাকিবার সরাই আছে।

লালগোলা এলাকার লোকজন সব জঙ্গিপুরের উকীলবাবু ও দোকানদারগণের পরিচিত। অভাব হইলে বাকীতে উকীল ও ধারে খাবার পাইতে পারে। লালবাগে প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর সে সুবিধা হইবার নহে।

জঙ্গিপুর হাঁটিয়া আসা যায় বলিয়া পক্ষগণ প্রায় ঠিক সময়ে আদালতে হাজির হইতে পারে। আর লালবাগ যাইতে যদি ষ্টেশনে পেঁৗছিতে ১ মিনিট দেরী হয় তবেই মামলা খারিজ। খারিজ বাঁচাইবার জন্য উকীলকে "Missed Train Take Time" টেলিগ্রাফ প্রায়ই করিতে হইবে। আবার ছানির খরচ ত আছেই।

এই ত কাঙ্গাল গৃহস্থের অসুবিধার কথা বলিলাম। যদি কাঙ্গালের বিষ বিবেচনা না করা যায় কেবলমাত্র ধনীলোকদিগের সুবিধা দেখা যায় তাহা হইলে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে ধনী মহাশয় নিজে মামলা করিতে যান না, যান তাঁর কাঙ্গাল আমলা না হয় গোমস্তা। যত অসুবিধা ভোগ করিবে সেই কাঙ্গাল কর্ম্মচারীগণ। মালিকের জঙ্গিপুরেও কোন অসুবিধা নাই লালবাগেও কোন সুবিধা নাই। তবে কেন সরকার একটা কায়েমী জিনিস নষ্ট করিয়া এক নূতন সৃষ্টি করিবেন ? খুব ভাল করিয়া বিবেচনা ও তদন্ত করিলে লালগোলা থানাকে জঙ্গিপুর মহকুমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। তবে কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম করিলে আটকায় কে ?

রাজসাহী জেহালমে হোলি হ্যায়।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা

জেলের পাহারার কড়াকড়ি নিয়ম অনেকেই জানেন। চারিদিকে প্রকাণ্ড গগনভেদী প্রাচীর। প্রবেশদ্বারে লৌহের দৃঢ় গরাদে দেওয়া ফটক। তাহাতে সঙ্গীনধারী গালপাট্টাওয়ালা যমদূতের সোদরপ্রতিম ভীষণ দর্শন, বিশাল বপু-দেশোয়ালী ওয়ার্ডার সর্ব্বদা দণ্ডায়মান। মানুষ ত মানুষ ছুঁচো ইন্দুরের পাশাইবার উপায়টী নাই। রাত্রিকালে গৃহ মধ্যে আবদ্ধ কয়েদীগণের মধ্যেও ওয়ার্ডের পাহারা ছাড়া সজাগ একজন কয়েদী প্রহরীর কার্য্য করে। রাত্রিকালে ওয়ার্ডারের অর্ডার মত প্রত্যেক নম্বর ঘরের কয়েদী প্রহরী ঘুমন্ত কয়েদীগণকে গণনা করিয়া গানের সুরে চীৎকার করিয়া বলে "সাত নম্বর পঁইত্রিশ জমা খরচ আচ্ছা।" এত বজ্রআঁটুনির মধ্যেও গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার ফস্কা গেড়ো হইয়া গিয়াছে। রাত্রিতে নয় প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা প্রায় বারটার সময় রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেল হইতে কয়েদী পলায়ন করিয়াছে। পলাইয়াছে দুটী একটী নয় ৭০০ আন্দাজ। শুধুই কি পলাইয়াছে আবার যাইবার সময় তাহাদের চিরবন্ধু ওয়ার্ডারগণের সহিত মোলাকাৎ করিয়া অনেকগুলি বন্দুক লইয়া গিয়াছে। দিবালোকে রাজসাহীর মত টাউন, যেখানে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশসাহেব, কত ইন্‌স্পেক্টর, সবইন্‌স্পেক্টর, তা ছাড়া অসংখ্য রামসিং, পালোয়ান সিং, দোবে জী, চৌবে জী, পাঁড়ে জী, পাঠক জী, স্ব স্ব বল ও ক্ষমতা জাহির করিতে কসুর করেন না। যেখানে কয়েদীগণ পলাইলে বাধা দিবার রিহার্সেল জন্য মিছামিছি মাঝে মাঝে পাগলা ঘণ্টী (Alarm) দেওয়া হইয়া থাকে, এ হেন টাউনে বেলা দ্বিপ্রহরে যেদিন সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়িল সেদিন কুচ্ছু হোইল না। সাত শ' কয়েদী বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করিল। রাজসাহী সহরে খুব হৈ চৈ লাগিয়াছে। পুলিশের বড় বড় জাঁদরেলগণও রাজসাহীতে নোকড়ী দিতে আসিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত যাহা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কতক ধৃত, কতক পলাতক। আমরাও তাহা জানি "হয় পুত্র, নয় কন্যা, নয় গর্ভপাত।" কেন এই ঘটনা ঘটিল তাহা নির্দ্ধারণ জন্য শুনিতেছি বেসরকারী কমিশন বসিতেছে।

টাকা না খোলাং কুচি ?

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা

ভারত গভর্নমেণ্টের অর্থ সচিব মিঃ হেলি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে, ডিউক অফ কনটের ভারত পরিদর্শনের ব্যয়ের নিম্নরূপ হিসাব দিয়াছেন— (১) ডিউক অফ কনটের পার্শ্বচর ও অনুচরবর্গ যাঁহারা এই শহরে ছিলেন, যাতায়াতের ব্যয় ব্যতীত তাঁহাদের জন্য অন্যান্য খরচ—৪,১৫,৭৪০, (২) যাতায়াতের ব্যয়—৪,০০,৭২৩, (৩) ডিউক মহোদয়ের দিল্লীতে অবস্থান ও অভ্যর্থনার ব্যয়—৫৮২৪৩১ (৪) দিল্লী শিবিরে উৎসব ইত্যাদির ব্যয়—৭,৩৫,৫০০, (৫) চিঠিপত্র তারের খবর ইত্যাদির ব্যয়—২,৬৬,০০০ (৬) সাজসজ্জায় ব্যয়—১,৫৭,০০০ (৭) সরকারী কাজকর্ম্মের দরুণ ব্যয়—৫,৪৩,০০০, (৮) স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার জন্য ব্যয়—১,৪০,০০০ (৯) যন্ত্র ও কলের জন্য ব্যয়—১,৯০,০০০ (১০) চাকর বাকর ইত্যাদির জন্য ব্যয়—৩,০০,০০০, (১১) বিবিধ প্রকারের ব্যয়—১৪,৮৫,০০০ টাকা অর্থাৎ সর্ব্ব-সাকল্যে ব্যয়—৪৫,১৩,৭৯৪ টাকা এত টাকা খরচ করিয়া ভারতবর্ষ কি পাইয়াছে ? রাজার নন্দিনী প্যারী যা কর তাই শোভা পায়।

টিচার না চিটার।

১৩২৮ সাল ৭ম বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা

বরিশালের "কাশীপুর নিবাসী" লিখিয়াছেন,—"আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, বরিশাল জেলাস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় জিলা স্কুল হলে বসিয়া প্রাইভেট বি, এ, পরীক্ষা দিতে যাইয়া নকল করার অপরাধে পরীক্ষা মন্দির হইতে বহিস্কৃত হইয়াছেন। এই অন্যায় কার্য্যের সহায়তাকারী কতিপয় বিশিষ্ট লোক উত্তর লিখিয়া দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই প্রশংসার্হ। এ স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, পবিত্র শিক্ষা বিভাগেও অসৎ কার্য্য প্রসারতা লাভ করিতেছে। একবার কলসকাঠীর হেড মাষ্টারের এক কাহিনী শুনিয়াছিলাম, তৎপর ইতিপূর্ব্বে বরিশাল জেলাস্কুলের জনৈক মাষ্টারের অকার্য্য সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইল!" এই সব শিক্ষকের ছাত্রগণ না জানি কি হইবে!

পৃথিবীর জন সংখ্যা ও জন্ম মৃত্যুর হার।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

সমগ্র পৃথিবীর জন সংখ্যা প্রায় ১৮৪ কোটী। বৎসরে প্রায় ১ কোটী ৪০ লক্ষ করিয়া লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রতি বৎসরে ৮ কোটী লোক জন্ম গ্রহণ করে, এবং ৬/৭ কোটী লোকের মৃত্যু ঘটে। প্রতিদিন ২,২০.০০০

লোক জন্মে ও ১,৮০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। জনসংখ্যা প্রতিদিনে ৪০,০০০ হাজার করিয়া বৃদ্ধি পায়।

ফটিক জল।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

আজ বৃষ্টি হইবে কাল বৃষ্টি হইবে এই আশায় জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া গেল কিন্তু ফটিক জল ঘুচিল না। মধ্যে একদিন জল না হইয়া শিলা বৃষ্টি হইল। বিধাতাও বুঝি বলিতেছেন "ভাল কর্‌বোনা মন্দ কর্‌বো কি দিবি দে।" বৃষ্টি অভাবে ভাবী ফসলের হানি ত দূরের কথা পানীয় জলেরই অভাবে অনেক স্থানে মানুষকে 'ফটিক জল' করিতে হইতেছে। কোন কোন গ্রামবাসীকে গ্রামান্তর হইতে জল সংগ্রহ করিতে হইতেছে আবার কোন কোন পল্লীর লোক গো মহিষাদির অপেয় কর্দ্দমাক্ত জল পান করিতে বাধ্য হইতেছে। গরু বাছুরের জলাভাবে যে কি কষ্ট হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। পূর্ব্বে গবাদি পশুর জল পান করিবার জন্য মাঠে অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল আজকাল তাহার অধিকাংশই জমিতে পরিণত হইয়াছে। কাজেই জলাভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে ভিন্ন কমিবে না। পুরাকালে জলাশয় প্রতিষ্ঠা পুণ্য কর্ম্ম ছিল। যাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন, তিনি কতক্ষণে সেটীকে ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তাঁহার বাপ বরাপের কীর্ত্তি লোপ করিবার জন্য ব্যস্ত। এই পানীয় অভাব চিরদিনই হইবে, চিরদিনই এই 'ফটিক জল' করিতে হইবে। এর বুঝি আর প্রতিকার নাই।

আবার অরণ্যে রোদন।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

অবস্থাপন্ন ও পদস্থ লোকের পায়খানার খবর আমরা বলিতে পারি না। তবে গরীব হীন-প্রাণ করদাতা প্রজাগণের পায়খানা যে যথারীতি পরিষ্কার হয় না সে বিষয়ে বেশ অবগত আছি। দুই, তিন দিন উপর্য্যুপরি ময়লা না লইয়া গিয়া পায়খানার এপাশে ওপাশেই সরাইয়া রাখে। পায়খানা পরিষ্কার সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বেও অনুরোধ করিয়াছি কিন্তু ফলে কিছুই হয় নাই। আমাদের বলিতে সাহস হয় না—যদি কর্ত্তৃপক্ষের কোন সহৃদয় মহোদয় একবার তদন্ত জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করেন তাহা হইলে অনেক পায়খানার হাল ও বকেয়া উভয় ময়লার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবেন।

অনশনে ৯১ দিনে পণ্ডিত রামরক্ষার মৃত্যু।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সহযোগী 'ভারতমিত্র' বলিতেছেন, পণ্ডিত রামরক্ষা আন্দামানে ৯০ দিন অনাহারে থাকেন, ৯১ দিনের দিন তাহার মৃত্যু হয়। রামরক্ষার পৈতা

ফেলিয়া দেওয়া হয় তিনি বলেন, আমি ব্রাহ্মণ, যজ্ঞোপবীত ছাড়া আমি জল গ্রহণ করিব না। সহযোগী বলিতেছে, কালাপানিতে এমন কাণ্ড বিরল নহে, কিন্তু কেহই তাহা জানে না। মেয়র ম্যাকসোয়েনী ৬৫ দিন অনাহারে ছিলেন, ম্যাকসোয়েনী এবং রামরক্ষা দুইজনেই বিদ্রোহী—একজন আইরিশ, একজন ভারতবাসী। ম্যাকসোয়েনীর কথা লইয়া সংবাদপত্রে এত কথা হইল—রামরক্ষার জীবনদীপ অজ্ঞাতে নিবিয়া গেল।

জেলে কোকেন আফিম ও গান্ধী।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত জেলে একজন চীনাম্যানের কিরূপ কথাবার্ত্তা হয়, তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। মৌলনা সাহেবকে প্রথমে জেলে আনিয়া যে প্রকোষ্ঠে রাখা হয়, সেই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে একজন চীনাম্যান কোকেন চুরির অপরাধে দণ্ডিত হইয়া বাস করিতেছিল। একদিন মৌলানা সাহেবকে দেখিয়া ভাবিল, ইনিও বুঝি তাহারই মত কোকেন চুরি করিয়া জেলে আসিয়াছেন, তাই বলিল, "কোকেন কোকেন"। মৌলনা ঘাড় নাড়িয়া দেখাইলেন যে, তাহা নহে। তখন চীনাম্যান ভাবিল, তবে বুঝি আফিম চুরি করিয়া ইনি জেলে আসিয়াছেন, এই ভাবিয়া বলিল, "আফিম আফিম"—মৌলনা সাহেব এবারেও ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে তিনি আফিম চুরি করেন নাই। তখন সেই ব্যক্তি মৌলনার অপরাধের জন্য কোন কারণ দেখিতে না পাইয়া বলিল, "গান্ধী" "গান্ধী"। এইবার মৌলনা সাহেব হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। তখন চীনাম্যান উচ্চৈঃস্বরে "গান্ধীজী কি জয়" বলিয়া উঠিল, অন্যান্য কয়েদীরাও "গান্ধীজী কি জয়" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

পণ্ডিতের মাসিক বৃত্তি।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

জঙ্গিপুর উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত ন্যাংটেশ্বর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর স্কুল হইতে মাসিক ১০ হিসাবে পেন্সন প্রাপ্ত হইতেন। স্কুলকর্ত্তৃপক্ষ উক্ত পেন্সন নিয়ম বহির্ভূত বলিয়া বন্ধ করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের বৃদ্ধাবস্থায় এই পেন্সন বাজেয়াপ্ত জন্য বিশেষ অভাব গ্রস্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি বম্বে নিবাসী বিখ্যাত ব্যবসায় নগেন দাস ফুলচাঁদের জঙ্গিপুর গদির কর্ণধার পবিত্র বিপ্র কুলোদ্ভূত দেব চরিত্র সহৃদয় শ্রীযুক্ত পূষণ রাম দেবশর্ম্মা (মহারাজজী) এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব উপলব্ধি করিয়া মাসিক ৫ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের এই সাহায্য প্রাপ্তিতে কতকাংশ অভাব দূরীভূত হইবে। পণ্ডিত মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে মূলধনী

নগেন দাস ফুলনচাঁদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল হইবে। এই বৃত্তির বিধানকর্ত্তা জাঙ্গিপুরের প্রধান কার্য্যকারক মহারাজজী একজন ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ ব্রাহ্মণ। তাঁহার দেবোপম চরিত্র সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তাঁহার কোমল হৃদয় সর্ব্বদা দুঃখীর দুঃখে কাতর হইয়া থাকে। আমরা তাঁহার সাধু চরিত্রে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। যে ধনীর অর্থে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপকৃত হইলেন মা কমলা তাঁহার গৃহে অচলা হইয়া থাকুন ইহাই আমাদের কামনা। মালিকের প্রধান কর্ম্মচারী মহারাজজী কেবল মুনিবের লভ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষান্ত নহেন তিনি মনিবের যশ ও ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বদা যত্নবান। এইরূপ কর্ম্মচারী আজকাল অতি বিরল। সাধু! সাধু!! সাধু!!!

দেশবন্ধু দাস ও বি এন শাসমলের মুক্তি।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

গত বুধবার সন্ধ্যা ৬টার সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সমস্ত কয়েদীগণের কুঠীরগুলি তালাবন্ধ হইলে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত শাসমল মহাশয়ের ঘরে প্রবেশ করেন। শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয় তখন আহারের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত শাসমল কয়েকদিন ধরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বলেন যে, তাঁহাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা হইবে,—তিনি বাড়ী যাইতে প্রস্তুত আছেন কি না? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেও তাঁহার মুক্তির সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার বাড়ী হইতে মোটর গাড়ী পাঠাইয়া দিবার জন্য টেলিফোনে সংবাদ জানান। প্রায় ৮টার সময় গাড়ী জেলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎক্ষণাৎ দেশবন্ধু ও শাসমল বাড়ী চলিয়া যান। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত শাসমলের ঘরে প্রবেশ করিতেই জেলের অন্যান্য কয়েদীরা ব্যাপার বুঝিতে পারে এবং অনবরত বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে থাকে। শ্রীযুক্ত শাসমল যখন জেলখানা পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার শরীরের উত্তাপ ছিল ১০৪ ডিগ্রী। মুহূর্ত্তে মধ্যে তাঁহাদের মুক্তির সংবাদ সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। অনতিবিলম্বে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, সাতকড়িপতি রায়, ও দেশবন্ধুর কতিপয় আত্মীয় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ তাঁহার বাড়ীতে সমবেত হন।

শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় জেলখানা হইতে সোজাসুজি বাড়ী চলিয়া আসেন, এবং পরে তাঁহার বড় ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। কিছুদিন ধরিয়া তিনি অনিদ্রা রোগে ভুগিতেছেন। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-কমিটীর আগমন পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনেও দিবাভাগে দেশবন্ধুর মুক্তিতে এক বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন সম্ভব হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ এভাবে সহসা চিত্তরঞ্জনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ব্রাহ্মের পাল্লায় শিবঠাকুর।
অনধিকার প্রবেশ।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

কলিকাতার সার্ভেণ্ট পত্রে প্রকাশ—গত জন্মাষ্টমীর দিন সিটি কলেজের জনৈক উড়িয়া বেহারা মাগুনী কালিয়া সিটি কলেজের হাতার মধ্যে একটি পিপুল গাছের নীচে শিবঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিতেছিল। বাবা! ব্রহ্ম অধ্যক্ষ এই হিন্দুর কুসংস্কার পুতুল পূজা কি তাঁহার পবিত্র কলেজের সীমানার মধ্যে করিতে দিয়া কলেজ অপবিত্র করিতে পারেন! তিনি এই বীভৎস্য ব্যাপার দেখিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন। শিবঠাকুরের মূর্ত্তিটীকে দূরে নিক্ষেপ করেন। বাবা শিব! তুমি হিন্দুর উপর রাগ করিয়া তার সর্ব্বনাশ করিতে পার। তুমি ত্রিপুর ধ্বংস করিয়াছ। মদন ভস্ম করিয়াছ। দক্ষ যজ্ঞ নাশ করিয়াছ। কিন্তু ব্রহ্মোপাসকের কিছুই করিতে পার না। সে তোমার এলাকার বাহিরে। বরং তোমার ভক্ত মাগুনীর সহযোগে তুমিই তাঁর কলেজ 'ট্রেসপাস' করিয়া অপরাধ করিয়াছ। মাগুনী ও তুমি উভয়েই ৪৪৭ ধারার অপরাধে ফৌজদারী সোপরদ্দ হইবে না কেন তাহার কারণ দর্শাইতে বাধ্য। বাবা! জান না "পড়িলে ভেড়ার শিঙে ভাঙ্গে হীরার ধার।"

চাউলের উল্টা বাজার।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যা

অন্যান্য বৎসর রপ্তানি প্রসাদাৎ এই সময়ে টাকায় /৬ সের এমন কি /৫ সের পর্য্যন্ত চাউল বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। এবারে রপ্তানী নাই বলিয়া এই দুরন্ত বর্ষাকাল অগ্রহায়ণ পৌষ মাসকে হার মানাইয়াছে। মোটা চাউল /৮৷৷° সের দরে উঠিয়াছে। যাহারা আক্রা দরে চাউল বেচিয়া দু'পয়সা লাভ করিবার বাসনায় চাউল বাঁধাই করিয়াছিলেন। সেই মহার্ঘতাভিলাষী মহাযম মহাশয়গণের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল না বলিয়া ভগবান বেটা কাঙ্গালের আশীর্ব্বাদ এবং তাঁহাদের অভিসম্পাতের ভাগী হইলেন। আমরা তাঁহাদিগকে বলি—"নিশিদিন ভরসা রাখো আক্রা একদিন হবেই হবে।"

প্লাবন বার্ত্তা।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা

আমাদের এতদঞ্চলে এবার তেফলা বন্যা দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে এবারকার মত স্থায়ী বন্যা কখনও দেখি নাই। বন্যা আসিয়াছিল এদেশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু এই প্লাবনে উত্তর-বঙ্গ একাবারে উৎসন্নে গিয়াছে। রাজসাহী, বগুড়া ও দিনাজপুর প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় নিম্নতম অংশগুলি জলে নিমগ্ন। ৭।৮ হাত জল হওয়ায় লোকের বাড়ী ঘর সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে। মানুষ এবং গবাদি পশু অনেক

মারা গিয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা ঘরের চালা, রেল লাইনের উপর এবং কোন উচ্চস্থানে আশ্রয় লইয়া অনাহারে অনিদ্রায় মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। মানুষের হৃদয় বিদারক অবস্থা কি ভগবদ্দণ্ড না পরীক্ষা? আমরা বলি পরীক্ষা। কেননা তিনি দেখিতেছেন যে তোমরা যে স্বরাজ স্বরাজ করিতেছ ঠিক তাহার উপযুক্ত হইয়াছে কি না। এই এক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার দ্বারা তিনি একেবারে দুই সম্প্রদায়কেই পরীক্ষা করিবেন। প্লাবন পীড়িত দুস্থ জনগণকে পরীক্ষা করিতেছেন যে তাদের হৃদয়ে কত সহে। আর সমৃদ্ধ অট্টালিকাবাসী ও গৃহস্থগণকে পরীক্ষা করিতেছেন যে তাদের হৃদয় আছে কি না। ভাই এর কষ্টে ভাইয়ের প্রাণ কাঁদে কি না। বিপন্ন আর্তের কষ্ট নিবারণে সম্পন্ন দেশবাসীগণ আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিয়াছে কি না। আমাদের জেলায় বহরমপুর বাসী শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি সহরে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। আমাদের জঙ্গিপুরবাসী নিশ্চেষ্ট থাকিবেন কি?

অহিংস অসহযোগ।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

"অহিংস অসহযোগ" মন্ত্রের গুরু মহাত্মাজী কারারুদ্ধ হইলেন। তাঁহার ছয় বৎসর কারাবাসকালে তাঁহার চেলা চামুণ্ডরা অসহযোগ নীতি চালাইবার ভার ভাগ করিয়া লইয়া কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কারারুদ্ধ অনেক চেলা ইতিমধ্যে কারামুক্তও হইলেন। দেশ ভাবিল—মহাত্মাজীর লক্ষ্য স্বরাজ তাঁহার লক্ষ লক্ষ শিষ্যবর্গ দ্বারাই অবিলম্বে লাভ হইবে। তাঁহার বড় বড় চেলারা তাঁহার অনুপস্থিতিতে চেলাগিরি হইতে প্রমোশন পাইয়া গুরুগিরি লাভ করিলেন। ফলে "গুরু মিলে লাখে লাখ চেলা মিলে লাখে এক" এই বাক্যের সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে পরিলক্ষিত হইল। দেশ সরকারের আইন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য তদন্ত কমিটি দেশে ঘুরিয়া দেশের ধা'ত টিপিয়া 'থার্ম্মোমেটার' দিয়া বুঝিল 'টেম্পারেচার' 'সাবনর্ম্মাল'। কোন কোন স্থানে "কোলাপ্স ষ্টেজ", আইন ভাঙ্গা মুলতুবী রহিল। এতদিনের বক্তৃতায় গলাবাজির 'ষ্টিমুলেণ্ট' কোন কাজেই লাগে নাই। দোষ দেশের না নেতৃবৃন্দের 'ইনজেক্সনের'? যাহা হউক অসহযোগ নেতৃবৃন্দ কিছুদিন আগে যে মুখে বলিয়াছিলেন "কাউন্সিল ছাড়! ওকালতী ব্যারিষ্টারী ছাড়! স্কুল কলেজ বয়কট কর।" আজ আবার সেই মুখে বলিতেছেন "'কাউন্সিলে ঢোক' ভিতরে ঢুকিয়া 'কাউন্সিল'কে 'স্লো পইজন' কর।" দেশবাসীগণ! এই সব নেতৃবৃন্দকে মাথাপাগল বা মতলববাজ মনে করিও না। কাউন্সিলে প্রবেশ করাকে সহযোগ মনে করিও না। অহিংস মনে করিও না। স্বরাজ পাইতে হইলে এই সকল পরিবর্ত্তিত পন্থায় নারাজ হইলে চলিবে না। ইহা কেবলমাত্র দেশের 'সিমটম্' দেখিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তন মাত্র। মহাত্মাজী জেল হইতে বাহির হইয়া দেখিবেন যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতির নলচে খোল সব বদল হইয়াছে। তাঁহার খদ্দর পরিহিত ব্যারিষ্টার চেলায় 'গাউন' গায়ে দেখিয়া হয়ত চিনিতেই পারিবেন

না। হায়রে! অহিংস অসহযোগ! তুমি যার সৃষ্ট সেই সৃষ্টিকর্ত্তার করচ্যুত হইয়া তোমার লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না।

অরাঁধুনির হাতে প'ড়ে রুইমাছ কাঁদে।
না জানি রাঁধুনি আমায় কেমন ক'রে রাঁধে॥

বাঙ্গালীর ভবিষ্যত।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ২৮/২৯ সংখ্যা

বাল্য মাতৃত্বের ফলে বাঙ্গালী ক্রমে বামনের জাতিতে পরিণত হচ্ছে। এবারকার আদমসুমারীতে কলিকাতা সহরের বালিকা বধূদের সংখ্যা ও বয়স দেখলেই ব্যাপারটী কিরূপ ভয়াবহ তা বোঝা যাবে—

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
১—২	৫	১৩
২—৩	১০৮	২৭
৩—৪	১৫৮	৫২
৪—৫	২৪৫	৭৪
৫—১০	১৪২৫	৬২৪
১০—১৫	১১,২০৬	৩৩৪০

তালিকা দেখিলেই আরও বোঝা যাবে যে, মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের অবস্থাই শোচনীয়। যাদের সমাজে এক বৎসর বয়সের মেয়েরও বিয়ে হতে পারে, তাদের সাগরের জলে ডুবে মরাই উচিত।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর করবৃদ্ধি।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা

কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ কোন সহরে বা গ্রামে দেখা দিলে যেমন তাহার অধিবাসীবর্গের মধ্যে আতঙ্ক দেখা যায় তেমনি জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর কর বৃদ্ধি হওয়ায় অধিকাংশ কর দাতার মনে অসন্তুষ্টি সংক্রমিত হইয়াছে। কমিশনারগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন যে এই কর বৃদ্ধির বিষয় তাঁহারা অবগত নহেন। চেয়ারম্যান ও ভাই-চেয়ারম্যান বাবুরাই এই কর বৃদ্ধি করিয়াছেন। অনেক কর-দাতার কর দ্বিগুণ এমন কি স্থান বিশেষে ত্রিগুণ করা হইয়াছে। করবৃদ্ধি নেহাৎ দরকার হইলে নিশ্চয়ই করিতে হইবে! কিন্তু করদাতাগণের অবস্থানুযায়ী করবৃদ্ধিই হইলে ভাল হয় না কি? যে মহল্লার কর বৃদ্ধি করিতে হইবে, সেই মহল্লার ওয়াকিবহল প্রধান প্রধান মোড়ল মাতব্বরকে ডাকিয়া তাহাদের মতানুযায়ী করদাতাগণের কর বৃদ্ধি করাই ভাল হয় না কি? কর বৃদ্ধি করার সময় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বোধ হয় করেন নাই। করিলে এত খোঁৎ খোঁতানি শুনিতে হইত না। আমরা যতদূর জানি তাহাতে অনেকের করবৃদ্ধি অসঙ্গত হইয়াছে। বিধির কলম একবার ছাড়িলে তাহা রদ হওয়া সুকঠিন। তখন কর দিতে না পারিলে ঘটী বাটী

তুলিয়া আদায় হইবে। টানিয়া ছাড়া দায় হইবে। যাহাতে করদাতাগণের কষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণকে দৃষ্টি করার অনুরোধ করি। কারণ এই অবৈতনিক পদ চিরদিন থাকিবে না কিন্তু যে কলম মারিয়া যাইবেন তাহা রদ হইবে না। "দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায়ুঃ"। আপনারা সাধারণের প্রতিনিধি সাধারণের উপকারই আপনাদের ব্রত।

আলুর গুণ।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা

আমরা যত সব তরকারী প্রতিদিন খাইয়া থাকি, তার মধ্যে আলু একটী প্রধান আহার্য্য। ইহাতে অধিক পরিমাণে শ্বেতসার আছে আর সেই কারণে আমাদের দেহের পুষ্টি-সাধন করে। তাহা ছাড়া আলু আমাদের অনেক কাজে আসে। ইহা হইতে নানাবিধ দ্রব্য তৈরী হয়। ইহা হইতে 'শঠী' তৈরী করা যায়। আজকাল যে সকল কৃত্রিম হাতীর দাঁতের দ্রব্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও এই আলু হইতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কতকগুলি উৎকৃষ্ট গোল আলু লইয়া ভাল করিয়া খোসা ছাড়াইতে হয়। তারপরে উহার ময়লাযুক্ত অংশগুলি সযত্নে বাদ দিয়া কয়েকদিন নির্ম্মল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। একটি পাত্রে পরিষ্কার জল সালফিউরিক এ্যাসিড মিশাইয়া রাখিতে হয়। পরে জল হইতে আলুগুলি তুলিয়া উক্ত পাত্রের সালফারিক এসিড মিশ্রিত জলে আলুগুলি সিদ্ধ করিতে হয়, শেষে অগ্নিতাপে কঠিন বস্তুর ন্যায় হইলে আগুন হইতে নামাইয়া উহা পর্য্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে ধুইতে হয়। তখন নরম থাকিতে থাকিতে কোন জিনিষ প্রস্তুত করিয়া লইলেই হইল। প্রস্তুত জিনিষ ঠিক হাতীর দাঁতের মত সাদা ও দৃঢ় হইবে।

জেলে মহাত্মা গান্ধী।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ২৬শ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত গান্ধী কারাগারে গিয়াও কর্ম্মে বিরত নহেন। কি ভাবে কখন কি করিবেন, তিনি তাহার একটা তালিকা ঠিক করিয়া লইয়াছেন এবং সেই তালিকা অনুসারেই নিয়মিত কাজ করিয়া যাইতেছেন। সিন্ধু প্রদেশের জন-নায়ক শ্রীযুক্ত ভীরুমল যারবেদা জেলে ছিলেন; সম্প্রতি তিনি জেল হইতে বাহির হইয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীর এই মর্ম্মতালিকার কথা প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"মহাত্মাজী সর্ব্বদাই আনন্দময় এবং সুখী। তাঁহার ললাট সর্ব্বদাই এক অসাধারণ জ্যোতিতে উজ্জ্বল। কারা জীবনেও তাঁহার সুখের অন্ত নাই বলিয়া মনে হয়। কিছুতেই তাহার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে না, কিছুতেই তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট করিতে পারে না। প্রত্যহ ভোর ৪টার সময় শয্যা ত্যাগ করেন এবং শৌচাদি সমাপন করিয়াই স্নান করেন, তাহার পর উপাসনা। সারা সকাল বেলাটা তিনি লেখাপড়া করিয়া কাটান। তারপর চরকা লইয়া বসেন। চরকা চালান পুরা পাঁচ ঘণ্টা, বেলা ২টা কি ৩টার সময় আহার

করেন। রাত্রি ৭টা কি ৮টার সময় তিনি আবার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। রাত্রি ৯টা কি ১০টার সময় তিনি শয়ন করিয়া থাকেন। এইভাবেই মহাত্মাজী জেলে সময় কাটাইতেছেন।"

ডেপুটীর অভদ্রতা।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ২৮/২৯ সংখ্যা

হুগলী কালেকটারীর এক পিওনের নাম অবিনাশচন্দ্র সরকার। হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিষ্টর ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত মম্মথনাথ মুখোপাধ্যায় গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে অবিনাশকে তাঁহার পাখা টানিতে বলেন। অবিনাশ তাহাতে রাজী হয় নাই। ফলে, ডেপুটি মম্মথ বাবু অবিনাশকে অবাধ্যতার জন্য সস্‌পেণ্ড করেন অর্থাৎ অস্থায়ীভাবে কর্ম্মচ্যুত করেন। অবিনাশ, ইহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনের নিকট আপীল করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল,— পাখা টানা আমার কাজ নহে, কাজেই আমি তাহাতে রাজী হই নাই। কমিশনর এই পিওনকে পুনরায় তাহার পদে নিযুক্ত করিতে হুকুম দিয়াছেন এবং মম্মথ বাবুকে এই বলিয়া ধমকাইয়া দিয়াছেন যে, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য অধীন কর্ম্মচারীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করা তাঁহার ভাল হয় নাই। ডেপুটী ম্যাজিষ্টর ভদ্র সন্তান হইয়া একজন ভদ্রসন্তানকে পাখা টানিতে বলেন কিরূপে? পিওন হইলেই জাতি দেয় না, ডেপুটি হইলেই জাতি পায় না। যে ভদ্র সে চিরকালই ভদ্র পিওনগিরি বা ডেপুটিগিরির চাকুরীর তারতম্য হয় না।

লর্ড লিটন ও স্যার আশুতোষ।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা

লর্ডলিটন ও স্যার আশুতোষের মধ্যে গত সপ্তাহে ভাইস্ চান্সালারি সম্বন্ধে যে পত্রাদি চলিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। ইহাতে স্যার আশুতোষ যেরূপ লর্ড লিটনের প্রশ্নের জবাব দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উচ্চ বংশ মর্য্যাদা, পদ মর্য্যাদা বিদ্যাবত্তা ও তেজস্বী ব্রাহ্মণের অনুরূপই হইয়াছে। গবর্ণরের শ্লেষপূর্ণ পত্রের ঠিক ও নির্ভীক জবাব দিতে এক স্যার আশুতোষ ভিন্ন আর কেহ কখনও পারিয়াছেন কিনা জানি না। লর্ডলিটনও জানিতেন যে ঠিক ঐরূপ ন্যায্য, সত্য ও কর্কশ প্রত্যুত্তর লিখিবেন এবং ইহার মধ্যে হয় ত তাঁহার কোন অভিসন্ধিও নিহিত ছিল। এই যে ঐহিক পরিবর্ত্তন জগতের মঙ্গলের জন্য। কিছুই একভাবে জগতে চিরকাল চলে না। যদি পৃথিবীতে পরিবর্ত্তন না থাকিত, তাহা হইলে ক্রমবিকাশ থাকিত না। সব এক ঘেয়ে রকমের হ'য়ে যেত এবং একাধিপত্য আসিয়া সকলের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব করিত। আশুতোষের সেই প্রভুত্ব অসহনীয় হইয়া উঠাতেই হয়ত, লর্ড লিটন স্যার আশুতোষকে পদচ্যুত না করিয়া যাহাতে তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পরিত্যাগ করেন, তাহাই করা হইল। ইহাকেই বলে রাজনীতি। ভীমরুলের চাকে ঢিল না মেরে

বুদ্ধি কৌশলে উহাকে জব্দ করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই চাণক্যের কূটনীতি। লিটন নীতির পরিচয় ভালই দিলেন।

একথা সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন সংরক্ষণে এইরূপ স্বতন্ত্রতা একমাত্র স্যার আশুতোষই দেখাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার অসমসাহসিকতা, দম্ভ প্রতাপ এবং অপরিমেয় ভূয়োদর্শন দেখিয়া লর্ড লিটনও চমৎকৃত হইয়াছেন এবং সেই জন্য উত্তরে বলিয়াছেন যে, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা এতদূর বর্দ্ধিত করিয়াছেন যে এখন এমন একজনকে নির্ব্বাচিত করিতে হইবে যেন তিনি আপনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতার্থে অতিবাহিত করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতসাধনাই যাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল, যিনি এই বিশ্ব-ভারতী জননীর মান মর্য্যাদা প্রাণপণেও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, আজ সে জননীর বক্ষ হইতে তাঁহার বীর সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে অকল্যাণের নিদান হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না। আবার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার বা চূণকামের জন্য যেন আশুতোষকে না ডাকিতে হয়।

রথযাত্রা।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

এবার জগন্নাথ ঠাকুর মহা মুস্কিলে পড়ে গিয়েছিলেন। গুপ্তপ্রেস পাঁজিওয়ালা বলেছিলেন ৩০শে আষাঢ় রবিবার রথে টান লাগাও পি, এম, বাগচি জোর গলায় বলেছিল ৩১শে আষাঢ় সোমবার। দুই মতে দুদিন হ'য়ে টান লেগেছিল। টানা-টানিতে ঠাকুরের প্রাণ টিকেছে ত? অনেক চাকুরে বাবু যাঁরা রথের ছুটীর প্রত্যাশা রাখেন, তাঁরা কিন্তু বাগচি কোম্পানির দলে মিশেছিলেন, কেননা রবিবারের সঙ্গে সোমবার দুদিন ছুটী দেশে গিয়ে বাবুদের রথ দেখাও হ'য়েছে, কলা বেচাও চ'লেছে।

কেরাণীর কাণমলা।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা

আমরা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম যে গত জুলাই মাসের শেষভাগে ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর জনৈক শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী উক্ত আফিসের একজন বাঙ্গালীবাবুর সহিত দপ্তরের হিসাব সম্বন্ধীয় কথাবার্তা উপলক্ষে কেরাণী বাবুকে কিছু কটুভাষায় গালাগালি করেন। বাঙ্গালীবাবু তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া সাহেবকে অশ্লীল গালাগালি করিতে নিষেধ করেন। তাহার ফলে সাহেব নাকি কেরাণী মহাশয়ের কাণ মলিয়া দিয়া তাঁহার শ্লীলতা ও ভদ্রতার পরিচয় দেন, এবং ব্যবহারের সংশোধন করেন। আমরা শ্বেতাঙ্গের আচার পদ্ধতি কিম্বা সভ্যতার রীতি নীতি বা মাপকাঠী কি, তাহা জানি না। তবে বাঙ্গালীর সমাজে ঐরূপ ব্যবহার ভয়ানক, বেয়াদবী, অসভ্যতা ও বিশেষ অসম্মানজনক বলিয়া জানি। এই সংবাদটি যদি সত্য হয় এবং শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের যদি কাণ মলিয়া দেওয়া আলাপকালীন সভ্যতার একটা অঙ্গ হয় তাহা হইলে কেরাণী ভায়ারও তাঁহার সম্মানের জন্য তদুপযোগী সভ্যতা প্রদর্শন করা উচিত ছিল না কি?

পৃথিবী ও ভারতবর্ষ।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে পৃথিবীর লোক সংখ্যা নাকি প্রায় ১৮০ কোটী, তম্মধ্যে এসিয়ার প্রায় ৯০ কোটী, ইউরোপে ৫০ কোটী, আফ্রিকায় ১৫ কোটী আর অন্যান্য স্থানে বাকি ২৫ কোটী লোকের বাস। সমগ্র পৃথিবীতে যত লোক আছে তাহার অর্দ্ধেকই এসিয়া মহাদেশে, আর সমগ্র এসিয়ার এক তৃতীয়ের অধিক লোকই ভারতবাসী। কিন্তু হায়! জনবলে যে দেশ এসিয়ার এক তৃতীয়াংশ, শিক্ষা ও সভ্যতায় তাহার স্থান কত নীচে! আরো দুর্ভাগ্য এই পাঁচ কোটীরও কম গ্রেটব্রিটেনবাসী পৃথিবীতে ৪৫ কোটী মানবের উপর শাসন চালাইতেছে। আর তার মধ্যে ভারতবাসী প্রায় ৩২ কোটী। অধঃপতনের এই তিমির দুয়ার খুলিবে কবে?

মার্কিন বৈষ্ণব।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

কিছুদিন হইল কতিপয় মার্কিন ভ্রমণকারী এদেশে আসেন। তাঁহাদের কয়েকজনের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে। যমুনা তীরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভক্তিযুক্ত মনে তাঁহারা বৃন্দাবন গমন করেন। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতেরা তাঁহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রথমতঃ আপত্তি প্রকাশ করেন। পরিশেষে মার্কিন ভদ্রলোকদিগের আগ্রহে এবং স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিগণের অনুরোধে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইলে তাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে মূর্ত্তি দর্শন করেন।

মন্ত্রীদের বেতন বৎসরে দুই টাকা।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ২৬শ সংখ্যা

মধ্যপ্রদেশের কাউন্সিলে বড়ই মজার ব্যাপার হইয়াছে। তত্রত্য হস্তান্তরিত বিভাগের সাধারণ শাসন সম্পর্কে টাকা মঞ্জুরের প্রস্তাব উঠিলে মিঃ কে, পি, বৈদ্য এই প্রস্তাব করেন যে, মন্ত্রীদের বেতন বার্ষিক ৭২ হাজার হইতে ২ টাকা করা হউক। এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া স্বরাজ্যদলের নেতা ডাক্তার মুঞ্জে বলেন, ব্যক্তিগতভাবে কোন মন্ত্রীদের কার্য্যের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বলিবার কিছু নাই, কিন্তু দলের নীতির দিক হইতে কর্ত্তব্য হিসাবেই তাঁহারা ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মাননীয় মিঃ ষ্ট্যাণ্ডেন বলেন, মন্ত্রীদ্বয়কে লোকচক্ষুতে হেয় করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে মন্ত্রীদের বেতন কমান হউক ; তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সে বেতন তাঁহাদের উপযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু ভোটে মন্ত্রীদের বেতন বার্ষিক দুই টাকা করিবার প্রস্তাব পাশ হইয়া যায় ও তাঁহাদের বারবরদারী খরচ ৩ হাজার টাকাও নামঞ্জুর হয়। এইরূপে দেড় ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বাজেট অগ্রাহ্য হয়।

স্যার আশুতোষের দান

চল্লিশ হাজার টাকা।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ২৭শ সংখ্যা

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোন ভারতীয় বিষয়ে প্রোফেসারশিপের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ৪০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার আয় হইতে বাৎসরিক এক হাজার টাকা বেতনে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইবে এবং তাহাকে দুইশত টাকা মূল্যের একটি মেডেলও দেওয়া হইবে। এই অধ্যাপক প্রত্যেক বৎসর নিযুক্ত হইবেন। স্যার আশুতোষের মৃতা কন্যা কমলা দেবীর নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইবে।

কবি নজরুলের বিবাহ।

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

হুগলী হইতে শ্রীমতী গিরিবালা সেনগুপ্তা পত্রান্তরে জানাইতেছেন,—গত ১২ই বৈশাখ শুক্রবার কলিকাতার ৬নং হাজি লেনের বাটিতে আমার কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী ওরফে আশালতা সেনগুপ্তার সহিত শ্রীমান কাজী নজরুল ইসলামের শুভ বিবাহ ইসলামানুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যাকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয় নাই। নজরুলের বন্ধুবর্গ ও দেশবিখ্যাত গুরুজনদিগের অনুরোধে—তাঁহারা এই নব দম্পতির মঙ্গলের জন্য আশীর্ব্বাদ ও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন। নজরুলের স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি হুগলীতে বাস করিতেছেন।

ভারতে শিশুমঙ্গল।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যা

শিশু-মৃত্যু ভারতের একটী প্রধান সমস্যা। সংখ্যা গণনায় দেখা যায় যে, ভারতে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় অর্থাৎ প্রতি বৎসর হাজারকরা ২০০টী করিয়া শিশু ভবলীলা সংবরণ করে। এই সকল মৃত্যুর অধিকাংশই নিবার্য্য কারণে ঘটিয়া থাকে। ভারতে প্রতি বৎসর যত শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহার মধ্যে হাজারকরা ২০০ শিশু জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতের শিশুমৃত্যু-সংখ্যা ইংলণ্ডের দ্বিগুণ। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ভারতের সমান ছিল। কিন্তু নানা উপায় অবলম্বন করায় এই মৃত্যু-সংখ্যা অর্দ্ধেকের কম হইয়াছে।

ভারতেও যাহাতে এই শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমান যাইতে পারে, তজ্জন্য

লেডি রেডিং আগামী জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শিশুমঙ্গল-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য একটী কাউন্সিল গঠিত করিয়াছেন। আশা করা যায়, প্রত্যেক সহরই স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন।

জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা

গত কয়েক বৎসর হইতে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্বন্ধে নানা সময়ে নানা অভিযোগ শুনা যাইতেছিল। দাতব্য চিকিৎসালয় নাচার রোগীগণের জন্যই সংস্থাপিত হয় কিন্তু উহা কাঙ্গাল অপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণেরই বেশী উপভোগ্য হইয়া থাকে। গরীব রোগীগণকে তিক্ত ঔষধের সঙ্গে ডাক্তার কম্পাউণ্ডার বাবুদের বাক্যের তিক্তত্বও অনুভব করিতে হয়। এই হাসপাতালে ইতিপূর্ব্বে দাতব্য নামের সার্থকতার অভাব দেখা যাইত। ডাক্তার বাবুরা নাকি অনেক রোগীর নিকট আইন বাঁচাইয়া কিছু কিছু লভ্য করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতেন না। ইনজেকসান চিকিৎসা দ্বারা সত্বর রোগ মুক্তির প্রলোভন দিয়া প্রাইভেট "কল" পাইবার চেষ্টা করিতেন। হাতে ছুঁচ ফুটাইয়া বাহির করিবার পূর্ব্বেই অতিরিক্ত দর্শনী আদায়ের কথাও শোনা গিয়াছে। শবব্যবচ্ছেদ-কালে মৃত দেহ ডোম দিয়া ছোঁয়াইবার ভয় প্রদর্শনও রোজগারের অন্যতম পন্থা ছিল। হাসপাতালের বর্ত্তমান ডাক্তার বাবু আসিয়া সে সমস্ত অমানুষিক ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন। ইঁহার উদারতা ও মিষ্ট ব্যবহারে কাঙ্গাল দুঃখী সকল রোগীই তুষ্ট। ইনি আসার পর দাতব্য চিকিৎসালয়টীতে দাতব্য নামের সার্থকতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইনি প্রাইভেটে "কল" পাইয়া মোটা টাকা রোজগারের জন্য কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে নারাজ।

মুক্তিদাতার মুক্তি।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধীর রাজদ্রোহ অপরাধে ছয় বৎসর কারাবাসের হুকুম হইয়াছিল। হাকিমের হুকুম তামিল করিতে এখন তাঁহার বহু দিন বাকি ছিল। কথায় বলে হাকিম ফিরে তো হুকুম ফিরে না, কিন্তু মহাত্মাজীর বেলায় সে প্রবাদ খাটিল না। নির্দ্ধারিত কারাবাসের সিকি অংশ তামিল করার পরই সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। ইহা সরকারের গুণ না গান্ধীর গুণ? আমরা বলি মহাত্মা গান্ধীর গুণই সরকারকে এই মুক্তিদানের যুক্তি দিয়াছে। মহাত্মাজী চিরমুক্ত। যাঁর নিজের বলিতে কিছু নাই। সুখ, স্বচ্ছন্দতা, আরাম, বিরাম, ভোগ, লালসা, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি যিনি সব ত্যাগ করিতে পারেন তিনি কারাক্লেশে যে কোনও দিনই দণ্ড বলিয়া ভীত হইবেন এ কথা মনে করাই ভুল। জেল হইতে খালাসের কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মাজী 'এপেণ্ডিসাইটিস' নামক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। সরকার তখন সুদক্ষ ডাক্তার দিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সাধারণ কয়েদীর জন্য যে

চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে মহাত্মাজীর সে চিকিৎসা হইলে এ যাত্রা তাঁহার বাঁচা দুষ্কর হইত। সেইজন্য তাঁহার চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তারগণ পেটে অস্ত্রোপচার করিয়া খুব দক্ষতার সহিত তাঁহাকে আরাম করেন। সরকার ও ডাক্তারগণ এই জন্য দেশবাসীর খুব ধন্যবাদের পাত্র। আবার তাঁহাকে জেলে দিলে পাছে রোগ পুনরাক্রমণ করে এই ভাবিয়াই বুঝি সরকার যুক্তি করিয়া বিনাচুক্তিতে এই ঋষিকল্প মহাত্মাকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। আমরা বলি সরকারের জয় জয় কার হউক! আজ সমগ্র ভারতবাসী সরকারের এই ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট। ভারতকে সন্তুষ্ট করিতে সরকার যে না জানে তা নয়। তবুও যে কেন মাঝে মাঝে আমলা ও সেপাই সান্ত্রীর দোষে চাল ভুল করিয়া ফেলেন তা সরকারই জানেন। অধীন দেশকে অধীন করিয়া রাখিতে হইলে যে কেবল ডাণ্ডাবিধি প্রয়োগই একমাত্র দাওয়াই নয় সরকার এটা জানেন কিন্তু জানিয়াও কতকগুলি নির্য্যাতনপ্রিয় বদপরামর্শদাতার পরামর্শ লইয়া এক আঙ্গুল সেলাই করিতে তিন আঙ্গুল ছিঁড়িয়া ফেলেন। দেশ তো বহুদিনই এই সরকারের অধীনে আছে কই এত দিন তো সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেশবাসী করে নাই। এতদিন করে নাই আজই বা করে কেন এটা একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে দোষ কার? রাঁধুনির না খানেবালার? চিকিৎসকের না রোগীর? ঘোড়ার না সওয়ারের? শাসকের না শাসিতের? দেশ যা চায় তার ষোল আনা না দিয়া কিস্তিবন্দী করিয়া দিলেই বা কি হয় একবার দেখার দোষ কি? মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিতে আজ দেশবাসীর আনন্দ সরকার নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতেছেন। দেশ যা চায় তা কর্ত্তাদের অজানিত নয়। ডাণ্ডাবিধিগুলো একটু আধটু ঠাণ্ডাবিধিতে পরিণত করলে সরকার বোধ হয় ভুলটা কতক শুধ্রে নিতে পারেন। চোর ডাকাতের দণ্ড বরং আরও কড়া হইলে দেশ তাহাতে খুসিই হবে। তবে আটার মধ্যে ঘুণ পোষার মত সাধুকে যেন চোরের মধ্যে না ধরা হয় ইহাই সকল লোকের ইচ্ছা। তবে গান্ধীজীকে খালাস দিয়া আজ সরকার যে সন্তোষ-বীজ দেশে বপন করিলেন তাহা অঙ্কুরিত হইলে যদ্যপি আরও শীতল বারি সিঞ্চন করিতে পারেন তবে নিশ্চয়ই শান্তিফল ফলিবে এরূপ আশা করা যায়। আমাদের আরও আনন্দের কথা এই যে যখন বাংলার কাউন্সিলের কর্ত্তারা চণ্ডনীতিকে চণ্ডতর করিবার কল্পনা করিতেছেন সেই সময়ে ভারত সরকার অসহযোগের সৃষ্টিকর্ত্তার মুক্তি দিলেন। সুতরাং এটাও মনে করিতে হইবে ঝড় বহিয়া ডালপালাগুলি আন্দোলিত হইলেও গুঁড়ি টলে না। আবার বলি ভারত সরকারের জয় হউক।

কাজী নজরুলের মুক্তিলাভ।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ২৪শ সংখ্যা

বহরমপুরে মহকুমা-ম্যাজিষ্টরের এজলাসে কাজী নজরুলের বিরুদ্ধে জেল-আইনের ৪২ ধারা অনুসারে এক মামলা দায়ের হইয়াছিল। উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি বিনা ফিয়ে কাজী সাহেবের পক্ষে মামলা চালাইয়াছিলেন। সুখের বিষয়, কাজী নজরুল সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। জেল-আইনের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে ত?

তারকেশ্বরে প্রতারকেশ্বর।

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমাস্থিত ঁতারকেশ্বর বাবার পূজা অর্চ্চনার জন্য বহু হিন্দু নরনারী পর্ব্ব উপলক্ষে সমাগত হইয়া থাকে। ধর্ম্মপ্রাণা নারীগণও বাবার সেবাইত মোহান্তকেও তীর্থগুরু জ্ঞানে দেবতার তুল্যই মান্য করিয়া থাকেন। অতীত যুগের মোহান্ত মাধবগিরির দুষ্কৃতির কথা ত অনেকেই জানেন। বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজের অনাচার অত্যাচারের কথা শোনা যাইতেছে। মোহান্তগণ নামতঃ সংসার বিরাগী অকৃতদার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা রাজরাজড়ার মত ভোগী, বিলাসী ও কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত। কাজেই অনেক মোহান্তকে মোহান্ত না বলিয়া মোহান্ধ আখ্যা দিলে তাহা বড় অশোভন হইবে না। সম্প্রতি তারকেশ্বরের মোহান্ত বাবাজীর অত্যাচার যাত্রী ও ভক্তগণের এতই অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে যে তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্ণ আন্দোলন উত্থাপন করিয়া মহাবীর সম্প্রদায় নামে এক সম্প্রদায় প্রকাশ্যে তাঁহার অত্যাচার দমনের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দ নামক দুইজন হৃদয়বান্ সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে তারকেশ্বরে আস্তানা লইয়া মোহান্ত মহারাজের অত্যাচারে পদে পদে বাধা প্রদান করিতেছে। বিষয়ী মোহান্ত তাঁহার অধিকার ও প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এই দলের বিরুদ্ধে যতদূর পারেন ততদূর উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি স্বামীদ্বয়কে খুন করিবার জন্য লাঠিয়াল ও গুণ্ডা বাহাল করিতেও ত্রুটি করেন নাই বলিয়া প্রকাশ। আবার আদালতে ও ফৌজদারীতে নানাপ্রকার মামলা রুজুও হইয়াছে। কোনটীতে মোহান্তের লোক আসামী কোনটীতে বা এই সম্প্রদায়ের লোকগণ আসামী। মোহান্তের তবিলে অনেক অর্থ। আজ শ্মশানবাসী মহাদেবের কল্যাণে ব্রহ্মচারী মোহান্ত ঘোর বিষয়ী। পাছে তিনি বেদখল হন এই ভয়! হায়রে সন্ন্যাসী তোমার কাছে সংসারীও হার মানে। সরকার এই বিবাদ দেখিয়া মোহান্ত মহারাজের পৈত্রিক (?) বিষয়ের সুবন্দোবস্ত ও শান্তি স্থাপনের জন্য বাবার স্থানে এক ঋষিবর নিযুক্ত করিলেন। মহাবীর-দলও এই ঋষিবর নিযুক্ত করায় সরকারের কোন অধিকার নাই বলিয়া ঋষিবরকে মন্দিরের ভার লইতে বাধা দিলেন। ফলে স্বামী বিশ্বানন্দ ১৪৪ ধারায় গ্রেপ্তার হইলেন। স্বামী সচ্চিদানন্দও গ্রেপ্তার হন হন এমত অবস্থা। আজ কয়েক দিন হইতে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। রোজ স্বেচ্ছাসেবকের দল গ্রেপ্তার হইতেছে। নানাস্থান হইতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ মহাবীরদলের রসদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও টাকা পাঠাইতেছেন। স্বামী বিশ্বানন্দের গ্রেপ্তারে কুলীদলও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। শান্তিরক্ষক সরকারও শান্তির মন্তর ঝাড়িতে কসুর করিতেছেন না। লোকও গ্রেপ্তার হইতে অগ্রসর হইতেছে। এখন দেখা যাক বাবা তারকেশ্বর হিন্দু ভক্তগণের দেবতা কি মোহান্ত মহারাজের ক্রীড়নক হন তবে সেইদিনই বাবাকে হিন্দুমাত্রেরই ত্যাগ করা উচিত এবং এতদিন যে বাবাকে ভোগরাগ, মানসা, নগদ টাকা, সোণার বিল্বপত্র প্রভৃতি দিয়া মোহান্ত মহারাজের তহবিল পূর্ণ করতঃ মোহান্তজীর ভোগবিলাস অত্যাচার ও কাম চরিতার্থের মাল মসলা যোগাড় করিয়া দিয়া ঠকিয়াছে তজ্জন্য বাবার তারকেশ্বর নামের

পূর্ব্বে একটী 'প্র' উপসর্গ যোগ করিয়া তাঁহার প্রতারকেশ্বর নামকরণ করা উচিত।

পরলোকে স্যর আশুতোষ।

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

বাঙ্গালার বিরাট পুরুষ চলিয়া গেল ; স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যার পরে মাত্র দুই দিন রোগ ভোগ করিয়া পাটনায় তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। অদ্বিতীয় মনস্বী ও মনীষী, অসামান্য তেজস্বী, অনন্যসাধারণ কর্ম্ম শক্তিপরায়ণ আশুতোষ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কে ও কি ছিলেন, সে নিকাশের দিন এখন আসে নাই ; বাঙ্গালার উত্তর পুরুষেরা তাহার নির্দ্ধারণ করিবে। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালায় আশুতোষের স্থান পূর্ণ হইবার নহে—পূর্ব্বেও হয় নাই, পরে হইবে কিনা, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। যে শক্তি লইয়া আশুতোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে শক্তির অধিকারী হইয়া পৃথিবীতে এ যাবৎ অতি অল্প ভাগ্যধরই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বাধীন দেশ হইলে তিনি রাষ্ট্রপতি বা মহামন্ত্রী হইতে পারিতেন ; এই পরাধীন দেশেও যদি তিনি দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে একটা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইত না। আশুতোষের সবটাই বিরাট ছিল। তাঁহার বহু বিরাট,—তাঁহার হৃদয় বিরাট,—তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি বিরাট, তাঁহার পরিকল্পনা বিরাট,—তাঁহার কর্ম্মশক্তি বিরাট,—তাঁহার অধ্যবসায় বিরাট। তাই এই বিরাট পুরুষের দ্বারা বাঙ্গালার বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছিল।

পূজায় স্বদেশী বস্ত্র।

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

শারদীয় মহাপূজা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। এই স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় উৎসব কালে প্রত্যেক স্বদেশ সেবকের অঙ্গই যাহাতে স্বদেশী বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উঠে, এখন হইতেই সেই লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। হউক না. স্বদেশী বস্ত্র অতীব মোটা ; জবরজঙ্গী রকমের! বিদেশের অতি সূক্ষ্ম অতি মোলায়েম,—নানারূপ জলুসদার রংয়ের বস্ত্র বিষবৎ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করিয়া এদেশীয় স্থূল এবং অমসৃণ কাপড়ই ব্যবহার করা প্রত্যেক স্বদেশীয়েরই একান্ত উচিত। কান্ত কবির "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই!" ইহা কেবল ভুয়া অর্থাৎ অর্থহীন কাব্য নহে, ইহা প্রাণ-বিশিষ্ট মনুষ্যগণের জন্য প্রাণবান্ কবির লেখা, ইহা দেখিয়া আর সম্মুখে দীনাহীনা ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা কাঙ্গালিনী জন্মভূমির মলিনা মূর্ত্তিতে লক্ষ্য রাখিয়া এদেশের প্রত্যেক বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা পুরুষ নারী

এখন হইতে স্বদেশী বস্ত্র পরিধানের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন। আর এদেশের বড় বড় বস্ত্র সদাগর বা কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ীগণও এখন হইতেই খাঁটী স্বদেশী বস্ত্রের প্রচুর আয়োজন করুন ; কাটা পোষাক ব্যবসায়ীগণও বিদেশীয় জমকাল কিন্তু অস্থায়ী নানারঙের নানাপ্রকার বাহির-চিকণ কোট শেমিজ প্রভৃতি তৈয়ার করান ছাড়িয়া দিয়া এদেশীয় নানাপ্রকার কাপড়ে সেই সব জামা প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে থাকুন। ইহারা সুযোগ বুঝিয়া বহু লাভের লালসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব অল্প লাভে সেই সব জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করুন। এবার পূজার মরসুমে দাসভাব বিজড়িত পঞ্জরে পঞ্জরে মরিচা ধরা দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী, যেন লক্ষ্য সাধনের পথে যেন যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণেও অগ্রসর হতে পারে মা দশভুজে ! তোর দশ প্রহরণ ফেলিয়া দিয়া একবার দশভুজ তুলিয়া তোর পতিত বাঙ্গালী সন্তানগণকে প্রাণ খুলিয়া এই আশীর্ব্বাদই এবার কর মা !!

খদ্দর অনুরাগ।

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত গান্ধী ইদানীং যে স্থানেই যাইতেছেন,—সেই স্থানেই পূর্ণ প্রাণে খদ্দর প্রচলনেরই উপদেশ দিতেছেন। সম্প্রতি পুণা সহরে তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—তাহাকে লোকে পাগল বলে বলুক,—কিন্তু তথাপি জনসাধারণকে খদ্দর পরিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন,—বহুল ভাবে খদ্দর প্রচলনই এদেশের উন্নতি বিধানের প্রাথমিক সোপান। যদি এদেশের সহস্র সহস্র—লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে খদ্দর ব্যবহার করিতে পারেন এবং চাহেন,—তাহা হইলে বুঝা যাইবে,—অন্ততঃ একটা বিষয়েও দেশের এই লক্ষ লক্ষ লোকের মনে একটা ভাবসাম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের কল্যাণ-সাধনের পক্ষে এই ভাবসাম্য এক্ষণে একান্ত আবশ্যক। আর এই অবাধ খদ্দর ব্যবহারের ফলে যদি এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের বস্ত্র চিন্তাটাও বিদূরিত হয়, তাহা হইলে দেশের এক মহা অভাব বিমোচিত হইল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহাই হইল, শ্রীযুক্ত গান্ধীর খদ্দর প্রচারে এত আগ্রহের একটা মূল তত্ত্ব। অন্ততঃ অনেকে আজকাল ইহাই বুঝিতেছেন বা বুঝিবেন। ইহা বুঝিয়াই দেশের লোকেরও ইদানীং মনে প্রাণে আত্মরক্ষার চেষ্টায় মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের মতে খদ্দর প্রচার কেবল ভাবসাম্য সৃষ্টি বা বস্ত্রাভাব প্রতিকারসূচক নহে ; পরন্তু ইহাতে আরও একটা মহামঙ্গল সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র বস্ত্র ব্যবহারজনিত বিলাসস্পৃহা দমিত হইবার সম্ভাবনা। যাহার যেটুকু মাত্র বস্ত্র, পরিধান বা উত্তরীয় হইলেই স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিবে,—তাহার ততটুকু মাত্র ব্যবহার করা নানাকারণেই *শ্রেয়স্কর। বিলাসবাঞ্জক* অতিরিক্ত পরিধেয় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করাই বিশেষরূপে আবশ্যক। একথাটাও এক্ষণে এদেশেরও সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই আসন্ন শারদীয় মহাপূজায় পর্ব্বোৎসব-কালে লক্ষ লক্ষ হিন্দু আত্মীয় স্বজনগণের জন্য নানারূপ পরিধেয় ক্রয় করিবার

কালে এ কথাটা উত্তমরূপে চিন্তা করিবেন, ইহার জন্য তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা একান্ত অসঙ্গত এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হবে বলিয়া আমাদের ধারণা নহে। বিলাস—বস্ত্রাদির অভাব—কেবল বিলাস বস্ত্রাদি কেন তাবৎ বিলাস দ্রব্যের ব্যবহারই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করা আত্মনির্ভরকামী জাতি মাত্রেরই পক্ষে বিশেষরূপ প্রয়োজনীয়। লোককে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল এবং মনুষ্যত্ব সম্পন্ন করিতে হইলে এই বিলাস পরিহারই সম্পূর্ণরূপে আবশ্যক। খদ্দর ব্যবহারে ধীরে ধীরে দেশের লোকের অন্তঃকরণে এই বিলাসবর্জ্জন বুদ্ধি জাগরিত হইতে পারে,—আমাদের মনে হয়, শ্রীযুক্ত গান্ধীর ইহাও অন্যতম কামনা। দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধীর এই কামনার পূরণ যে দেশকল্যাণ-সাধনের অন্যতম উপায়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মিউনিসিপ্যাল রাস্তার সংস্কার'

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

বরষা প্রায় ফরসা হইতে চলিল এই বার ভরসা হইতেছে যে, মিউনিসিপালিটীর রাস্তাগুলি মেরামত হইতে পারে। কনট্রাক্টর মহাশয়গণ রাস্তার ধারে ইট ঝামা ইত্যাদি কুচাইয়া স্তূপাকার করিতেছেন। বর্ষার কর্দ্দম রাশিতে রাস্তার কোমলত্ব উপভোগ করার পর শুষ্ক শরতে সড়ক মেরামতের আয়োজন দেখা যাইতেছে। সেই ত মেরামত করিলে দাদা, কিছুদিন আগে করিলেই ত বেশ হইত। সাধে বলিতে ইচ্ছা করে—

নির্ব্বাণে দীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বণিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা

হঠাৎ সেদিন গবর্ণমেন্ট সত্তর আশীজন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন—কি তাহাদের অপরাধ—তাহাদের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—তাহা তাঁহারাই জানেন। শক্তিশালী শাসক-জাতি দুর্ব্বল শাসিত জাতির নিকট কারণ ব্যক্ত করেন নাই, করার দরকার মনে করেন নাই। এ দেশবাসী তাহাদের *বিচার বুদ্ধি সম্যকরূপে প্রয়োগ করিয়াও গ্রেপ্তারের মর্ম্ম ধরিতে পারে নাই।*

দেশ ছিল স্থির, শান্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের বেগ দেশের সর্ব্বত্র মন্দীভূত; নেতৃগণ রাজনৈতিক আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া দেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়াই বিব্রত, উষ্মা কুত্রাপিও প্রকাশ পায় নাই, বিপ্লববাদের চিহ্নও নাই—এমন সময় এরূপ ধরপাকড়ের কথা মনে করাও অসম্ভব ছিল। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ঠিক এই সময়েই তাঁহাদের অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া দেশের কতকগুলি লোককে ধৃত করিলেন।

গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহারা দেশে বিপ্লবের সূচনা দেখিতে পাইয়াছেন। বিপ্লববাদী দলের অস্তিত্ব তাঁহারা জানিয়াছেন। তাহাদের কার্য্যকলাপেরও প্রমাণ তাঁহাদের হস্তগত। কিন্তু কোথায় তাঁহারা বিপ্লবের সূচনা দেখিলেন, তাহাদের অস্তিত্ব কোথায় ও কার্য্যকলাপের কি অকাট্য প্রমাণ তাঁহাদের করগত হইয়াছে, তাহা বলেন নাই। ধৃত ব্যক্তিগণকে তাঁহারা সাধারণ আইন অনুসারে বিচারালয়েও হাজির করিতে রাজী নহেন।

এ ত মজা বড় মন্দ নয়! তুমি তোমার মনগড়া অপরাধের জন্য আমাদের গ্রেপ্তার করিবে, জেলে পচাইয়া মারিবে, অন্তরীণ দিবে, দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিবে, অথচ আমার অপরাধ কি, তাহা আমি জানিতে পারিব না! আমার অপরাধ তুমি জানিলে আর কেহই জানিল না, তাহারই জন্য আমায় শাস্তি লইতে হইবে! আইনের দ্বার ত সকলের জন্যই উম্মুক্ত, আমি অপরাধ করিয়া থাকি তাহার ত বিচার-শক্তি আছে, আমাকে তাহার হাতে তুলিয়া দাও।

ঘোষণা পত্র জারি করিয়া সরকার বলিয়াছেন যে বাঙ্গালায় যে রাজনৈতিক বিপ্লববাদীদলের আবির্ভাব হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিতে পারিয়াছেন। এই বিপ্লববাদীরা খুন জখম ডাকাতি, সরকারী কর্ম্মচারী গণকে হত্যা করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য এক নূতন বিধি গঠিত করিতেছেন। এই নূতন বিধিটী গত শনিবারের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং সেইদিনই বাংলায় ধরপাকড়ের প্রবল বন্যা বহিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট যত সাক্ষ্য প্রমাণই হস্তগত করিয়া রাখুন না কেন, প্রকাশ্য আদালতে বিচারের সম্মুখে যতক্ষণ না সে সকল প্রকাশ করিতেছেন, ধৃত ব্যক্তিকে যতক্ষণ না নিজ পক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতেছেন ততক্ষণ তাঁহাদের কথা বেদ বাক্য বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিবে না। সর্ব্বসাধারণ তাহাদের অপরাধের কথা জানিতে চায়, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানান, নতুবা অপরাধ সম্বন্ধে কোন কথাই কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

ইহাতে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি করিবার কারণই বা কি থাকিতে পারে? তাঁহারা যাহাদের অপরাধী বলিয়া ধৃত করিয়াছেন, যাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের আদালতে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি ওঠে কেন? গবর্ণমেণ্ট কি তবে সন্দেহ করেন, ন্যায়-বিচারে তাঁহাদের করধৃত প্রমাণাদির টিকিবার পক্ষে সন্দেহ আছে? গবর্ণমেণ্ট কি তবে মনে করেন, আদালতের বিচার সূক্ষ্ম ও সত্য নহে? গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া বলুন তাঁহারা কোনটা ঠিক মনে করেন? আদালত অসত্য না তাঁহাদের করগত প্রমাণাদি অসত্য? আমরা বিশেষ করিয়া ভারত-ভাগ্যবিধাতা লর্ড রিডিংকে এই প্রশ্ন করিতেছি।

রাজনৈতিক আন্দোলনকে অচল ও শক্তিহীন করিবার উদ্দেশ্যে বা জনমতের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আরও বহুবার দমননীতি প্রয়োগ করিয়াছেন; এখনও করিতেছেন; আশা করা যায় যে ভবিষ্যতেও তাঁহারা তাহাই করিবেন। শক্তিমান জাতির পক্ষে দুর্ব্বলদমন করিবার জন্য কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করিতে গবর্ণমেণ্টের কোন কষ্ট ত নাই-ই বরং খুবই সহজ। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কি এখনও জানিতে বাকী আছে এই দমননীতি প্রয়োগের ফলে দেশে অশান্তি ও অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠে? গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে তাহা দেখিয়াছেন। এবং ইহাও তাঁহাদের অজানা নাই যে আজ পর্য্যন্ত

কোন শক্তিশালী শাসকই দমননীতির বলে জনমতকে দলিতে বা ক্ষুব্ধ দেশবাসীকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কোন দূরদেশে যাইতে হইবে না অথবা বেশী পুরাতন ইতিহাসের পৃষ্ঠাও খুলিতে হইবে না, এই দেশের ও অদূর অতীতকালের ঘটনাই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত করিবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট রাওলাট আইন চালাইয়াছিলেন, ফল কি হইয়াছিল? পাঞ্জাবের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ আন্দোলনের উদ্ভব কি এই দমননীতি হইতেই হয় নাই? গবর্ণমেণ্ট যে এ সকল কথা জানেন না, তা নয়, খুবই জানেন; কারণ আইন উঠাইয়া দিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন। আজ আবার কেন যে গবর্ণমেণ্ট সে সকল কথা ভুলিতে বসিয়াছেন, বুঝিলাম না। নির্য্যাতনের ফল কখন শুভ হইতে পারে না; অত্যাচার মানুষকে শুধু বলি কেন, প্রাণ বিশিষ্ট কোন জীবকেই শান্ত করিতে পারে না।

মিউনিসিপ্যাল ভোট-বল ম্যাচ।

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা

মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তাগণের সাড়াশব্দ অন্য সময়ে বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে নির্ব্বাচনের সময় নির্জীব সহর সজীব হইয়া উঠে। আগামী ৬ই মার্চ্চ শুক্রবার জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর শুভ নির্ব্বাচনের দিন। সেই দিন দেব দুর্লভ কমিশনারী পদ পাইবার জন্য ভোটপ্রার্থীগণ কায়েন-মনসা-বাচা খুব চেষ্টা করিতেছেন। নিজেই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি ইহা প্রকারান্তরে বুঝাইতে অনেকেই কসুর করিতেছেন না। এই মিউনিসিপ্যালিটীতে ছয়টা ওয়ার্ড, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ২ জন করিয়া মোট ১২ জন কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু এই বারটা পদের জন্য ৭২ খানা দরখাস্ত পড়িয়াছে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটারগণের মাত্র দুইটা করিয়া ভোট; এই দুইটা মাত্র ভোটের সাহায্যে গরীব ভোটারগণ সকল বাবুর মন রাখিবে কি করিয়া? তাহাদের পক্ষে সবাই সমান —কেননা যা'কে ভোট না দিবে তারই কোপে পড়িতে হইবে। মাভৈঃ ভোটারগণ! চীৎকার করিয়া ভোট দিতে হইবে না। বেলটে নিজের ইচ্ছামত যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিয়া ফেলিও।

শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা।

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ২৮শ সংখ্যা

বাঙ্গালাদেশে গড়ে প্রতিদিন ৩৯০০০ শিশু জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে ৮৪৭ শিশুর এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হয়। অথচ যে ব্যাধিতে ইহাদের অকাল-মৃত্যু ঘটে তাহার প্রতিকার হওয়া সম্ভব। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব ইহার এক কারণ হইতে পারে; কিন্তু অব্যবস্থা, কুসংস্কার ধাত্রীজ্ঞানের অভাব ও আমাদের উদাসীনতা যে অনেকাংশে ইহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের শিশু-মৃত্যুর হার ইংলণ্ডবাসীর চেষ্টায় অনেক কমিয়াছে। প্রতিকার যোগ্য ব্যাধির প্রতিকার চেষ্টা করিলে আমাদের দেশেও শিশু-মৃত্যুর হার কমিতে পারে। এ পক্ষে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনীর উদ্যোগিগণের চেষ্টায় আমাদের দেশের শিশু কুলের যৎসামান্য কল্যাণ হইলেও আমরা তৃপ্ত হইব।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা।

১৩৩২ সাল ১১শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে এ পর্য্যন্ত কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বিগত ১৪ই চৈত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ঐ গ্রামে একটী সভা হইয়াছিল। যে স্হলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৈতৃক বাস-ভবন ছিল—যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা দেশকে—ভারতবর্ষকে পবিত্র ও গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেইস্হানে এখন স্হানীয় ঘোষ গুটী পরিবারের সম্পত্তি। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষ গুটী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ গুটী ও নাবালক শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র ঘোষ গুটীর অভিভাবক মহাশয় ঐ পবিত্র স্হানের ন্যূনাধিক দশ কাটা ভূমি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে দান করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা আশা করি, অতঃপর বঙ্গবাসী ঐ স্হানে স্বর্গীয় মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার জন্য কোন মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের জন্য যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। লর্ড কর্জ্জনের কৃপায় কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাসে মর্ম্মর ফলক স্হাপিত হইয়াছে, কিন্তু যেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই-স্হানে কোনরূপ স্মৃতিস্তম্ভ না থাকা কেবল যে দুঃখের বিষয় তাহা নহে, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে লজ্জা ও কলঙ্কের কথা।

এবার সরকারের পালা।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচনের পালা শেষ হইল। করদাতাগণের ভোটে যাহারা কমিশনার হইবার কথা সেই বার জন ভাগ্যবান নির্ব্বাচনের সদর দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ করিলেন, এবার মনোনয়নের খিড়কী দিয়া ছয় জনের প্রবেশ লাভ হইবে। এই খিড়কীর চাবি সরকারের হাতে। সরকার যাহাকে যাহাকে যোগ্য মনে করিবেন তাহারাই প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইবেন। জানিনা কোন্ কোন্ ভাগ্যবান্ এই অধিকার লাভ করিবেন। ভোটে নির্ব্বাচনে যোগ্যতা অপেক্ষা জোগাড়ের জয় চিরদিনই হইয়া থাকে, এবারেও যে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে একথা বলা চলে না। নিরেস ব্যক্তিও নির্ব্বাচিত হইয়া বুক ফুলাইয়া স্বীয় যোগ্যতার বড়াই করিবার সুযোগ যে পায় নাই এ ক্ষেত্রে তাহা বলা চলে না। আবার যোগ্য ব্যক্তিও যে ভোট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সাধারণের রুচিকে দোষ দিয়া পরাজয়ের অবসাদে অবসন্ন হইয়া অভিশপ্ত দেশের দুর্গতির আশঙ্কা করিতেছে, এ ব্যাপারও বিরল নহে।

সরকারের মনোনয়নে যে ঠিক যোগ্য ব্যক্তি মনোনীত হইবেই একথা ভরসা করিয়া বলা যায় না, কারণ ইতিপূর্ব্বে এই মিউনিসিপালিটীর মনোনয়নের ব্যাপারে এমন লোক মনোনীত হইয়াছেন যাহাদের নাম মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারের নিকট পাঠান নাই বলিয়া শুনা গিয়াছে। সরকারের মনোনয়নের

জন্য মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর লিস্ট পাঠাইয়া থাকেন তার মধ্যে যাঁহাদের নাম গন্ধ ছিল না তাঁহারা যদি মনোনীত হইয়া থাকেন তবে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা বলিতে হইবে। কোন্ ভেল্কীবাজীর প্রভাবে বা কোন অদৃশ্য সাফাই হাতের ওস্তাদীতে এই মনোনয়ন ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না।

এখানে স্বরাজী নাই, কংগ্রেসী নাই, মদরত নাই। তবে অন্যান্য সহরের মতই দল বা সম্প্রদায় না থাকা নয়। নির্ব্বাচন ও মনোনয়নে ওস্তাদী দেখাইয়া নিজেদের দল পুষ্ট করিবার মতলব সকল দলেরই আছে। নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভোটার পটকাইয়া মতলব সিদ্ধি করা হয়। কিন্তু সাত দেউরী পার হইয়া সরকারের নিম্ন দপ্তর হইতে উচ্চ দপ্তরে যে কেমন করিয়া সাধারণ লোকের কার-চুপি খাটে তাহা সমাধান করা সুকঠিন।

তবে একই সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যদি সবগুলি কমিশনার মনোনীত হইয়া থাকে তাহা হইলেই একটু ধাঁধা লাগে।

যাহা হউক এবারে যাহাতে নিরপেক্ষভাবে সকল শ্রেণী হইতে যোগ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ মনোনীত হন তজ্জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মহাত্মা ও আলীভ্রাতৃদ্বয়।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

মহাত্মাজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিতেছেন,—কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, আমার সঙ্গে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধ হইয়াছে, এই কারণেই তাঁহারা আমার সঙ্গে আসেন নাই। এই প্রকার ধারণা সময়ের গুণে হইয়াছে। যাহা হউক আলীভ্রাতাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ হয় নাই—হইবেও না। যদি হয়ই তাহা হইলে আমি যেমন তাহাদের বন্ধুত্বের কথা সাধারণ্যে জানাইয়াছি উহাও জানাইতে ত্রুটী করিব না। মৌলনা শওকত আলী পুনর্গঠিত খিলাফত কমিটি লইয়া বোম্বাইয়ে এবং মৌলনা মহম্মদ আলী দিল্লীতে দুইখানা কাগজ লইয়া ব্যস্ত আছেন। বিশেষতঃ ১৯২০-২১ সনের ন্যায় এখন আর আমাদের একসঙ্গে ভ্রমণ করাও তত প্রয়োজনীয়তা নাই। নূতন সূতা কাটার মতাধিকার প্রথা দেশে কেমন চলিতেছে—একজন ইনস্পেক্‌টর জেনারেলের মত আমি তাহাই দেখিয়া বেড়াইতেছি। আমি কর্ম্ম কর্ত্তার দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং এই এক বৎসর মধ্যে যেখানে সেখানে আমার যাওয়ার দরকার সেই সব স্থানে সম্ভব হইলে একজন মুসলমান বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া কি সম্ভব না হইলে একাকী আমাকে তথায় যাইতে হইবে।

মহাত্মাজীর মুর্শিদাবাদে আগমন।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

বিগত ২০শে শ্রাবণ বুধবার মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র চরণ স্পর্শে মুর্শিদাবাদ ধন্য হইয়াছে। বুধবার মহাত্মাজী আজিমগঞ্জে ও তৎপর দিবস বহরমপুরে ছিলেন। বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে কলিজিয়েট স্কুলের সম্মুখস্থ ময়দানে একটী বিরাট জনসভা হয়। বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে চেয়ার-

ম্যান মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মহাশয় ও মুর্শিদাবাদ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ গুপ্ত মহাশয় মহাত্মাজীকে পৃথক পৃথক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। উক্ত সভায় মহাত্মাজী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন ; সভাভঙ্গের পর শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে এই জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের সহিত সূতা কাটা ও চরকা প্রচলন সম্বন্ধে প্রায় আধঘণ্টা-কাল কথাবার্ত্তা বলেন। তথা হইতে গমনের পর জাতীয় বিদ্যালয় ও খাদি-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। অপরাহ্নে কৃষ্ণনাথ কলেজে ছাত্রদিগের এক সভা হয়। কলেজের ছাত্রগণ মহাত্মাজিকে এক অভিনন্দন পত্র দান করেন ও তৎসহ কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। মহাত্মাজী তাঁহার সহজ সরল সুললিত ভাষায় উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরসহ সূতা কাটা, চরিত্র গঠন ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। কলেজ হইতে ফিরিবার পথে মহিলা সভায় গমন করেন। মহাত্মাজীর আগমনে সমস্ত সহরে যেন নূতন জীবনস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

বিগত ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্নে জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি তর্পণের জন্য একটী সভা হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল মহাশয় সভাপতি আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হরিলাল সাহা, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত ও মৌলবী আজিজল হক প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় প্রায় একঘণ্টা কাল বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়-সম্পৃক্ত ঘটনাবলি বিবৃত করিয়া বক্তৃতা দান করেন। সভায় শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীচরণ সিংহ, ডেপুটী ও মুনসেফ মহাশয়গণের অনুপস্থিতি সকলের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চরমপন্থী রাজনৈতিক ছিলেন না, পরন্তু তিনি রাজনীতি চর্চ্চাই করেন নাই। সুতরাং তাঁহার স্মৃতিপূজার জন্য যে সভা আহূত হইয়াছিল তাহাতে উপস্থিত না হওয়ার কারণ সরকারের নজরে পড়িবার ভয় নহে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সভার দুই এক দিন পূর্ব্বে ডিভিসনাল কমিশনার বাহাদুরের আগমনে স্মৃতিসভায় অনুপস্থিত মহাত্মাগণ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকল সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হায় বিদ্যাসাগর মহাশয়! তুমি বাংলার হৃদয়ে দেবতার আসন পাইয়াছ কিন্তু জঙ্গিপুরের বিশিষ্ট ভদ্রগণ তোমার স্মৃতি সভায় আগমন অবহেলা ও অসম্মানের জিনিস মনে করেন !!

বিদ্যাসাগরের মত সর্ব্বজনমান্য মহাপুরুষের স্মৃতিসভায় উপস্থিতি কোনও নিমন্ত্রণ পত্রের অপেক্ষা রাখে না ; সামান্য বিজ্ঞাপন বা হ্যাণ্ডবিলই সভা-আহ্বান করার পক্ষে যথেষ্ট। তথাপি প্রত্যেকের কাছে সভায় উপস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষার সামান্য ভদ্রতাটুকু রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি যাঁহাদের হয় নাই তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার করিবেন।

দেশবন্ধুর আবাস।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

দেশবন্ধুর আবাস ঋণের দায়ে বন্ধক ছিল, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। ঐ ঋণের সুদ প্রতি মাসে বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া স্মৃতিভাণ্ডারের ট্রাষ্টিগণ ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ হইতে ঋণ পরিশোধ করিয়া দেশবন্ধুর বাসভবনের উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন। যখন স্মৃতিভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ হইতে অগ্রে ঋণ পরিশোধই করিতে হইবে, তখন অকারণে সেই ঋণ ফেলিয়া রাখিয়া সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে। সার রাজেন্দ্রনাথ সুতীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিষয়ীর মতই পরামর্শ দিয়াছেন। গত ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত দেশবন্ধুর স্মৃতি-ভাণ্ডারে ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও তিন লক্ষ বাইশ হাজার টাকা তুলিতে হইবে, অথচ আগষ্ট মাসের আর দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। বাঙ্গালী কি এই কয়দিনের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা তুলিয়া দশ লক্ষ পূর্ণ করিতে পারিবে না? না পারিলে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর ত্রৈবার্ষিক উৎসব।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

উক্ত মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের কার্য্যকাল শেষ হ'য়ে গেল। আবার ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। জানি না মিউনিসিপাল রাজহস্তী কোন্ ভাগ্যমানকে শুণ্ডে ধারণ ক'রে সিংহাসনে বসাবে। এ ব্যাপারে করদাতাগণের কিস্মৎ কমিশনর নির্ব্বাচনের সময় ফুরিয়ে গেছে। এবারে ১২ জন নির্ব্বাচিত ও ৬ জন মনোনীত কমিশনরগণের মেহেরবাণীর উপর উক্ত পদদ্বয়ের প্রার্থীগণের আশা ভরসা নির্ভর করছে। এই চেয়ারম্যানী ও ভাইস চেয়ারম্যানী ভক্ত যোগ্যতার জিনিস নয়, অনেকস্থলে যোগাড়েরই জয় দেখা যায়।

যিনিই মসনদে বসুন, যোগ্যতা, বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর থাকুক আর নাই থাকুক করদাতাগণের তাতে কিছু আসে যায় না। সহরের ঝাড়ুদারী, রোসনাইদারী, মুদ্দফরাসী আর খেয়া ঘাটের ঘেটেলী কাজ সুশৃংখলার সঙ্গে হ'লেই সহরের ছোট বড় সবাই সেই চেয়ারম্যানকে সাবাসী দিয়ে থাকে। কিন্তু করদাতাগণের এমনি নসীব যে, যে কর্ম্মীগণ এই সব বেগারী আর্থিক লাভশূন্য (?) পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে থাকেন, নিজেদের পেশা ও কাজকর্ম্ম করিবারই সময় তাঁদের কুলিয়ে উঠে না। ২৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৪৮ ঘণ্টার দিন হ'লে তবে নিজেদের সব কাজ ক'রে অবসর পেলে পেতে পারেন। যাঁরা অন্ন সংস্থানের কাজে সমস্ত প্রাতঃকাল ব্যস্ত থেকে পিতৃতর্পণের সময় সমস্ত মন্তর বলবার সময় নাই বলে "আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" বাক্যের দ্বারা দেবলোক পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন ক'রে, তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে, যে ভাতের গরম হাতে সয় না তাই মুখে সইয়ে, জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে কর্ম্মস্থলের দিকে ছুটতে থাকেন,

সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটন খেটে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ধুক্‌তে ধুকতে বাড়ী এসে হাঁপিয়ে পড়েন, তাঁদের দ্বারা এই সব দশের কাজ যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার আশা করা যায় করদাতাগণ তাই পেয়ে থাকে। তাদের ঘটি বাটি তোলা পয়সার কিরূপ সদ্ব্যবহার হয় তা' খোদাই জানেন। কেননা কর্ত্তার নিজের কাজ সেরে সমস্ত সহরের সব কাজ কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা কতদূর সম্ভব তা' সহজেই অনুমেয়। পূর্ত্তকার্য্যের ধূর্ত্ততায় অনেক অর্থ খোলাং কুচির মত উড়ে যায়। আমাদের যতদূর মনে হয়, তা'তে ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান মিঃ ক্যাম্বেল ছাড়া সাধারণকে খুসী করার মত কাজ যে আর কেউ কর্‌তে পেরেছেন বলে বোধ হয় না। বর্ত্তমান চেয়ারম্যান বাবু দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আমলে জঙ্গিপুর ফেরীঘাটীর যেরূপ সুবন্দোবস্ত আছে তা' এ জেলার আর কোনও ঘাটে নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এ ব্যাপারে বর্ত্তমান ইজারদার সাহেবের কিস্মৎও খুব আছে। এটা নামের গুণ কি বাঁশীর গুণ তা' বলা যায় না। তা'ছাড়া "নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি অবসর মত বাসিও" ব্যতীত করদাতাগণ যেন আর বেশী আশা না করেন। আবার দেশের লোক এই কর্ম্মীগণকে মিষ্টি পেয়ে তাঁদের আটী শুদ্ধ গিল্‌বার চেষ্টা করেন। আহা বেচারীরাই বা করে কি? ইস্কুলের ভার? দেও তাঁর ঘাড়ে, পাড়ার শালিসী? দেও তাঁর ঘাড়ে, দশের ফণ্ডের ভার? দেও তাঁর ঘাড়ে, কো-অপারেটিভ ব্যাংক? দেও তাঁর ঘাড়ে। কত কর্‌বে?

ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর মত—

রামরূপে ধনুক ধরে কৃষ্ণরূপে বাঁশী।
চৈতন্যরূপে ডোর কৌপীন প্রভু নবীন সন্ন্যাসী।

ষড়্‌ভুজ হ'য়েও বোধ হয় কুলায় না, মা দশভূজা! তোমার মত দশবাহু না হ'লে যে কর্ম্মীগণ আর কুলিয়ে উঠ্‌তে পারে না। মা! দশবাহু যদি না দিস্‌ তবে যে দশ ডুব্‌তে চল্‌লো মা!

যদি কোন দুষ্ট লোক বলে যে দশে তো এঁদের ঘাড়ে কাজ দেয় না এঁরাই দশের ঘাড়ে চেপে সব ভার নিজেরাই নিয়ে থাকেন, এটা এঁদের কাম্যবস্তু সেই জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরে খোসামোদ ক'রে তক্তে বস্‌বার চেষ্টা পায়। তোমাদের কি আইনের ভয় নাই, একটী প্রাণীর ঘাড়ে এত বোঝা চাপালে সে 'ক্রুয়েল্‌টী টু এনিমল' আইনে পড়ে দণ্ড পাবে।

কমিশনারগণকে এ ব্যাপারে আমাদের বেশী বল্‌বার কিছুই নাই, কেননা দুই একটী কমিশনর ব্যতীত অধিকাংশই আপন আপন "মাষ্টারস্‌ ভয়েস" শুনে মজগুল হ'য়ে আছেন সেটা চিরদিনের জানা কথা।

গান্ধী কথা।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা

পত্রান্তরে প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। তিনি এ বৎসর আর প্রচারে বাহির হইবেন না, আশ্রমে বসিয়া আশ্রম-সংস্কার ও খাদি-প্রতিষ্ঠান চালাইবেন। খাদিকে তিনি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন—খাদিকে তিনি একদিনের জন্যও ফেলিয়া রাখিতে পারেন না। বাঙ্গালায় খাদি প্রতিষ্ঠান

তাঁহার আরদ্ধ কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চালাইতেছেন—একদিকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অপরদিকে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁহারা সহরে খাদি ফেরি করিয়া এক্ষণে বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কুমিল্লার অভয় আশ্রম প্রভৃতি হইতেও খদ্দরের কাজ চলিতেছে। মহাত্মাজীর বাঙ্গালা ভ্রমণের ফল এতদিনে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে—গ্রাম্য লোকেরা খদ্দর পরিধান করিতেছেন। সকল প্রদেশেই যদি এইভাবে কাজ চলে, তাহা হইলে অচিরে মহাত্মাজীর আশা পূর্ণ হইতে পারে।

চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিরক্ষা।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা

কর্পোরেশনে কি ভাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষিত হইবে, ইহা বিবেচনা করিবার জন্য গত জুন মাসে একটি স্পেশাল কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কমিটি রিপোর্টে নিম্ন প্রস্তাবগুলি করিয়াছেন—(১) এঞ্জিনিয়ার মিঃ জে, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবন্ধুর যে পূর্ণাকৃতি তৈলচিত্র কর্পোরেশনকে উপহার দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কর্পোরেশনের সভা গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা হউক। (২) সেন্ট্রাল এভিনিউ নাম বদলাইয়া চিত্তরঞ্জন এভিনিউ রাখা হউক। (৩) শ্যামবাজার নিউপার্কটীর নাম চিত্তরঞ্জন পার্ক রাখা হউক। (৪) সেন্ট্রাল মিউনিসিপাল অফিস বাটীতে চিত্তরঞ্জনের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করা হউক এবং মূর্ত্তি তৈয়ারীর ব্যয় বহন করিতে কৌন্সিলার ও ওলডারম্যানদিগকে অনুরোধ করা হউক। এই মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য ২০ হাজার টাকা পড়িবে বলিয়া বোম্বাইয়ের ভাস্কর মিঃ মাভরে অভিমত প্রকাশ । আমরা এই সকল প্রস্তাবের সমর্থন করি।

স্যার জগদীশের নূতন আবিষ্কার।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা

গত ১৬ই অকটোবর স্যার জগদীশচন্দ্র বসু দার্জিলিং লাট প্রাসাদে গবর্ণর বাহাদুর এবং সমবেত ব্যক্তিদের সমক্ষে উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন উদ্ভিদেরও ঠিক প্রাণীদের মতই মাংসপেশী, স্নায়ু প্রভৃতি আছে। তিনি একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁহার উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন। ঐ সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে ইহা প্রতিপন্ন করেন যে, উদ্ভিদও মানুষের মত কখনও ঘুমায় কখনও জাগিয়া থাকে—সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় একটী গাছের পরীক্ষা আরম্ভ হয়, গাছটী রাত দুপুর পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল, পরে ধীরে ধীরে ঝিমাইতে ঝিমাইতে সকাল ৫টার সময় একেবারে ঘুমাইয়া পড়িল—বেলা দুপুরে আবার জাগিল। ধন্য স্যার জগদীশ বঙ্গের গৌরব।

মহাত্মাজীর অবকাশ গ্রহণ।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধী ১ বৎসরের জন্য রাজনীতিক কার্য্যে রত হইবেন না। ইহার কারণ বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। তিনি যে আশা বুকে লইয়া কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে আশা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে বিজয় বাহিনীকে তিনি প্রতিপক্ষের দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, সে বাহিনী আত্মকলহে ছিন্নভিন্ন। তাহার পর তিনি স্বরাজ্য দলকে কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-মণ্ডলী পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই ; পরন্তু তিনি কংগ্রেসের সাহায্যে নিজের ঈপ্সিত কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন নাই। তাহার পর তিনি স্বরাজ্য দলকে তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতিতে কাজ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দানে সম্মতি দেন।

রাজমুকুট বিক্রয়।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা

রুসিয়ার ভূতপূর্ব্ব হত রাজার রাজমুকুট নিউইয়র্কের বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। উহার ওজন ৫ পাউণ্ড এবং উহাতে ৪ হাজার ক্যারাট পরিমাণ (১ ক্যারাট প্রায় অর্দ্ধ রতি) হীরা আছে। উহার দাম স্থির হইয়াছে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বা প্রায় ৪ কোটি টাকার উপর। এই মুকুটের শেষ ধারীকে কসাইখানায় ছাগল ভেড়ার ন্যায় হত্যা করা হইয়াছিল।

দেশী ও বিলাতী চা-করে মারামারি।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা

পত্রান্তরে প্রকাশ, গত ২৩ শে মার্চ ধুবড়ী ষ্টিমার ঘাটে একজন ভারতীয় ও একজন শ্বেতাঙ্গের মধ্যে বেশ হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন একখানি ষ্টিমার ধুবড়ী ঘাটে পেঁৗছিলে একজন ভারতীয় চা-কর একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট লইয়া ষ্টিমারে উঠে। ঐ ষ্টিমারে একজন শ্বেতাঙ্গ চা-করও প্রথম শ্রেণীতে অবস্থান করিতেছিল। শ্বেতাঙ্গ একান্ত আপত্তিজনকরভাবে প্রশ্ন করে যে, ঐ ভারতীয় যাত্রীরও প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে কিনা? ভারতীয় যাত্রিটী একজন সম্পদস্থ সহযাত্রীর এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া নীরব থাকে। ইহাতে শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীর ধৈর্য্যচ্যুতি হয় এবং ভারতীয়কে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করে। প্রত্যুত্তরে ভারতীয় সহযাত্রীও নিজের জুতা খুলিয়া সাহেবকে আচ্ছা করিয়া উত্তম মধ্যম দেয় ও খাস বাঙ্গালা ভাষায় সাহেবকে গালি দিতে থাকে। ইত্যবসরে ঘাট বাবুরা শান্তিভঙ্গ হইবার আশঙ্কা করিয়া ষ্টিমার কোম্পানীর এজেন্ট ও পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ খুব সতর্কতার সহিত ব্যাপারটীর মীমাংসা করিয়া গোলমাল মিটাইয়া দেয়। অতঃপর এইখানেই ব্যাপারটীর অবসান হয় ও শ্বেতাঙ্গ ভদ্র মহোদয় কথঞ্চিৎ বিমর্ষ ও ক্ষুন্ন মনে উক্ত ষ্টিমারযোগেই যাত্রা করে।

সুভাষচন্দ্রের মুক্তি।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বে-আইনী আইনে ধরিয়া রাখিয়া সরকার গত ১৬ই মে তারিখে বঙ্গের অকৃত্রিম কর্ম্মী দেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়কে মুক্তি দিলাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন আমলাতন্ত্র তাঁহাকে সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত জানিয়াও সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে পাঠাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করায় যখন দেখিলেন সুভাষ মরিতে রাজি তবুও মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে সম্মত নয়, তখন তাঁহার জীর্ণ শীর্ণ দেহখানিকে ছাড়িয়া দিলেন। ভগবান তাঁহাকে রোগমুক্ত করুন তবেই আমরা তাঁহার মুক্তি হইল বলিয়া স্বীকার করিব।

বিধবা বিবাহে মহাত্মা।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধী মাদ্রাজের ছাত্রগণকে শুধু বিধবাই বিবাহ করিতে বলিয়াছেন। মহাত্মা বালবিধবাগণকেই বিবাহ করিতে বলিয়াছেন বোধ হয়। অতি অল্প বয়সে অজ্ঞান অবস্থায় যে সব বালিকা বিধবা হয় তাহাদের পক্ষে বিধবার উচ্চ আদর্শ বা মহৎ কর্ত্তব্য বোঝা দুর্ব্বহ—তেমন বিধবার জন্য বিধবা বিবাহ অবশ্যই কর্ত্তব্য। তবে দেশাচার ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া বাল বিধবাদের মধ্যেও যাহারা পুনর্ব্বিবাহ করিতে রাজী নহেন তাহাদের জোর করিয়া বিবাহ কেহ দিতে চাহে না। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলেই কুমারী বিবাহ উঠিয়া যাইবে এমন মনে করাও ভুল। বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন বাল্য বিবাহ যথাসম্ভব বন্ধ করা। বাল্য বিবাহ বন্ধ হইলেই বাল বিধবার প্রশ্ন থাকিবে না, বিধবার বিবাহ সামাজিক হিসাবে বন্ধ—ইহা হইতে সমাজে নানা অত্যাচার আসিয়াছে—সমাজকে ধ্বংসমুখী করিয়াছে—বর্ত্তমানে ইহা সমাজ সমস্যার সঙ্গে দেশ সমস্যা ও হিন্দুর জীবন মরণ সমস্যা রূপেও পরিণত হইয়াছে। সুতরাং সামাজিকের কর্ত্তব্য হিসাবে ইহার সুসমাধান অবশ্য কর্ত্তব্য। জোর করিয়া ঘরে ঘরে আদর্শ সৃষ্টি করা সম্ভব নহে—তবে আদর্শ বিধবা চিরপূজ্যা এবং তেমন আদর্শ বিধবা বিবাহ সামাজিকভাবে প্রবর্ত্তন হইলেই যে লোপ পাইবে ইহা মনে করাও ভুল। কচি খুকীকে বিধবা সাজাইয়া লাভ নাই। তাই সামাজিকগণ বাল বিধবা যাহাতে না হয় বাল্য বিবাহ রহিত করিয়া আগে সেই ব্যবস্থা করুন।

ঘটক।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা

একখানি পণনিবারনী বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ইহা পণপ্রথার উচ্ছেদ-সাধনার্থ বাহির হইয়াছে। আমরা ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা আশ্বিন মাসের খানি পাইয়াছি। উহার উদ্দেশ্য সাধু। প্রত্যেক হিন্দুর বিশেষতঃ কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালীর পড়া উচিত। বহু পাত্রপাত্রীর নাম ধাম দেওয়া আছে। মূল্য বার্ষিক তিন টাকা। ১৮নং পীতাম্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কলিকাতা হইতে বাহির হইতেছে।

কিং কর্ত্তব্যমতঃপরম্।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

মূর্খ পুত্রের পিতা হওয়া কাহারও বাঞ্ছনীয় নয়। সৌধ অট্টালিকাবাসী ধনী হইতে সামান্য পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই আপন আপন পুত্রকে শিক্ষিত করিয়া পাঁচ জনের মধ্যে একজন করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগে সহরের কথা দূরে থাক বহু পল্লীগ্রামেও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া বালকগণের শিক্ষা দিবার পথ সুপ্রশস্ত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই একটা না একটা স্থানে কলেজ আছেই। তা ছাড়া ডাক্তারী স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার বিদ্যালয়ও বিরল নহে।

পল্লীগ্রামের লোক বাড়ীর খাইয়ে কায় ক্লেশে স্কুলের মাইনে কেতাবের দাম দিয়ে ছেলেকে তো ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করাইলেন। তারপর যাঁরা সঙ্গতিপন্ন তাঁরা সহরে হোষ্টেলে বোর্ডিঙে রেখে কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়ে উচ্চ শিক্ষা দিবার উপায় করিলেন। যাদের "দিন ভিক্ষা তনু রক্ষা" এই প্রকার অবস্থা তারাও 'দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিতঃ' এই আশায় হয় জমি জমা বাঁধা দিয়া বা বিক্রয় করিয়া—বাছা আমার লেখাপড়া শিখে মোটা মাইনের চাকরী ক'রে সব ফিরিয়ে আনবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া ছেলেকে আই, এ, বা আই, এস, সি, পড়তে পাঠালেন। বাছা পাশও করিল। তারপর! বি, এ, কিম্বা বি, এস, সি, পড়াবার ঝোঁক যাঁদের থাকিল তাঁহারা বাড়ীর আঁসস্যাওড়া দূর্ব্বো ঘাসটি পর্য্যন্ত নিঃশেষ ক'রে ছেলেকে শিক্ষিত করিলেন। এইবার ছেলের পালা। দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে বহুদিন বেকার থেকে তারপর হয় স্কুল মাষ্টারী নয় সওদাগরী অফিসে চাকরী ক'রে বাপের বন্ধকী ভিটে রক্ষা করা দূরের কথা নিজের দু'কুড়ি সাতের খেলা রাখতে সামাল সামাল। এই তো হ'ল এক রকমের মুস্কিল।

আবার যারা ম্যাট্রিকুলেশনে তৃতীয় বিভাগে পাশ করিল তাদের কলেজে ঢোকানই দুঃসাধ্য। চাকরী নিতে গেলেও থার্ড ডিভিশন বলিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য হওয়া।

সব ছেলে তো ফাষ্ট ডিভিশনে পাশ করবে না। যারা সেকেণ্ড বা থার্ড ডিভিশনে পাশ হ'লো তাদের যেখানে যা'ক লাঞ্ছনা ভোগ। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বলে—নেব না; মেডিক্যাল কলেজ বা স্কুল বলে—তফাৎ রহো। তখন সে বেচারী ক'রে কি? তাই বলি কিং কর্ত্তব্যমতঃপরম্।

স্বার্থপরতা বনাম পরার্থপরতা।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলে থাকেন—

আপদার্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেৎ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥

আবার তাঁদেরই মুখ দিয়ে বেরিয়েছে—

ধনানি জীবতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাসে নিয়তে সতি॥

একবার তাঁরা বলছেন যে "আপনি বাঁচলে বাপবরাবরের নাম।" আবার বলছেন "পরের জন্য যদি আপনাকে উৎসর্গ না করলে তো করলে কি?" কাজেই লোকে যখন যা' করুক না কেন, নিজের কার্য্যের পোষকতা করবার নজীরের অভাব নাই। সয়তানের অপকর্ম্মের যখন কৈফিয়ৎ আছে তখন যত অপকার্য্যই কর না কেন শাস্ত্র প্রসাদাৎ অনুকূল নজীরের অভাব নাই। তবে একটু চালাকী বিদ্যে জানা থাকা চাই। যে যত চালাক সেই তত কম ঠকে। অন্যকে ঠকিয়ে ধন, মান যশ সবই করতলগত করে ফেলে। ধর্ম্ম বা পুণ্য সেটা যখন চিত্রগুপ্তের খতিয়ান দেখবার উপায় নাই তখন ধরে কে? দৃষ্টান্ত আছে বলি রাজা সর্ব্বস্ব দান করে পাতালে ঠাঁই পেলেন। আর কি এক মুনি এক মুঠো ছাতু দিয়েই অক্ষয় স্বর্গের ব্যবস্থা ক'রে নিলেন।

স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হ'লেও কায়দা-বাজের হাতে প'ড়ে পূর্ণ স্বার্থপরতা পরার্থপরতার উপর টেক্কা মেরে যশের ধ্বজা উড়িয়ে বাহবা নিয়ে থাকে। তবে ম্যাজিসিয়ানের মত সাধারণের চোকে ধূলি দিয়ে অমানুষিক ক্ষমতা দেখান জানা থাকা চাই। হাতের সাফাই ধরা পড়লেই হাস্যাস্পদ হ'তে হয়। স্বার্থপরতা যখন সাফাই হাতের কায়দায় পরার্থপরতার রূপ ধারণ ক'রে লোকরঞ্জন করে তখন চারিদিকে হাততালি পড়ে যায়। এই যে মোহিনী শক্তি যা' হয়কে নয় করে নয়কে হয় করে, এর নাম ভাবের ঘরে চুরি। এই ভাবের ঘরের চোর অন্যের কাছে ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক নিজের বিবেকের চোকে ধূলি দিতে পারে না। অন্যের কাছে ভেল মাল সাচ্চা ব'লে চালান যত সোজা নিজের মনের কাছে চালান তত সোজা নয়। পরার্থপরতাকে আপাততঃ স্বার্থপরতা পরাস্ত করলেও চরমে স্বার্থপরতার পরাজয় অবসম্ভাবী।

'কেউ মরে বিল ছেঁচে কেউ খায় কৈ।
যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ॥'

বেশী দিন চলে না। ভাবের ঘরে চুরি করে যতই বড় হওনা কেন,

আসিবে! এ দিন আসিবে!
যেদিন ও ভুঁড়ি ফাঁসিবে।

হরতাল।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা

সংবাদ আসিতেছে যে ভারতের সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণ হরতাল রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের জঙ্গিপুরেও ইহার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। দোকান হাট সবই বন্ধ ছিল। জাতীয় জাগরণের দিনে সকলেরই এক প্রাণ দেখিলে মনে স্বতঃই আনন্দ আসে। হরতাল অন্তে মা জাহ্নবীর ক্রোড়ে যথারীতি সভা করিয়া সাইমন কমিশন বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। সময়োপযোগী সবই বেশ হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে সে সভায় আমরা সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও মাথা মুরুব্বিবদেব (?) মধ্যে অনেককেই দেখিতে পাই নাই। এবারকার হরতালে ত সাম্প্রদায়িকতার (হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শী, উদার-নীতি, সহযোগী, অসহযোগী সকলেই একযোগে) লেশমাত্র ছিল না। সুতরাং

উক্ত সভায়, যাঁহারা সহরের নেতৃত্বের দাবী করিতে চাহেন, জনমতের দাবী করিতে চাহেন, তাঁহাদের উপস্থিতি আমরা আশা করিতে পারি না কি? উহা ত কোন ব্যক্তিগত সভা ছিল না, উহা ত "চাচা আপন বাঁচা" নীতিমূলক কোন সভা ছিল না—উহা যে ছিল সমগ্র ভারতের অপমানের প্রত্যুত্তর ; সুতরাং সেখানে সকলেরই একমনে একপ্রাণে সমবেত হওয়া উচিত ছিল না কি? এই-জন্যই মহাত্মা অনেক দুঃখে বলিয়াছিলেন যে স্বরাজ কাজে তিনি চাহেন চাষাদের, যাহাদের মধ্যে নাই মারামারি, কামড়া-কামড়ি, ভোটাভোটি। শেষ কথা—সাইমন ত বর্জ্জন হইল ; কিন্তু "ছাইমন" (Bad mind) ত বর্জ্জন করতে পারি না। বিলাতী জিনিষে দোকান ভরিতেছি। বিলাতী জিনিষ রাশি রাশি কিনিতেছি, বিলাতী অনুকরণ ত পদে পদে চলিতেছে, বিলাতী খানা নাহলে ত পেট ভরে না। তাই বলিতে হয় বর্ত্তমান যুগে মুখ চাহি না —বুক চাই ; কথা চাহিনা—কাজ চাই ; মুখের কথায় "গেল রাজ্য গেল মান" বলিয়া ডাক ছাড়িলে চলিবে না। এখন ডাক এসেছে—

"—ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব জিত্বা শত্রূন্
ভুঙক্ষ্ব রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্।"

মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার।

১৩৩৫ সাল ১৫শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা

গত ২০শে ফাল্গুন সোমবার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিপুল জনসমাগম যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার মনে সেই দৃশ্য চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। এরূপ অভূত-পূর্ব্ব বিরাট জনসমাগম কলিকাতার কোন সভা উপলক্ষে খুব কমই হইয়াছে। সন্ধ্যা ৭টার সময় সভা হইবার কথা, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই মহাত্মাজীর দর্শনলাভের নিমিত্ত উৎসুক জনগণ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত পার্ক জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই বিশাল জনসমুদ্রের উদ্বেলিত তরঙ্গ মহাত্মাজীর আগমন প্রতীক্ষায় স্থির ধীর। যখন সমস্ত পার্ক পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন বৃক্ষ, বাতায়ন ও গৃহের ছাদ কোথাও বাকী রহিল না, যে যেখানে পারিল নিজের স্থান করিয়া লইল। সকলেই উৎসুকচিত্তে একজনের দর্শন আশায় পথের দিকে সোৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল—তিনি আর কেহই নহেন, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী।

সেদিনের বয়কট সভা অতীতের অনেক স্মৃতি লোকের মনে জাগরূক করিয়াছিল। এক যুগ হইতে চলিল এমনি দিনে মহাত্মাজী তাঁহার অসহযোগের বাণী লইয়া বাঙ্গালার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই-দিন বাঙ্গালী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল সেদিন তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নিনাদে হিমাচল হইতে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত অখণ্ড ভারতভূমি জাগিয়া উঠিয়াছিল—সমস্ত দেশের বুকের উপর দিয়া নবজাগরণের একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া গিয়াছিল। জাতি আপনার অন্তর্নিহিত সত্তাকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়া এক নব চেতনা, এক অভিনব ভাব দ্যোতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। জাতি বর্ণ মতামত নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায় ও সকল দলের লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহিলা, শিশু ও বালকদিগের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না।

সমবেত জনতার সংখ্যা কমপক্ষে ত্রিশ হাজার। মহাত্মাজীকে আপনার অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিবার নিমিত্তই কলিকাতাবাসী নরনারী একান্ত অনুরাগ ভরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সমবেত হইয়াছিলেন।

সভায় বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছিল। অপরাহ্ন বেলা দুইটার সময় হইতে এই গুজব রটে যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের উপর পুলিশ কমিশনার এই বহ্ন্যুৎসব বন্ধ করিবার জন্য এক নোটীশ জারী করিয়াছেন। সভা আরম্ভ হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কংগ্রেস অফিসে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, কিরণশঙ্কর রায়ের উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে কিন্তু কেহ নোটিশের প্রতিলিপি দিতে পারিল না।

এই সংবাদ সহরে সর্ব্বত্র তড়িৎগতিতে প্রচারিত হইয়া লোকের মনে একটা উত্তেজনার ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। দলে দলে বিক্ষুব্ধ জনগণ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। অবশেষে তিলধারণের স্থান রহিল না।

যখন শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় সভাস্থলে পৌঁছিলেন, উদ্‌গ্রীব দর্শক-মণ্ডলী নোটিশের বিষয় জানিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শ্রীযুত রায় তাহাদিগকে যে নোটিশ খানি দেখাইলেন তাহা এই—

মিঃ কিরণশঙ্কর রায় সম্পাদক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। আপনার স্বাক্ষরিত ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারিলাম যে, চলিত মাসের ৪ঠা তারিখে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক সভায় বিদেশী বস্ত্র পোড়ান হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৪র্থ ধারায় ৬৬(২) উপবিধির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এতদনুসারে প্রকাশ্য কিম্বা জনবহুল রাজপথের মধ্যে অথবা নিকটে খড় বা অন্য যে কোন দ্রব্যাদি দাহ করা নিষেধ। আশা করি আপনি এই আইন ভঙ্গের অপরাধ যাহাতে না হয়, তাহা করিবেন।

স্বাক্ষর সি, টেগার্ট।
কমিশনার

সভাস্থ সমবেত জনমণ্ডলী এই আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করিতে সঙ্কল্প করিল কারণ তাহাদের মতে পার্ক প্রকাশ্য বা জনবহুল রাস্তা নহে।

মহাত্মাজী সভাস্থলে আগমন করিলে গগন-পবন 'বন্দেমাতরম' ও 'গান্ধী মহারাজকী জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। মহাত্মাজী নোটিশের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে তিনি নিজে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন সুতরাং সকলেই যেন বহ্ন্যুৎসবের নিমিত্ত নীরবে বিদেশী বস্ত্র সমর্পণ করেন।

সেদিন সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় যে গোলমাল হয় তাহার ফলে পুলিশ মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়কে গ্রেপ্তার করে। স্যর চার্লস টেগার্ট নিজে মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন। মহাত্মাজী প্রথমে জামিনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হন। অবশেষে শ্রীযুত টি, সি, গোস্বামী, বি, সি, রায় ও জে, সি, গুপ্তের সহিত পরামর্শ করিয়া ৫০ টাকার ব্যক্তিগত জামীন দিতে তিনি স্বীকৃত হন।

মহাত্মাজী ও শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় জামিনে মুক্তি পাইয়াছেন। ২৬শে মার্চ্চ তাঁহাদের মামলা উঠিবে।

ন্যায়ের শাসন দণ্ড।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

জীবমাত্রেরই ধর্ম—খাদ্য সংগ্রহ ও শত্রু হইতে আত্মরক্ষা (To obtain food and to avoid enemies) উদ্ভিদভোজী প্রাণীগুলি কোন প্রাণীকে আহার করে না। কিন্তু মাংসাশী প্রাণী মাত্রেই হয় দুর্বল প্রাণীগুলিকে ধরিয়া আহার করে না হয় মৃত সবল প্রাণীকে আহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া বাঁচিয়া থাকে। মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য জীব প্রকৃতির নিয়মাধীন। যেমন সকল বাঘই মাংসাশী এবং গরু ও ছাগ মাত্রেই উদ্ভিজ-ভোজী। মনুষ্যের সময় কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। দেশ, ধর্ম ও জাতিভেদে মনুষ্যের খাদ্য পানীয়ের ভেদ লক্ষ্য হয়। অন্যান্য প্রাণীগণের খাদ্য ও পানীয় হইলেই যথেষ্ট। মনুষ্যগণ বিশেষতঃ সভ্য মনুষ্যগণ শুধু আহার ও পানীয় পাইলেই যথেষ্ট হইল মনে করে না। অন্যান্য জীবগণ দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলেই পরিতৃপ্ত হয়। এই শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আর একটী ক্ষুধা আছে সেটী দেহের নয় মনের। দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে জিনিষের দরকার হয় তাহার একটা পরিমাণ আছে। কেহ আধসের, কেহ তিনপোয়া, কেহ একসের পর্য্যন্ত আহার করিতে পারে; তাহার বেশী দিলে সে ঘোর আপত্তি করিয়া অনিচ্ছা প্রদর্শন করে। কিন্তু মনের ক্ষুধা নিবারণের জন্য কার যে কত বরাদ্দ আছে তাহা সেই বলিতে পারে না, সেইজন্য প্রাচীন কবি বলিয়াছেন—

> তন্‌কী ভুখ্ তন্‌ক্ হ্যায়
> তিন পাও কি সের।
> মনকী ভুখ্ অনেক হ্যায়
> নিগলৎ মেরু সুমের॥

অর্থাৎ শরীরের ক্ষুধা অতি সামান্য—তিনপোয়া বড় জোর একসের হইলেই যথেষ্ট, কিন্তু মনের ক্ষুধা এত বেশী, যে সুমেরুর সমান দ্রব্যেও তাহার নিবৃত্তি হয় না। এই শেষোক্ত ক্ষুধার জন্যই মানুষে মানুষে অমিল। এই জন্যই এক রাজা অন্য রাজার রাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্য যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এক জমিদার অন্য জমিদারের জমিদারী দখল করিবার জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হন। এক ভাই আর এক ভাইকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্যে বঞ্চিত করিবার জন্য নানারূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে।

যাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহাতে বঞ্চিত করা যে অন্যায় ইহা কি কেহ বোঝে না? নিশ্চয় বোঝে। কোন্‌টী ন্যায় কোন্‌টী অন্যায় তাহা সকলেই জানে। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট যে ব্যবহার পাইতে রাজী নয়, সেই ব্যক্তি আর একজনের প্রতি যদি সেই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাই অন্যায় ব্যবহার, এটা সেও জানে। তবে এ অন্যায় লোকে করে কেন? তাহার কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এই চারি রিপু প্রাণী মাত্রেরই আছে। মনুষ্য শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া তাহার আরও দুইটী অধিক রিপু আছে। সে দুটী মদ ও মাৎসর্য্য। আমাকে আমার পারিপার্শ্বিক সকল অপেক্ষা বড় হইতে হইবে এই আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কুপথে চালিত করিয়া এই অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত করিয়া থাকে। সকলের চেয়ে বড় হইবার মসলাই হচ্ছে ধন সম্পত্তি ও প্রভুত্ব ইহাই

সাধারণ মানবের বিশ্বাস। আমি উচ্চ আসনে বসিয়া আমারই মত মানুষকে কুক্কুর শৃগালের মত ব্যবহার করিব আর তাহারা আমার পরাক্রমে ভীত হইয়া অবনত মস্তকে ভূম্যাসনে বসিয়া বিনা আপত্তিতে সেই ব্যবহার সহ্য করিবে এই জঘন্য আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে পরস্বাপহারী সয়তান করিয়া তোলে। মানুষের প্রতি মানুষের এই অত্যাচার নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনের জন্যই রাজা আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। রাজাও যথেচ্ছাচারী আখ্যা লইতে রাজী নন। সেইজন্য দেশের মাতব্বর মাতব্বর জ্ঞানী লোক নির্বাচন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অনুমোদিত দেশের উপযোগী আইন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই আইন প্রয়োগ করিবার জন্য দেশকে নানা অংশে বিভক্ত করিয়া নানা শ্রেণীর বিচারক নিযুক্ত হইয়া থাকে। মহকুমার হাকিম যদি ভুল করেন তাহার জন্য জেলার হাকিম তাঁহার বিচারের উপর বিচার করেন। জেলার হাকিমের ভুল হইলে হাইকোর্টের হাকিম সেই বিচার সুবিচার হইয়াছে কিনা তাহা দেখিয়া থাকেন। ইতিহাসে এমন বিচারকেরও সংবাদ পাওয়া যায় যিনি বিচার আমলে স্বীয় একমাত্র পুত্রকে হত্যা অপরাধে অপরাধী দেখিয়া তাহাকে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া নিজের বক্ষকে পুত্রশোকে জর্জরিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। আবার এমনও বিচারকের সংবাদ পাওয়া যায় যিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া পক্ষপাতিত্ব করিতে গিয়া বিচারকের আসনচ্যুত হইয়া আসামীর আসনে দাঁড়াইয়া আইনানুসারে অপরাধী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। আবার কেহবা অপরাধী শ্রেণীভুক্ত হইয়া পাক্কা মামলাবাজের মত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তথাকথিত ভদ্রলোকগুলিকে খোসামোদ করিয়া ও মাকাল ফলে রাখাল ভুলাইয়া সন্দেহের ফল পাইয়া মুক্ত হইয়াছেন বটে কিন্তু উপরিতন রাজপুরুষগণ আইনের কবলে না পাইয়া তাঁহাকে বিভাগীয় নিয়মে যাবতীয় উচ্চ ক্ষমতায় বঞ্চিত করিয়া ঢোঁরা সাপের মত বিষ ও ফণাহীন করিয়া রাখিয়াছেন। রাজার ক্ষমতা অসীম। তবুও রাজার রাজা সম্রাটের সম্রাট ভগবানকে তাচ্ছল্য করেন না। বিচারালয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ভগবানের নামে শপথ লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সামান্য পাহাড়াওয়ালাকে চাকরী দিবার সময়—"ভগবানকা (খোদাকা) নাম লেকে বলতেহেঁ ভর সহর কলকাত্তাকা চৌকিদারী নোকরী আপনা জানসে বাজা-মেঙ্গে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা লইবার ব্যবস্থা আছে। যদি কোন সরকারী কর্মচারী তাহার অন্যায়ের পোষকতা করার জন্য দেশবাসীর সহায়তা লাভ করে, তবে সে দোষ রাজার না দেশবাসীর? কিছুদিন আগে এক যাত্রার দলে একটী গান শুনিয়াছি, তাহা এত মধুর ও এত ভীতিপ্রদ যে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে কি হয় তাহা এই গানে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

"সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান!
ওই শোন তার গরজে কম্বু, অম্বুধি যথা উচ্ছলে,
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে, বজ্র গভীর কল্লোলে,
হুঙ্কার শুনি জলদমন্দ্র, কাঁপিছে তারকা সূর্য্য চন্দ্র,
বদ্ধ আকাশ, স্তব্ধ বাতাস কাঁপিয়া উঠিছে জগৎপ্রাণ সাবধান!
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ,
ভাবিতেছ বুঝি পলাবে কেহ,
এখনও চরণে শরণ নেহ,

নতুবা নাহিক পরিত্রাণ।
সাবধান!"

পূতনা রাক্ষসীর স্নেহ।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

হিন্দুমাত্রেই জানেন—যখন বৃন্দাবনে (গোকুলে) শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার কোলে স্তন্য-পায়ী শিশু, সেই সময়ে কংস রাজা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পূতনা রাক্ষসী বালকের প্রাণ সংহার করার জন্য স্বীয় স্তনে বিষ মাখাইয়া কপটস্নেহ দেখাইতে নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূতনা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া যখন সেই বিষাক্ত স্তন্য তাঁহার মুখে দিল অন্তর্যামী ভগবান তাহার মতলব বুঝিতে পারিয়া সেই শিশু মূর্তিতেই রাক্ষসীর স্তনে এমন টান দিলেন যে সেই টানেই পূতনা ইহলীলা সম্বরণ করিল।

আজ ভারত বিশেষতঃ বাংলা এই পূতনার স্নেহ বুঝিতে না পারিয়া স্তন্য দুগ্ধের সহিত পলে পলে বিষ পান করিয়া মরণ পথের যাত্রী হইতে বসিয়াছে। পূতনাটী কে? তাহাকে সকলেই জানেন, চেনেন, বধ করিবার প্রবৃত্তিও আছে, কিন্তু বোধ হয়, রাক্ষসীর মায়া কাটাইতে না পারিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকেই বরণ করিতেছেন। বিদেশীর অনুকৃতি ও বিদেশী পণ্য ব্যবহার প্রিয়তাই এই ঘোর অনিষ্টকারিণী পূতনা। লোভ-দানবরূপ কংস কর্তৃক প্রেরিতা। নানা সময়ে নানারূপ ধারণ করিয়া আমাদের ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে।

১ম রূপ শিক্ষা—শিক্ষা নাম দিয়া যে সর্বনাশের পথ ধরিয়াছি—চরিত্রে উপেক্ষা, সংযমের যম, উচ্ছৃংখল ভোগ-বিলাসের প্রসারণ, সর্বোপরি মানুষের জীবনের মূল সম্বল স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নষ্ট করিয়া দেশের একদল লোক পেটের দায়ে নিজেদের স্বাধীন চিন্তা বলি দিয়া এই বর্তমান শিক্ষা প্রচারে লাগিয়া গেল। এই শিক্ষার একটা আকর্ষণী মোহ থাকিলেও উহা আত্মহত্যার নামান্তর। এই শিক্ষা ভারতবাসীর অভাববোধ বাড়াইয়াছে, কিন্তু যে অভাব পূরণ করিবার শক্তি দেওয়া দূরের কথা বরং পূর্বে যে শক্তিটুকু ছিল তাহাও হরণ করিয়া লইয়াছে। এই শিক্ষা ভাবপ্রবণ ভারতবাসীদিগকে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীগুলিকে ভাবের স্বপ্ন-জগতে লইয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানীর লোকদিগের মত ইহাদেরও ভোগ করিবার আকুল বাসনা জাগাইয়া দিয়াছে। এই শিক্ষা মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়া, বলে, সংযমে, ধর্মে আরও দুর্বল করিয়া পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার শক্তি কাড়িয়া লইয়া ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি মন্ত্র শিখাইয়াছে। এই শিক্ষায় সুশিক্ষিত যুবক ভোগপ্রাণ হইয়া ভোগ বিলাসের ইন্ধন যোগাইবার জন্য ২০/২৫ টাকা বেতনের অতি ঘৃণিত চাকরীগিরীর জন্য লালায়িত হইয়া পর-পদ লেহন করিয়া ধন্য হইতেছে। চিরস্থায়ী, হীন, পরাধীনতার প্রবর্তক এই শিক্ষা, মনুষ্যত্বহীনতার নিদান এ শিক্ষা তোমাদের কাঁচপ্রাণগুলিকে পূতনার স্নেহে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। আফিং খাওয়াইয়া পরাক্রান্ত সিংহ ব্যাঘ্রকে যেমন করিয়া বশ ও পঙ্গু করে তেমনি করিয়া এই শিক্ষার সভ্যতায় কুহকিনী ভোগ লালসায় বশীভূত ও আত্মবিস্মৃত

ধ্বংসোন্মুখ বিভ্রান্ত জাতির হৃদয়কে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। ওগো উন্মাদের দল ! তোমরা ভোগের দিকে যাইবে যাও, কিন্তু বল দেখি—সবল, সুস্থ, স্বাধীন, স্বাবলম্বী জাতির ভোগ কি একই ? সবল, সুস্থ ব্যক্তির আমোদ উল্লাস, নৃত্য, গীত, আর মৃত্যুর দুয়ারে আগত বিকারগ্রস্ত জাতির প্রমোদবিলাসের পার্থক্য নাই কি ? বিলাস সাজে ঐ ইংরাজের, আমেরিকানের, তুর্কীর ; ভোগ সাজে ঐ জাপানীর, রাশিয়ানের, ইতালীয়ানের।

স্বীকার করি,—এ বসুন্ধরা ভোগের জন্য ; কিন্তু সে বীরের ভোগের জন্য—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পরাধীনতার বজ্রদহনে তোমাদের আত্মদেবতার মন্দির, সন্তানের স্বাস্থ্য পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, আফগারী তোমাদের সঙ্গে চিরসৌহৃদ্য পাতাইয়াছে।

তোমরা সুধাভ্রমে পুতনার স্তন্যে চুমুক দিয়াছ। বিষ মজ্জায় প্রবেশ করিয়া তাহার ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে। পুতনার স্নেহপাশ ছিন্ন না করিলে তিল তিল করিয়া মরিয়া অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

তোমাদের দূরে হ'তে প্রণাম করি।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

হে অতিমানবগণ ! আমরা তোমাদের প্রণাম করি। তোমরা নানা গুণে বিভূষিত, মোহনভ্রান্তি বিশিষ্ট, আমাদের অপেক্ষা বহুল ধন-মান-যশ-যুক্ত। অতএব আমরা তোমাদের প্রণাম করি।

তোমরা হর্তা-দেশীয় অপগণ্ডের, তোমরা কর্তা—স্ব স্ব গৃহিণীর, তোমরা বিধাতা—আশ্রিতগণের। অতএব আমরা তোমাদের প্রণাম করি।

তোমরা একরূপে সভামধ্যে দেখা দাও, আর একরূপে গৃহমধ্যে বিরাজ কর এবং আর একরূপে গোপনে গোপনে উচ্চ রাজকর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ কর—অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে আমরা তোমাদের প্রণাম করি।

তোমাদের সত্ত্বগুণ তোমাদের বক্তৃতাতে প্রকাশ ; তোমাদের রজোগুণ রেলে ফাষ্ট ক্লাসে যাতায়াত ও নবজামাতৃ পোষাকে প্রকাশ ; আর তোমাদের তমোগুণ তোমাদের পরস্পরের গাত্রে নিক্ষিপ্ত কর্দ্দমে প্রকাশ। অতএব হে ত্রিগুণাত্মক আমরা তোমাদের প্রণাম করি।

তোমরা অসৎকে দিবার ব্যবস্থা কর সুতরাং তোমরা 'সৎ'। তোমরা রাজনৈতিক সমরের পাঁয়তাড়াতে 'চিৎ'। তোমরা স্ব স্ব ধামাধরা পরগাছা-কুলের "আনন্দ"। অতএব হে সচ্চিদানন্দ আমরা তোমাদের প্রণাম করি।

'ভূত' পুণ্যে অধুনা ডাণ্ডা সমর্থনে তোমরা পাণ্ডা, 'বর্তমানে' সর্ব-ঠাণ্ডাবারী সর্বশক্তিমানের পার্শ্বশোভার গণ্ডায় আণ্ডাদাতা 'ডিটোমারা' অনুগৃহীত ভক্ত। ভবিষ্যতে তোমরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া উপাস্যের গুণকীর্তন করিবে আর আমাদের ত্যক্ত-নিষ্ঠীবন-বৎ দূরে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিবে। অতএব হে ত্রিকালজয়ী আমরা তোমাদের প্রণাম করি।

তোমরা ব্রহ্মা, কারণ বহু লীগ, পার্টি, এসোসিয়েসন সৃষ্টি করিয়াছ ; তোমরা বিষ্ণু, কারণ চাঁদারূপে কমলা তোমাদের কৃপা করেন। তোমরা শিব,

কারণ তোমাদের নন্দী, ভৃঙ্গী, ষণ্ডাদি আছে। অতএব তোমাদের দূরে হ'তে প্রণাম করি।

তোমরা দিবাকর কারণ তোমরা সকলকে পথ দেখাইতেছ। তোমাদের কৃপায় আমাদের চোখ ফুটিয়াছে।

তোমরা অগ্নি কারণ ব্যাকরণ-দুষ্ট ভাষা ও পরের ছেলের মাথা অবলীলাক্রমে হজম কর।

তোমরা কভু Liberal Extremist এবং কখন undiluted non-co রূপ লীলা করিতে কুণ্ঠিত হও না। অতএব হে লীলাময় আমাদের প্রণাম লহ।

অ-বাঙ্গালীর অভিযান।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

আজ বাঙ্গালী নিজের দেশে পরমুখাপেক্ষী, পরের দাস। বাঙ্গালী আজ শুধু পরের কারবারে কেরাণীবৃত্তি করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করে। বাংলা দেশে আজ অ-বাঙ্গালীতে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেইখানেই দেখিতেছি যে বাংলার বাহিরের লোক আসিয়া বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে। শুধু তাই নয়, বাংলার সম্পদে এই সব অ-বাঙ্গালীর দল নিজের পেট মোটা করিয়া আজ তারা লক্ষপতি ধনকুবের। বাংলার একচেটিয়া ফসল যে পাট, সেই পাটের বাজারে বাঙ্গালীর দেখা মেলে না। পাট চাষ করে বাঙ্গালী চাষী, পাট কেনে ডাণ্ডীর সাহেব। কিন্তু মাঝ থেকে মাড়য়ারী বা ভাটিয়া লাভ খাইয়া আজ স্ফীতোদর, অথচ বাঙ্গালী চাষীর ঘরে আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন, "বৃটিশ জাতি বাংলাকে তত শোষণ করে নাই, যত করিয়াছে মাড়য়ারী বা অন্য দেশের লোক।" সত্যই তাই, আজ মাড়য়ারী, ভাটিয়া, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, পশ্চিমা, সকলেই বাংলার বুক জুড়িয়া বসিয়া বাংলার রক্ত শোষণ করছে এমন কি বাঙ্গালীর এমন সাধের একাধিপত্য যে কেরাণীগিরি, তাহাতেও মাদ্রাজী আসিয়া ভাগ বসাইতেছে। "বর্গীর" দৌরাত্ম বাংলায় চিরদিনই সমান আছে! আফিসে সাহেবেরা মাদ্রাজীকে বেশী পছন্দ করেন। কারণ তাঁরা বাঙ্গালীর চেয়ে "better servants." তাঁরা নাকি বেলা সাড়ে ৯টা থেকে রাত ৭/৮টা পর্য্যন্ত নিরভিমানে কাজ করেন এবং দু চারটা গালি মন্দ দিলে বড় কথা কহেন না। কিন্তু বাঙ্গালী নাকি তা নয়। তাদের self-respect (?) বলে একটা জিনিস আছে, তারা ৮ ঘণ্টার বেশী কাজ করতে রাজী নয়, এবং একটু কটু কথা শুনিলেই তারা নাকি সময় সময় insubordinate হয়ে পড়ে। কাজেই better servants রা বেশী preference পায়।

বাঙ্গালী অলস, কর্ম্মবিমুখ, আমার প্রিয় জাত। ইহা কি শুধু বাঙ্গালীরই দোষ। এর জন্য প্রধান দোষী করুণাময়ী প্রকৃতি দেবী। তিনি মুক্ত হস্তে এরূপ দান যদি না করতেন, তা হ'লে বাঙ্গালী আজ এতটা শ্রমবিমুখ হ'ত না। ভারতের অন্য জাতির মত সেও জীবনসংগ্রামে অটল থাকৃত। বাঙ্গালী জানে তার ক্ষেতে সোণা ফলে, দু আঙ্গুল দিয়ে মাটী আঁচড়ে যদি ধান ছড়িয়ে দেওয়া যায় তো দু মাস বাদে ক্ষেতে ক্ষেতে সোণার ঢেউ খেলে যায়। বাংলার নদ,

নদী, তড়াগ, সরিৎ বার মাসই মৎস্যে পূর্ণ। বাংলার বনে বনে অজস্র সম্পদ। বাংলার আকাশ, বাতাস দেবতার কল্যাণময় আশীর্বাদে ভরা। প্রকৃতি দেবী তাঁর এই আদরের দুলালদের অজস্র দান করে তাদের সর্বনাশ করেছেন। অল্পায়াসে প্রচুর শস্য লাভ করে বাঙ্গালী আজ অলস। যুগ যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে এই বাঙ্গালী এই enervating আবহাওয়ার মধ্যে থেকে এবং প্রকৃতির এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করে সে আজ কর্মবিমুখ। অথচ বাংলার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের খবর পেয়ে দলে দলে 'ভিন্‌দেশী' ভিখারী ও বেনিয়ার দল আজ বাংলার মাটী কামড়ে পড়ে আছে। অথচ আত্মভোলা বাঙ্গালী শুধু তাই দেখ্‌চে, কিন্তু কিছু করতে পারছে না। বাঙ্গালীর so-called prestigeই তাকে মেরেছে মার্‌ছে এবং মার্‌বে। বাঙ্গালী যদি না আজও তার এই আলস্য ঝেড়ে ফেলে জীবন যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তা হ'লে অদূর ভবিষ্যতে বাংলায় বাঙ্গালীর চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না। বাংলার তরুণ, তোমরা চাকরীর মোহ ত্যাগ করে, এই বিকৃত prestige জলাঞ্জলি দিয়ে একবার এই ভিন্‌ দেশীয়ের সঙ্গে পাল্লা দাও তো—দেখি ওরা কোথায় থাকে। আমাদের দেশের ফসল বাংলা মায়ের বুকের পীযূষ—ভিন্‌দেশীয় এসে তাই বিদেশে চালান দিচ্ছে—পয়সা করছে। তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও, দেশের ফসল যদি বাহিরে পাঠাইতে হয়, তোমরা পাঠাও, ভিন্‌ দেশীয়ের যেন তাতে কোন হাত না থাকে। ১লা জানুয়ারী ১৯৩০ সালে স্বরাজ আসুক—আর নাই আসুক, ১লা জানুয়ারীর পূর্বে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও, বাংলাকে বাঁচাও, বাঙ্গালীকে বাঁচাও। এই কথাই স্যার গজনভী তোমাদের বলেছেন। তিনি বলেছেন, "ওহে ভদ্রলোকগণ, তোমরা চাষা হও।" জামা কাপড় জুতা পরে চাষা নয়। ঠিক চাষার মত চাষা। লাঙ্গল কাঁধে, ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে মাঠে মাঠে কাজ কর। শুধু কাগজে আন্দোলন করে চাষা হলে হবে না।

বাঙ্গালী যখন চাকরীর মোহে দলে দলে B.A., M.A. পড়ছে, তখন অ-বাঙ্গালী এসে ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের কায়েমী বন্দোবস্ত করে নিলে। বাঙ্গালীর বাড়ীতে দারোয়ানী করিতে যে আসিয়াছিল, সে আজ বড় ইংরাজের আফিসের 'বেনিয়ান'। ইংরাজ রাজত্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সহর এই কলিকাতা আজ অবাঙ্গালীতে অর্দ্ধেক গ্রাস করেছে। সমস্ত ব্যবসা অ-বাঙ্গালীর হাতে। কলিকাতা সহরে বাঙ্গালী মুটে নাই, ফেরিওয়ালা নাই, গাড়োয়ান নাই, আফিসের বেয়ারা, দরওয়ান সব অ-বাঙ্গালী, পোষ্ট পিয়ন অ-বাঙ্গালী। এমন কি, অ-বাঙ্গালী গুণ্ডা ডাকাতের ভয়ে কলিকাতা, এবং তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকল সন্ত্রস্ত। আজ বাঙ্গালী তার মোহ কাটিয়ে উঠে সবিস্ময়ে চারিদিকে শুধু দেখছে যে, সে আজ কত দুর্বল, কত অসহায়, কত গরীব।

ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ? বাঙ্গালী কি তবে লুপ্ত হয়ে যাবে ? যে দুই চার জন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী আছেন তাঁরা কি কোন প্রতিকার করিতে পারেন না ? মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া ব্যবসায়ীর স্বজাতিপ্রীতি অনুকরণীয়। তাহারা স্বজাতিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। সেই কারণে কাপড়ের বা পাটের কারবার মাড়োয়ারীর একচেটিয়া এবং বোধ হয় এই কারণেই অধিকাংশ alluminium বাসনের দোকান আজ ভাটিয়ার হাতে। অথচ ব্যবসায়ে অ-বাঙ্গালীর religious scruple কিছুই নাই। তাহারা অবাধে ঘৃতে সাপের চর্বি মেশায়, আটা, ময়দা, তেলে ভেজাল চালায়, ধর্মের নামে পিঁজরা পোল তৈয়ার করিয়া

তাহা হইতে একটা মোটা আয় করে—আবার প্রত্যহ গঙ্গাস্নান সারিয়া এক পয়সার চিনি পিপড়ার গর্তে ছড়াইয়া দিব্য ব্যবসা চালায়।

মহাপ্রয়াণে।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা

সুদীর্ঘ ৬২ দিন কাল প্রায়োপবেশনে থাকিবার পর বাঙ্গলার গৌরব যতীন্দ্রনাথ গত ২৮শে ভাদ্র লাহোরের বোরষ্টাল জেলে আত্মবলি দিয়াছেন। রাজবন্দীদিগের প্রতি শক্তিমত্ত মদোদ্ধত সরকারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি যে মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিজের সর্বাপেক্ষা প্রেয়কে অকুণ্ঠিত-চিত্তে বিসর্জন দিয়া তিনি সে ব্রত উদযাপন করিয়া গেলেন। মানুষ নিত্য মরিতেছে—রোগে, শোকে, দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে মরণের বিরাম ত তাহার নাই—কিন্তু এই যে মৃত্যু, এমন গৌরবময় মৃত্যুকে কয়জন এমন অবিচলিতচিত্তে বরণ করিতে পারিয়াছে? কয়জনের ভাগ্যে এমন মহান আত্মদানের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে? সমরক্ষেত্রে কামানের ভৈরব গর্জনের সহিত রণ-দামামার উদ্দাম তালে তালে নহে দেশবাসীর করতালি ও অজস্র প্রশংসাবাণীর মধ্যে ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মদান নহে, ক্ষণিকের উত্তেজনা বা উম্মাদনায় কাহাকেও মারিয়া মারিবার উম্মাদ ও উদভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষায় নহে আত্মীয় পরিজন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্না-বস্থায় নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকারাগারে অত্যাচারের প্রতিবিধান কামনার দৃঢ় সংকল্প লইয়া এই যে নীরবে নিঃশব্দে তিলে তিলে মরণকে বরণ করিয়া লওয়া, অবিচলিতচিত্তে উদ্দেশ্য সাধনের কঠোর পথে এই যে অনাহারে অনশনে আত্মবলিদান—আত্মাবদানের এমন গরিমাময় আদর্শ, মরণ-ত্রস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে অশেষ গৌরবের হইলেও আমরা আজ তাঁহার মহাপ্রয়াণে গৌরবের গর্বের সহিত বিয়োগের মর্মান্তিক বেদনা কোনমতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। কতখানি আত্মার বল থাকিলে মানুষ যে এমন করিয়া তাহার অভীষ্টের পায়ে আত্মবলি দিতে পারে, সে কথা ভাবিয়া আজ আমরা মরণ-জয়ী মহাবীর যতীন্দ্রনাথের নিকট শ্রদ্ধায় শির অবনত করিতেছি।

২৫ বৎসরের এমন টাটকা তাজা প্রাণটা এভাবে বলি দিবার অনুপ্রেরণা যে যতীন্দ্রনাথের জীবনে এই নূতন দেখা দিয়াছিল, তাহা নহে। ১৯২২ সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজরোষে পড়িবার সৌভাগ্য তাঁহার জীবনে বহুবারই ঘটিয়াছিল। মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে অবস্থান করিবার সময় তিনি একবার মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন এবং ঢাকা জেলেও কারাকর্তৃপক্ষের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদকল্পে ২৩ দিন কাল অনশনে থাকিয়া তিনি আর একবার "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন। রাজশক্তির ঔদ্ধত্যকে তখন আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে যেমন পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, এবারও তদপেক্ষা অধিকতর অপমানজনক পরাজয় মানিয়া লইতে হইল। আইরিশবীর ম্যাকসোয়েনীর পরে যতীন্দ্রনাথের ন্যায় এভাবে আত্মবলিদানের অপূর্ব দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার এই মৃত্যুবরণে—আজ কবির সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে—

"হে অমর নব সন্ন্যাসী তব—
গৌরবগাথা হবে না নীরব,

হালের বিষাণ গাহিয়া সে গান
আবার জাগাবে ধীরে—
চিতার আগুণ জ্বলিবে দ্বিগুণ
আবার আসিও ফিরে।"

বিবাহে স্বরাজ।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা

হিন্দুদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে। অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ এসব অদৃষ্টের লিখন। এতে মানুষের হাত নাই। এতদিনে সে সংস্কার সম্পূর্ণরূপে দূর হতে চলেছে। জন্ম মৃত্যু এই দুইই আইনের আমলে এসেছিল। ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার পরেই সরকারের সেরেস্তায় জমা ক'রে দিয়ে আসতে হয়। মৃত্যু হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার খরচ লিখিয়ে দিয়ে আসতে হয়। চিত্রগুপ্তের খতিয়ানের সঙ্গে ইংরাজের মরাজন্মের খতিয়ান মিল ক'রে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে ঠিক মিলেছে। যদি কেহ ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক মরা জন্ম গোপন করেন তিনি আইনের আমলে আসবেন। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় গৃহস্থকে নিজেই আপিসে গিয়া জমা খরচ লিখিয়ে আসতে হয়। পল্লীগ্রামের হিসাব থানায় লিখিয়ে দেয় গ্রাম্য চৌকীদার। মরা জন্ম গোপন হ'লে চৌকীদারের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারটী আইনের আমলে আসে নাই। এবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের মেম্বর সর্দার কৃপায় সে আপশোষ আর থাকলো না। বিবাহের বয়স বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার কম বয়সে বিবাহ দিলে বা বিবাহ করলে কন্যাকর্তা, বর বা তৎসম্পর্কীয় অন্য উদ্যোক্তা বা সাহায্যকারী সকলেই আইনের আমলে আসবে। শুধু তাইনয় সহবাস সম্মতিরও বয়স বেঁধে দিয়েছে। তার আগে স্বামী স্ত্রী যেন ভাশুর ভাদর বৌয়ের মত বসবাস করে। কসুর হ'লেই শ্রীঘর। কাজেই পূর্ণ ১৪ বছরের আগে কেউ বিবাহিত হ'তে পাবে না আর পূর্ণ ১৬ বছরের আগে সন্তানের মা বাপ হ'তে পারবে না। হায়! হায়!! জন্ম আর বিয়ের মত মরণটারও যদি একটা বয়স বেঁধে দিয়ে আইন তৈরী হ'তো তবে অকাল মৃত্যুটা একবারে উঠে যেতো। সর্দা সাহেব সেটা যদি করেন তবে দেশের লোকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। আর এই আইনের জন্য যা'দের মনে কষ্ট হ'য়ে তাঁকে গালাগালি করছে তারা তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে।

দেশের লোক স্বাধীনতা চায়। নিজের দেশ শাসন করার ভার নিজেরা নিতে চায়। এমন সময়ে যে সমস্ত সামাজিক কাজ নিজেদের আয়ত্তাধীনে ছিল তাও বিদেশী শাসনের হাতে দিয়ে বিবাহে স্বরাজ লাভটা ক'রে ফেললো। কংগ্রেসী সদস্য দুই চারজন বাদে সবাই এতে মত দিয়ে কংগ্রেসের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। নেতা বাহাদুরদের বড় বড় মাথা যে আইন তৈরী করেছেন তাতে কোন কিছু বলতে গেলেই অতি বুদ্ধির দল হাঁ, হাঁ, ক'রে উঠবে। এই আইনের প্রতিবাদ ক'রে নানা স্থানে সভা সমিতি হ'য়েছে। কোন সভায় আইনের সমর্থক সম্প্রদায় গোলমাল মারপিট ইত্যাদি করতে কসুর করেন নি।

যার যেমন রুচি। মেয়ের বিয়ে দেওয়া যেমন কঠিন সমস্যা। তাতে প্রায় সকল ভদ্রলোকই ১৬/১৭ বৎসরের পূর্বে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। যে প্রথা আপনা আপনি চলিত হ'য়ে আসছিল তা' আবার আইনের জাঁতিকলে ফেলবার কি দরকার ছিল। এতে মামলা মোকদ্দমা বাড়বে ছাড়া কমবে না। দেশ সব নিজের হাতে চায়, এমন সময় দেশের নিজস্ব জিনিস বিদেশীর হাতে তুলে দিয়ে দেশনেতারা যে স্বরাজের প্রথম নমুনা দিয়েছেন তা' উপভোগ করুন তারপর অন্যান্য বিষয়ের স্বরাজ আসছে। শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্।

ধর্মহীন বিদ্যার কুফল।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

আজকাল ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে মূর্খতাই যে অতি প্রবল এই একটা নিন্দা দেশে দেশে প্রচারিত হইয়া যাইতেছে। যে আর্য্য জাতি সর্ব প্রথমে বিদ্যার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহারাই আজ মূর্খ বলিয়া অভিহিত হয় ইহা নিতান্তই অদৃষ্টের দোষ। পূর্বে গ্রামে গ্রামে টোল পাঠশালা ছিল, মূর্খ কেহ থাকিত না। পাশ্চাত্যের আদর্শে সে সকল উঠিয়া গেল আর পাশ্চাত্যের আদর্শে বিদ্যালাভের চেষ্টায় ভারতেব লোকের স্বাভাবিক আনন্দ-ভাব, তেজ, শক্তি, নীতি, ধর্ম—কোথায় ভাসিয়া গেল। বিদ্যাদান এখন পরহস্তে গিয়াছে, বিদ্যালাভে বিষম ব্যয়বাহুল্য ঘটিয়াছে এবং বিদ্যালাভের বর্তমান প্রথার প্রভাবে কোমলমতি শিশুগণ পাঠ্য ও স্বাস্থ্য হারাইতে বসিয়াছে। এখন লেখাপড়া শিখিতে গিয়া যাহা শিক্ষা হয় তাহা কেবল ভুগিবার জন্য পণ্ডশ্রম হয় মাত্র মানসিক বিকাশ হয় না। এম, এ, বি, এ পাশ করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি নিস্তেজ, নিরাশ ও অকর্মণ্য হয়, ইহা বিদ্যার অপব্যবহার।

ভারতের ঋষিদের প্রদত্ত বিদ্যা অর্থে অনেকই বুঝাইত। উপনিষদে সনৎকুমার ঋষিকে নারদ ঋষি আপনার বিদ্যার কথা বলিয়া গিয়া পরিচয় দিলেন যে, তিনি চতুর্বেদ ইতিহাস, পুরাণ, বেদের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ শাস্ত্র, পিত্র অর্থাৎ পরলোক সম্বন্ধীয় বিদ্যা, রাশি অর্থাৎ অঙ্কশাস্ত্র, দৈব বিদ্যা, নিধি অর্থাৎ ধন সম্বন্ধীয় বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, ভূত বিদ্যা, নক্ষত্র বিদ্যা, তর্কবিদ্যা সর্ববিদ্যা, কলাবিদ্যা, নৃত্যবিদ্যা,—এত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম ভারতে প্রাচীনকালে ছিল। বিদ্যালাভ আর্য্য-জাতির মধ্যে ধর্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। হিন্দুর পক্ষে বিদ্যা শিক্ষা না করিলে অধর্ম সঞ্চয় হইত। কিন্তু সে সকল কথা এখন ভুল হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মবেত্তা ঋষি দুই প্রকারের বিদ্যা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জোতিষ এই সমস্তকে অপরা বিদ্যা বলে এবং যাহার দ্বারা অবিনশ্বর ব্রহ্মকে বিদিত হওয়া যায় তাহাই পরা বিদ্যা বলিয়া অভিহিত। সকলকেই যথা-সাধ্য উভয় বিদ্যালাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে।

বর্তমানে ভারতের পল্লবগ্রাহি শিক্ষার দ্বারা কোন বিষয়ে সম্যক শিক্ষা হয় না—অনেক লোকের উক্তি সকল মুখস্থ করিতে করিতে বিদ্যার্থীর মেধা ও শক্তি

নষ্ট হইয়া যায়—নিজের মনের বিকাশ হয় না। প্রায় অধিক ক্ষেত্রে সে যাহা বলে তাহা অপরের কথা মাত্র। আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তি ধর্মাচরণ করা লজ্জাজনক বলিয়া মনে করেন, কাজেই মানসিক শক্তির ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয় না। অনার্য্যোচিত বিদ্যাশিক্ষার প্রথায় আর্য্য বংশধরগণের মেধা ও শক্তি হীন করিয়া দিয়াছে। যেমন ব্যায়ামের ফলে শারীরিক শক্তি লাভ হয়, মানসিক বিচারের ও চর্চার দ্বারা মেধা শক্তির বিকাশ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচিন্তায় আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয়। সমভাবে দেহের, মনের ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা দরকার।

মুসলমান, খৃস্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, সাধারণ অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাদের সকল কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাদি যথাসাধ্য করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে ব্রহ্ম চিন্তা ও ভগবানের নিকট প্রার্থনাও উপহাসের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যেখানে ধর্মের গ্লানি হয় তিনি তথায় অবতীর্ণ হইয়া ধার্মিককে রক্ষা করেন—দুস্কৃতকে ধ্বংস করেন। হিন্দুর ধ্বংসলীলা আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে রক্ষার উপায়—শিক্ষিত সমাজ অবসাদ ত্যাগ পূর্বক পরাবিদ্যার প্রতিও দৃষ্টি করুন। তাহা হইলে ভারতের প্রাচীন গৌরবের দিন পুনর্বার ফিরিয়া আসিবে।

লাইব্রেরীর সার্থকতা।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা

আজকাল এমন একটা জায়গা দেখা যায় না যেখানে দু' একটা লাইব্রেরী না আছে। লাইব্রেরীর উৎসাহী বালক ও যুবকদের বলতে শোনা যায় যে, লাইব্রেরী স্থাপন করলে নাকি দেশের শিক্ষা সমস্যার একটা সমাধান করা যায় এবং তাঁরা সেই সদুদ্দেশ্য নিয়েই এই শুভকার্য্যে নেমে যান। বাস্তবিক, প্রকৃত লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্দেশ্য যে তা'ই, তা'তে আর সন্দেহ নাই।

লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, তা'তে এমন সব বই ও পুঁথি রাখা হ'বে, যার দ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকবে। বর্তমানে লাইব্রেরীর সঙ্গে যাঁদেরই সম্বন্ধ আছে, তাঁদের এটা পরিষ্কার জানা দরকার যে পাঠকদের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্য সফলের উপরেই লাইব্রেরীর সার্থকতা নির্ভর করে, কেবল অবসর বিনোদনের পাঠ্য সরবরাহের জন্যই লাইব্রেরী স্থাপন নয়। লাইব্রেরীর মহান উপকারিতা সম্বন্ধে একটা খুব উচ্চ ধারণা প্রত্যেক পাঠকেরই বিশেষভাবে থাকা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সাহায্য করাও লাইব্রেরীর একটী প্রধান কাজ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা লাইব্রেরীই হবে অধিকতর জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র।

আজকাল আমরা দেশের চারিদিকে যত লাইব্রেরী দেখতে পাই, তাতে যদি এই সব উদ্দেশ্য বাস্তবিক রক্ষিত হয়, তা'হলে ব'লতে হ'বে আমরা শিক্ষা ও জ্ঞান সম্বন্ধে উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই? পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা লাইব্রেরী স্থাপন করি, আর মনে মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করি যে, আমরা শিক্ষার উন্নতির সাহায্য করছি।

সাধারণতঃ জনকয়েক উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় অত্যন্ত সামান্যভাবেই ইহার আরম্ভ হয়। তাহারা প্রথমতঃ সামান্য কিছু আসবাব জোগাড় করে নিজ নিজ বাড়ী থেকে স্কুলপাঠ্য বই দিয়ে আলমারী সাজাতে থাকে। তারপর ক্রমে আসে যথাসম্ভব দু'চারখানা মাসিকপত্র ও উপহার পাওয়া বিখ্যাত উপন্যাসিকদের গ্রন্থাবলী। ভাল প্যাডে বাঁধান সস্তা উপন্যাস বাজারে আজ-কাল যথেষ্ট পাওয়া যায় ; সেগুলিও ক্রমে ক্রমে আলমারীর শোভা বর্দ্ধন করতে থাকে। সুপাঠ্য শিক্ষাপ্রদ বইও কিছু যে না আসে তা নয়, কিন্তু উপন্যাস প্রভৃতির তুলনায় এদের সংখ্যা খুবই কম। উপন্যাসগুলি পড়বার লোকই বেশী জোটে। তাই মাসিক দু'এক আনা চাঁদা দিয়ে লাইব্রেরীর সভ্য সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

যদি কোন লাইব্রেরীর "ইসু বুক" পরীক্ষা করা যায়, তা'হলে দেখা যাবে উপন্যাস ও গল্পের বই ছাড়া অন্য কোন রকম বই-এর পাঠকের সংখ্যা বড়ই কম ; এক রকম নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষও তাঁদের সভ্য ও পৃষ্ঠপোষকগণের রুচি অনুসারে সেইরকম বই দিয়ে আলমারী পূর্ণ রাখতে বাধ্য হন। যতদিন তাঁরা উপন্যাস ও গল্পের বই জোগাতে পারবেন, ততদিন তাঁদের সভ্যসংখ্যা ঠিক থাকবে, কিন্তু তাঁরা ঐ রকম বই জোগান' বন্ধ করলেই সভ্যসংখ্যা কমতে কমতে হয়ত বা কিছুদিনের মধ্যে লাইব্রেরীর দরজা বন্ধ ক'রতে হবে।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, অলিতে গলিতে লাইব্রেরী স্থাপন করে আমরা উপন্যাস ও গল্পের বই-এর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করছি। আজকাল আর সেকাল নয় যে কষ্ট ক'রে নূতন বই এর পাতা কেটে নিতে হবে। তবু যদি দপ্তরীর অসাবধানতায় কোন মাসিক পত্রের পাতা কাটা না থাকে, তা হ'লে দেখা যায় যে সেগুলি ৫/৭ জনের পড়া হয়ে গেলেও গল্প উপন্যাসের পাতাগুলি ছাড়া অন্য পাতা কাটাই হয় না। মাসিকপত্রের পরিচালকগণও তাঁদের গ্রাহক ও পাঠকগণের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যবসায়ের খাতিরে প্রতি সংখ্যায় ৩/৪ খানি ধারাবাহিক উপন্যাস ও ৫/৬টী ছোট গল্প দেন, না দিলে তাঁদের কাগজ চলে না।

কিন্তু এত গল্প উপন্যাস পাওয়া যায় কোথা থেকে? আগে যে সব উপন্যাস বটতলায় ছাপা হয়ে ঐ অঞ্চলেই পড়ে থা'কত এখন সেই সব বই ভাল করে ছাপিয়ে দু'চার খানা ছবি লাগিয়ে, প্যাডে বাঁধিয়ে ভদ্রলোকের হাতে চলছে, আর সেই সব "রাবিশ" জিনিস পয়সা দিয়ে লোকে কিনছে। যার যা' খুসী, সে তাই লিখছে, আর মাসিক পত্রের সম্পাদক ও পুস্তক প্রকাশকগণ সেই সব ছাইভস্ম বাংলার পাঠকগণের সম্মুখে ধরছেন। তারপর চলছে আরও একটা ভয়ঙ্কর জিনিস। আর্টের নাম ক'রে যে সব ন্যাক্কারজনক গল্প ও উপন্যাস আজকাল বাজারে বা'র হচ্ছে, সেগুলো পড়লে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়। অথচ সেই সব হ'ল আজকালকার অনেকেরই পাঠ্য।

সকলেরই কিছু নিজে পয়সা খরচ ক'রে বই কিনবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু পড়বার সখ আছে। কাজেই মাসে দু'চার আনা খরচ করে লাইব্রেরীর সভ্য হয়ে তাঁরা এই সব বই পড়ছেন। তার ফল হচ্ছে এই যে, এই সব হালকা সাহিত্য ও রোমাঞ্চকর গল্প ও উপন্যাস পড়ার পর কোন গভীর বিষয়ে মনঃ-সংযোগ করবার ক্ষমতা একেবারে লোপ হয়ে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারি

না, এইভাবে লাইব্রেরী ব্যবহারে আমাদের কতদূর মঙ্গল সাধন হচ্ছে। এই রকম বই পড়বার সুবিধা হওয়ায় দেশের অনিষ্টই হচ্ছে।

শিক্ষা আমাদের ক্রমেই পল্লবগ্রাহী হয়ে পড়ছে। গভীর বিষয়ের গবেষণার সাহায্য করাই লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ কথা আগেই বলেছি। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে লাইব্রেরী থেকে আধুনিক কুরুচি-সঙ্গত গল্পের বই ও উপন্যাস একেবারেই বাদ দেওয়া উচিত। তার উত্তরে হয়ত শুনব যে, তাহলে লাইব্রেরীতে বড় একটা সভ্য থাকবে না। যদি লাইব্রেরী স্থাপনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব না হয়, তাহলে লাইব্রেরী না থাকলে দেশের কোন অনিষ্ট হবে না। লাইব্রেরী স্থাপন একটা বৃহৎ মঙ্গল লাভের সহায়ক মাত্র, ইহাই চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। যদি সেই মঙ্গল লাভের সদুদ্দেশ্য নিয়ে গভীর তত্ত্ব ও বিষয়ের গবেষণা করার জন্য কেহ লাইব্রেরীর সভ্য না হয়, তা হ'লে কতকগুলো বাজে এবং অনিষ্টকর গল্পের বই ও উপন্যাস সরবরাহ করবার জন্য লাইব্রেরী থাকার কি দরকার আছে ?

দেশের বর্তমান দুর্দিনে যুবকদের অনেক কিছু করবার আছে, তার মধ্যে লাইব্রেরীর সংস্কারের প্রয়োজনও আছে।

মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা

প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে বাঙ্গালার দানবীর নব্য বঙ্গের শ্রেষ্ঠ দাতা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু বাঙ্গালীর পক্ষে অকাল মৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার দিকে দিকে যে শোকোচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছে, তাহা অকাল মৃত্যু ব্যতীত অন্য কারণে সম্ভব হয় না। তাঁহার মৃত্যু বাঙ্গালার কাছে অকাল মৃত্যু বলিয়াই বিবেচিত হইবে ; কেন না, সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার স্থান অধিকার করা ত পরের কথা, তাঁহার আসন সন্নিকটে উপনীত হইবার কেহও নাই। বাঙ্গালা যে দিকপাল হারাইয়াছে, তাঁহার স্থান বুঝি চিরদিনই শূন্য থাকিয়া যাইবে। কেন না, তিনি দেশের সকল সৎকার্য্যে, উন্নতিকর কার্য্যে দানের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন অভিনব তেমনি অতুলনীয়। তিনি দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই ; তিনি যখন মাতামহের সম্পত্তি লাভ করেন, তখন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ৩২ বৎসর কাল তিনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ধনিগণের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তিনি চিরদিনই দরিদ্র ; কেন না, তিনি কখন দান-কুণ্ঠ ছিলেন না। তাঁহার আয় যত অধিকই কেন হউক না, তাঁহার দান তাহাকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় তাঁহার সম্পত্তির অপেক্ষা বহুগুণে বিস্তৃত ছিল।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক যখন গত ৩২ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার জন্য উপকরণ পরীক্ষা করিবেন, তখন তিনি মনীন্দ্রচন্দ্রের বিরাটত্বে অভিভূত হইয়া পড়িবেন ; তিনি দেখিবেন, এই দীর্ঘকাল মধ্যে বাঙ্গালার এমন কোন লোকহিতকর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহায্য

প্রদত্ত হয় নাই। কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি অর্থনীতি ক্ষেত্রে, কি ধর্মের ক্ষেত্রে. কি কর্মের ক্ষেত্রে তাঁহার মহত্ত্ব সর্বত্র সপ্রকাশ ছিল। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রেই তাহা সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জল হইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, যেমন অসার কাষ্ঠখণ্ডে মূর্তি খোদিত করা যায় না, তেমনই অশিক্ষিত সমাজে কোনরূপ উন্নতি স্থায়ী হয় না—হইতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, তাঁহার দানের পরিমাণ ১ কোটি টাকা এবং দানের জন্য প্রসিদ্ধ পার্শী সম্প্রদায়ের কেহই একক এত টাকা দান করেন নাই; কিন্তু যাঁহারা মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন—বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে শিক্ষা বিস্তার কল্পেই তিনি ন্যূনাধিক কোটি টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বাহিরে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন বাঙ্গালার আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরে তেমনি ২ লক্ষ টাকা করিয়া দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র কয় মাস পূর্বে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিনি বহরমপুরে একটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যও ১ লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজ তাঁহার অপর কীর্তি। উহার জন্য কখন কখন তাঁহাকে বৎসরে ৫০ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে। কলেজ স্কুলটির নির্মাণ কল্পেই তিনি প্রায় ১ লক্ষ ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। নানা স্থানে তিনি মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সে সকলের ব্যয়ভার বহন করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শতাধিক ছাত্রকে বাস ও আহার দিয়া প্রতিপালন করিতেন এবং তাহাদিগের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিতেন। বহু ছাত্র তাঁহার নিকট পাঠ্য পুস্তকের ও পরীক্ষার ফির জন্য অর্থ পাইত। আবার তিনি ইথোরায় খনির কাজ শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং রাঁচীতে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যখন শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার এই কার্য্য স্মরণ করা যায়, তখন মনে হয় তিনি ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষাবিস্তারের সহায় হয়েন নাই—পরন্তু স্বয়ং একটী বিরাট প্রতিষ্ঠান ছিলেন। গোমুখীর মুখ হইতে জাহ্নবীর ধারা প্রবাহিত হইয়া যেমন সমগ্র দেশকে উর্বর ও পবিত্র করে, তাঁহার দয়া হইতে প্রবাহিত সাহায্য ধারা তেমনই সমগ্র বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্য করিত। কোন দেশে—কোন কালে এমন দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই অসাধারণ কীর্তির সম্মুখে ইতিহাস যেন স্তম্ভিত—শ্রদ্ধায় অবনত—নির্বাক হইয়া দাঁড়ায়। সমগ্র জগতে এই কীর্তির তুলনা মিলে না।

দেশের লোককে শিক্ষিত করা যেমন মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের ব্রত ছিল, দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করিয়া দেশের লোককে দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে সাহায্য করাও তেমনই তাঁহার ঈপ্সিত ছিল। সেজন্য তিনি যথেষ্ট ক্ষতি অকাতরে সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু শিক্ষার্থীকে বিলাতে, জাপানে, মার্কিনে, জার্মানীতে পাঠাইয়া শিল্পকৌশল অবগত করাইয়াছিলেন। বেঙ্গল পটারিজ, রাজগাঁ পাথরের কারখানা, চায়না ক্লের কারখানা, বহরমপুর ট্যানারী, তেলের কল, দেশলাইয়ের কল এসব তাঁহারই উদ্যোগে ও সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি দেশের কল্যাণসাধন জন্য ন্যাস বলিয়া বিবেচনা না করিতেন তাহা হইলে কখনই তাঁহার দ্বারা এই সব কার্য্য সম্পাদন সম্ভব হইত না। কেন না, বিষয়ীর দিক হইতে দেখিলে তাঁহার দান

ও ত্যাগ যে মহত্ত্বের পরিচায়ক তাহার অনুশীলন দেবোচিত হইলেও সংসারী মানবের পক্ষে তাহা সমীচীন নহে। একবার তিনি তাঁহার কোন ধনী বন্ধুর সহিত দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বন্ধুকে শিল্প প্রতিষ্ঠায় অবহিত হইতে অনুরোধ করিলে বন্ধু যখন শিল্প প্রতিষ্ঠায় লোকসানের সম্ভাবনা উল্লেখ করিলেন, মহারাজা তখন বলিলেন "আমিও ত অনেক লোকসান দিয়াছি ; কিন্তু সেইজন্য যদি আমরা অগ্রণী না হই, তবে দেশে কিরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে—অন্য লোক কিরূপে সাহস পাইবে?" অর্থাৎ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য যে ব্যয় অনিবার্য্য তাহা ধনীরাই বহন করিবেন। তিনি দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল ছিলেন বলিয়াই কলিকাতায় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রথম যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে তাহার উদ্বোধন করিবার কার্য্যে বৃত করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যানুরাগের নিদর্শন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির। পরিষদ যখন স্থাপিত হয় তখন শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের গৃহে তাহার আশ্রয় মিলিয়াছিল। তাহার পর ব্যক্তি বিশেষের গৃহে এইরূপ প্রতিষ্ঠান না থাকাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করা হয় ভাড়ার বাড়ীতে —শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থানে—পরিষদকে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার গৃহ নির্মাণ কল্পনা হয়। যখন আচার্য্য রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতি, সাহিত্যরসিক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কোবিদ শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমার শ্রী শরৎকুমার রায় প্রভৃতি তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত তখন চারুচন্দ্র ঘোষ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে পরিষদের পক্ষ হইতে কয়জন কাশিমবাজার গমন করেন। তাঁহাদিগের প্রস্তাব শুনিয়াই মহারাজা সানন্দে পরিষদ মন্দিরের জন্য আবশ্যক জমি দান করিতে প্রতিশ্রুতি হয়েন। পরিষদকে মণীন্দ্রচন্দ্রের দান ইহাতেই শেষ হয় নাই। ইহার পর যখন পরিষদের প্রসার-বৃদ্ধি হয়, তখনও রমেশ ভবনের জন্য তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন।

আজিকে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, মণীন্দ্রচন্দ্রই তাহার স্রষ্টা। তিনিই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বৎসর বৎসর বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগকে এক কেন্দ্রে সম্মিলিত করিবার কল্পনাকে মূর্তি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। পরবর্তী কয়টী অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং একবার অধিবেশনে হোতার কাজও করিয়াছিলেন।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের রাজনীতিক কার্য্যের কথা বিস্মৃত হইলে বাঙ্গালীর ললাটে কৃতঘ্নতার অনপনেয় কলঙ্কচিহ্ন চিহ্নিত হইবে। সকল দেশের বিশেষ বিজিত দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের মূলমন্ত্র—"আগে চল আগে চল ভাই।" যে কংগ্রেস আজ স্বাধীনতাই আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে সেই কংগ্রেস কি উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলেই এই কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। সেই জন্যই ম্যাটসিনীর শিষ্য সুরেন্দ্রনাথও শেষে তরুণদের নিকট অগ্রগামী নহেন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে নেতৃত্বের আসন দানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন,

তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথেরই রচিত বেদীর উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। তেমনই বাঙ্গালার সংকট সময়ে মণীন্দ্রচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালার রাজনীতিক উন্নতির ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তখন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ আত্মপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। লর্ড কার্জনের বিধানে বাঙ্গালীর জনমতের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইবে। একদিকে গুণ্ডার লাঠি ও বন্দুক বেয়নেটে শক্তিশালী রাজপুরুষদিগের জিদ, আর একদিকে অহিংস অসহযোগে দৃঢ় সংকল্প বাঙ্গালার জনগণ। বাঙ্গালার জনমত যে পরাভব জানে না, লর্ড কার্জন হইতে সার ব্যাম্‌ফাইল্‌ড্ ফুলার পর্য্যন্ত শাসকরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই তখন রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা পুঞ্জীভূত মেঘ মধ্যে রাজরোষ বজ্রদ্যোতক বিদ্যুতের মত দেখা দিতেছে। বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞা করিল বঙ্গভঙ্গ নাকচ করিবে। সে যুদ্ধের প্রথম তুর্য্যনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের দ্বারা। সে যেন পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি। যে সভায় বিলাতীপণ্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে সভায় বিলাতী-পণ্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে সভায় তিনিই সভাপতি ছিলেন। বাঙ্গালীর জয়রথ তাঁহার সারথ্যে কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা আজ আর বলিয়া দিতে হইবে না। যিনি স্বয়ং সরকারের উপাধিধারী, যিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী—তিনি তাঁহার এই কার্য্যের দ্বারা যে সাহসের পরিচয় দিয়া-ছিলেন, তাহা কি স্বদেশপ্রেমের উৎস ব্যতীত আর কোথাও উদ্‌গত হইতে দেখা যায় ?

ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যরূপে তিনি সমভাবে দেশের লোকের অধিকার সংকোচক বিধির প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেভাবে রৌলট আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। সে দিনের দৃশ্য ভুলিবার নহে। লর্ড চেমসফোর্ড সেই দিনই আইন পাশ করিবেন। পূর্বাহ্নে একবার, অপরাহ্নে আর একবার এবং সন্ধ্যায় তৃতীয়বার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে ; তাহার পর দিল্লীর শীতে রাত্রির অধিবেশন। জয়লাভ অসম্ভব বুঝিয়া বীরযোদ্ধা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আর শেষ অধিবেশনে আসিলেন না। কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ মণীন্দ্রচন্দ্র রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত থাকিয়া আইনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া—বাঙ্গালীর প্রতিনিধির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। দেশপ্রীতি ও কর্তব্যনিষ্ঠার সেরূপ দৃষ্টান্ত কয়জন দেখাইতে পারেন ?

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করায় সরকার দশ বৎসর মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু তিনি ভীত হয়েন নাই। দেশের লোকের কল্যাণের জন্য তিনি আপনি ঋণ করিয়াও দান করিয়াছিলেন। যাঁহারা আজ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে প্রজাপক্ষ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতেছেন, তাঁহারা যদি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া প্রজাকে জমা হস্তান্তর করিবার প্রস্তাবের আলোচনা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র. স্বয়ং জমিদার হইয়াও প্রজাকে সে অধিকার প্রদান করিবার ও জমিদারের সেলামী সংকোচ করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার বহুদিন পরে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে প্রায় তাঁহার মতই গৃহীত হইয়াছে। দেশের লোকের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সরকার পক্ষ গ্রহণ করিলে তিনি ৭০ বৎসর বয়সে

কেবল "মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই" থাকিতেন না। পরন্তু তদপেক্ষা অনেক উপাধির ভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইত।

মণীন্দ্রচন্দ্রের ধর্মমত অসাধারণ উদার ছিল। তিনি যে মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন ; সেই মাতামহের বংশ বৈষ্ণবমতাবলম্বী। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব মতের প্রচারকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন—"অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর।" তাঁহার কাছে শুনিয়াছি, তাঁহার মাতামহবংশ এমন গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন যে, শৈব বা শাক্ত মত সহ্য করিতে পারিতেন না ; তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বৃন্দাবন যাত্রাকালে আদেশ দিয়াছিলেন, নৌকার প্রহরীরা দূর হইতে কাশীর "বেণীমাধবের ধ্বজা" দেখিতে পাইলেই যেন তাঁহার কক্ষের পর্দা ফেলিয়া দেয়—তিনি কাশী দেখিবেন না। আর মহারাজা কলিকাতায় বৌদ্ধদিগের বিহার নির্মাণ জন্য ভূমিখণ্ড দান করিয়াছিলেন।

তবে তিনি স্বয়ং স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র-নির্দিষ্ট কার্য্য তিনি সযত্নে সম্পন্ন করিতেন এবং হিন্দুর আচার ও ব্যবহারের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। সেই জন্যই তিনি বিদেশী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকসম্প্রদায়ের সৃষ্ট ব্যবস্থাপক সভার আইনের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। সেজন্য যে মুষ্টিমেয় লোক তাঁহাকে সংকীর্ণতার অপবাদ দিয়াছে, তাহারা আপনাদিগের কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যের স্বরূপ দেখিতে পায় নাই। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাঁহারই অর্থে বহু বাঙ্গালী যুবক দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প শিখিবার জন্য বিলাতে, জার্মানীতে, জাপানে গিয়াছিল। তাঁহার সাহায্যে কোন বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞ বিদেশে সঙ্গীত চর্চার জন্যও গমন করিয়াছিলেন। অনেকে হয়ত জানেন না, এদেশে যেমন শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রভৃতি তাঁহার অর্থ সাহায্যে সাহিত্যিক কার্য্য করিয়াছিলেন, বিদেশে তেমনই ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যাল তাঁহারই অর্থ সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন। এদেশে সমাজপতিরাই লোকমত লইয়া সমাজ-সংস্কার করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সেই মতাবলম্বী ছিলেন। সেও তাঁহার জাতীয়তার পরিচায়ক। তিনি জানিতেন, জাতি যখন শিক্ষিত হয়, তখন আবশ্যক সংস্কার স্বতঃই সংসাধিত হয়। তিনি জাতিকে শিক্ষিত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা কেবল বঙ্গদেশে—কেবল ভারতবর্ষে কেন—যে কোন দেশে বিরল। শিক্ষা যাহাতে জাতীয় ভাবধারার বিরোধী না হয়, সেইজন্য তিনি জাতীয় পরিষদের পুষ্টিকল্পে দান করিয়াছিলেন ; আর সেই জন্যই তিনি স্বয়ং ছাত্রদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তিনি যে তাঁহার সম্পত্তি ন্যাসরূপে ব্যবহার করিতেন, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি তাঁহার আড়ম্বরহীন, বিলাসবর্জ্জিত জীবনযাত্রা-রীতিতেই তাহা বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জন্য এত অল্প ব্যয় করিতেন এবং তাঁহার পরের জন্য ব্যয়ের তুলনায় কিরূপ নগণ্য তাহা বিবেচনা করিলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয় এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

মানুষের—বিশেষ তাঁহার স্বদেশবাসীর সেবাই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। সে সেবা তিনি কিরূপ নিষ্ঠা সহকারে—কিরূপ আনন্দে করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ তাঁহার অভাব তাঁহার দেশবাসীকে বিশেষ-ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। তিনি দেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে কিরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি দেশের দারিদ্র্যে ব্যথিত হইয়া কিরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন সে কথাও বলিয়াছি। তিনি দেশবাসীর রাজনীতিক অধিকার বিস্তারে কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন, তাহাও দেখিয়াছি। তিনি কিরূপে দয়ার প্রবাহে বিষয়-বুদ্ধি ভাসাইয়া দিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দেশের ব্যথিত—পীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখেও তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। বহরমপুরে জলের কলের বিস্তার সাধন করিয়া সুপেয় বারি প্রদানের জন্য তিনি প্রভূত অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন; তিনি বহরমপুরে চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যখন লক্ষ টাকা দান করিয়া-ছিলেন, তখন তাঁহাকে নানাদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল; তিনি বহরমপুরে একটী হাসপাতাল পরিচালন করিতেন; তিনি নানাস্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন; তিনি কলিকাতায় বেলগাছিয়ার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ দান করিয়াছিলেন; জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদও তাঁহার সাহায্যলাভে বঞ্চিত হয় নাই। এ সকলই তাঁহার জনসেবার নিদর্শন।

বাঙ্গালা যে জনহিতকর অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে দানের জন্য ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে অগ্রণী ছিল সে কেবল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জন্য। তিনি একাধারে সমুদ্রের উদারতা ও দধীচির ত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি এদেশের দানের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার দান কোন সম্প্রদায়ে, কোন স্থানে, কোন অনুষ্ঠানে বদ্ধ ছিল না—তাহার উদারতাই তাহার বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই জন্যই বাঙ্গালী পরিণত বয়সে তাঁহার তিরোভাবকেও অকাল মৃত্যু বলিয়া মনে করিতেছে এবং করিতে থাকিবে।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মত বহুগুণশালী বাঙ্গালীর অভাব যে কখন বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে পূর্ণ হইবে, এমন আশা করা যায় না। কেননা সেরূপ গুণসংযোগ সচরাচর হয় না।

আজ তিনি আর নাই। যিনি দীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল বঙ্গদেশে বিপন্নের আশ্রয় ও সকল সৎকার্য্যে সহায় ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার গৌরব গিরির স্বর্ণচূড়ারূপে চিরদিন বাঙ্গালীর স্মৃতিতে বিরাজিত থাকিবেন। তাঁহার দান পুণ্য প্রবাহিনী ধারায় অবগাহন করিয়া বাঙ্গালী আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিবে এবং যত দিন যাইবে ততই তাঁহার কীর্ত্তি উদয়াস্ত-অরুণ-রাগ-রঞ্জিত হিমাচল শৃঙ্গের মত বাঙ্গালীকে মহত্বের স্বরূপ দেখাইয়া মনুষ্যত্বের দ্বারা মহত্ত্বলাভ করিবার আদর্শে আকৃষ্ট করিবে।

আজ তাঁহার জন্য শোকার্ত্ত হৃদয়ে তাঁহার সম্বন্ধীয় আলোচনা করিবার সময় মনে হইতেছে—

মহত্ত্ব গোমুখী মুখে করি' প্রবাহিত—
দয়ার পাবনী ধারা; করি' প্রতিষ্ঠিত--
দানের আদর্শ নব; লভিলে আশ্রয়,
পূর্ণব্রত, অমরায়—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।

ধর্মের অধিকার।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা

বাংলা দেশের উপর দিয়া একটা না একটা অশান্তির ঝড় বহিয়া চলিয়াছেই। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য—এমন কোন বিষয় নাই যাহা লইয়া আজ বাংলার জনসমাজ আলোচনা না করিতেছে এবং যে আলোচনার ফলে বাংলার আকাশ বাতাস চঞ্চল না হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কথা না হয় নাই বলিলাম, কারণ ইহা আজ নূতন করিয়া উপস্থিত হয় নাই এবং ইহার শেস সমাপ্তিও যে কবে হইবে বলা যায় না। সাহিত্য, সমাজ এবং ধর্ম বিষয়ক আন্দোলন আলোচনা অল্প বিস্তর বহুকাল ধরিয়াই এদেশে চলিয়া আসিতেছিল এবং সম্প্রতি সাহিত্য ও ধর্মের অধিকার লইয়া বাংলা দেশে যে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, যাক্—এতদিন পরে বাঙ্গালীর দেহে প্রাণ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে বটে!

ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ এতকাল যাবৎ নিজের ধর্ম সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিন্ত ছিল যে সেই অতিনিশ্চিন্ততার ফলে আজ তার আত্মরক্ষার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া ধর্ম ব্যাপারে সে এমনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিল যে দুনিয়াতে কেবল তাহারই একমাত্র অধিকার আছে—সেই ধর্ম সম্বন্ধে প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আর সকলেই হীন, অবজ্ঞেয় এই ধারণা তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

বিগত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় হিন্দুর চৈতন্য উদ্রেক করিয়া দিলেও এখনো কোন কোন সনাতনী কুম্ভকর্ণের গাঢ় নিদ্রার ব্যাঘাত জম্মাইতে পারে নাই। যাঁহাদের নিদ্রা বহু পূর্বেই ভাঙ্গিয়াছিল এবং দূরদৃষ্টির সাহায্যে দেখিয়াছিলেন যে সংকীর্ণতা লইয়া, গোঁড়ামী করিয়া এককালে রাজসম্মান পাইয়া থাকিলেও বর্তমান যুগে আর তাহার কোন আশাই নাই, বরঞ্চ মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে গেলে অনেক সুখ সুবিধা ও স্বার্থ আজ বিসর্জন দিতে হইবে নতুবা অপমান লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না—তাঁহার উদার মন লইয়া এবং জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দেশের ভিতর হইতে—সমাজের ভিতর হইতে অস্পৃশ্যতারূপ মহা অনিষ্টকর ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে না পারিলে কোন জাতি কোন সমাজ আজ বিশ্ব দরবারে ঠাঁই পাইবার অধিকারী হইতে পারেনা। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই সংঘবদ্ধতার যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা আজ কে না বুঝিতে পারে? কিন্তু সমগ্র জাতিকে একত্র সন্নিবেশিত করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে ধর্মের ভিতর দিয়া। সেই উপায় পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতরেই বিদ্যমান রহিয়াছে—নাই কেবল ভারতের নাই কেবল হিন্দু জাতির। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় সমগ্র জাতির মাথার উপর যখন কোন বিপদের মেঘ ঘণীভূত দেখিতে পায় তখন ধর্মের নামে আসিয়া সকলে এক পতাকাতলে মিলিত হয়! মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতরেও সেই ধর্মের ডাক রহিয়াছে—ইসলাম ধর্ম বিপদ-গ্রস্ত শুনিলে মুসলমান সমাজের ভিতর কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থিত হয় না—মসজিদের চতুঃসীমানায় আসিয়া সকলে সংঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে। কিন্তু হিন্দু সমাজের ভিতর এই ধর্মের নামে

বিশ্বজনীন আহ্বান নাই। ঈশ্বর এক এবং অসীম এই কথা হিন্দুধর্মের গ্রন্থেই কেবল বাধা পড়িয়া রহিয়াছে—সমাজের ভিতর সম্প্রদায়ের ভিতর সেই কথা উপলব্ধি করিয়া দেবতা মন্দিরকে সকল হিন্দু তাহার মিলনক্ষেত্র বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। সেই জন্যই আজ দেবতা মন্দিরে প্রবেশাধিকার লইয়া হিন্দু সমাজের ভিতর এমন তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে। ধর্ম-সম্প্রদায়ের একমাত্র মিলনক্ষেত্র যে উপাসনা মন্দির সেই মন্দিরে একই ধর্মাবলম্বী হইয়াও কেহ তাহাতে প্রবেশ করিবে আর কেহ তাহা পারিবে না—ইহার ভিতর কোন বুদ্ধি বা যুক্তির অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মণও হিন্দু চণ্ডালও হিন্দু এবং উভয়ের যিনি দেবতা তিনি একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্। ব্রাহ্মণের পূজাও তিনি গ্রহণ করেন, চণ্ডালের পূজাও তিনি গ্রহণ করেন। তবে সেই দেবতার পূজা মন্দিরে ব্রাহ্মণের সর্ববিধ অধিকার থাকিবে আর চণ্ডাল যে সে পূজা ত দূরের কথা—প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত পাইবে না—ইহা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিবে তাহা তো জানি না।

যে সকল কালীমন্দিরে হিন্দু জনসাধারণ চিরকাল ধরিয়া পূজা দিয়া আসিতেছেন, বাংলা দেশের নানাস্থানে এরূপ অনেক পূজামন্দিরে অস্পৃশ্য হিন্দুর প্রবেশ অধিকারের বাধা উপস্থিত হওয়াতে সমগ্র বাংলা দেশই আজ অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু বাংলা দেশ নয়—সুদূর বোম্বাই প্রদেশেও এই দেবতা মন্দিরে হিন্দুর প্রবেশাধিকার সমস্যা লইয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সেই প্রদেশের সনাতনী দল এরূপ আশংকাও প্রকাশ করিয়াছেন যে আজ যে সকল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ দেবতা মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার দাবী করিতেছে, তাহারা সেই অধিকার পাইলে অতঃপর উচ্চবর্ণের সহিত বিবাহের ও ভোজনের অধিকারও দাবী করিয়া বসিবে। আমরা বলি—ইংরাজের বিদ্যালয়ে একাসনে বসিয়া যখন উচ্চ নীচ নির্বিশেষে পাঠাভ্যাস করা হয় তখন এই প্রশ্ন মনে উঠে না কেন? তা ছাড়া পৃথিবীর সকল জাতির ভিতরেই সাম্প্রদায়িকতা আছে, উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান আছে—তথাপি তাহারা ধর্মমন্দিরে আসিয়া যখন মিলিত হয় তখন সেই সংকীর্ণতা ভুলিয়া এক ভগবানের সন্তান বলিয়া পাশাপাশি উপবেশন করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির পক্ষে যাহা সম্ভব, যাহা কল্যাণকর তাহা আমাদের বেলাই যে শুধু অনিষ্টকর হইবে তাহা কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

তাই বলি—যদি জাতি হিসাবে রক্ষা পাইতে হয়, যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একতাবদ্ধ হইতে হয় তবে আজ সকল ক্ষুদ্রতা, সকল সংকীর্ণতা, সকল সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন দিয়া—জাতির কল্যাণের দিকে চাহিয়া আজ সকল স্বার্থ এবং সুবিধা ত্যাগ করিয়া ধর্মের নামেই মিলিত হইতে হইবে, ধর্ম মন্দিরেই আজ সকলকে সমান অধিকার দান করিতে হইবে।

না যায় গেলা, না যায় ফেলা!

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ৩০শ সংখ্যা

ভারতের রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধী আজ ধীর মন্থর গতিতে তাঁহার স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী লইয়া জয়যাত্রায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। এই দুর্বল,

অস্ত্রহীন পরাধীন জাতির পক্ষে মুক্তি সংগ্রাম কি ভাবে আরম্ভ করিলে যে তাহা কার্য্যকরী হইবে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং সমগ্র দেশবাসীকে প্রথমেই সে বিপদে ঝাঁপ দিতে বারণ করিয়া নিজের স্কন্ধেই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার এই যুদ্ধ-নীতিতে কোন গোপনতা নাই, কিভাবে কোথায় যাইয়া কাহার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন তাহা পূর্ব্বে হইতেই ঘোষণা করিয়া তিনি নির্ভীক-চিত্তে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার অগ্রগতিতে বাধা আসিলে তিনি হাসিমুখে কারাবরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াই সংগ্রামে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার মনে এই ধারণা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, যে মুহূর্ত্তে তাঁহাকে বন্দী করা হইবে সেই মুহূর্ত্তে সমগ্র ভারতে এক বিরাট আন্দোলন, তুমুল ঝড় আরম্ভ হইয়া যাইবে। মহাত্মা সেই আসন্নকালের জন্যই প্রতিমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া আছেন, প্রতি পাদক্ষেপেই তাঁহার জেলের দ্বার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে কিন্তু তিনি কারাবদ্ধ হইলেই কি এ আন্দোলন, এই মুক্তি সংগ্রাম —যাহা এবার মৃত্যুপণ করিয়াই আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা একেবারে থামিয়া যাইবে ?

আমাদের প্রভু সম্প্রদায় এখন পর্য্যন্ত চুপ করিয়া আছেন, মহাত্মাকে গ্রেপ্তার করিতেছেন না, ইহারও একটা কারণ থাকা সম্ভব। আইন ও শৃঙ্খলা যাঁহাদের মূলমন্ত্র, প্রতি কথায় যাঁহারা আইনের বেড়াজাল ফেলিয়া নীতিকথা আওড়াইয়া থাকেন তাঁহারা কেন যে এখন পর্য্যন্ত এরকম নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মহাত্মা শুধু এখন আইন অমান্য করিবেন বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। আইনের প্রতি এখনো হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা আইনের চক্ষে শোভন হয় না, তাই হয়তো কর্তৃপক্ষের এই সংযম, এই নিশ্চেষ্টতার অভিনয়। নির্দ্দিষ্ট স্থান জালালপুর সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া যখন মহাত্মা আইন ভঙ্গ করিবেন তখনও যে কর্তৃপক্ষ আজিকার মত নির্ব্বিকার থাকিতে পারিবেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু আমরা ভাবিতেছি—মহাত্মা এই যে একটা অভিনব চাল আজ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে চালাইয়াছেন, ইহাতে ভারতের অভিভাবক সম্প্রদায়কে যথেষ্ট জটিল সমস্যার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ ইহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিতেছেন যে আজ মহাত্মার এই সংগ্রাম আয়োজনে সমগ্র ভারতে অদূর ভবিষ্যতে যে একটা মহাপ্রলয়ঙ্করী বিক্ষোভ সারা দেশ জুড়িয়া আরম্ভ হইবে তাহারই জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, অথচ ইহাকে রোধ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত এবং নিশ্চিত উপায় উদ্ভাবনা করিয়াও উঠিতে পারিতেছেন না। আবার এদিকে মহাত্মাকে গ্রেপ্তার না করিয়া তাঁহার এই অভিযানের গতিকে অবাধ, অপ্রতিহত করিয়া রাখিতেও সমগ্র দেশবাসী আইন অমান্য সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইতেছে। এখন প্রভু সম্প্রদায়ের হইয়াছে উভয় শঙ্কট ! মহাত্মাকে ধরিলেও মুস্কিল, আবার না ধরিয়া বসিয়া থাকিলেও মুস্কিলের অভাব নাই। অবস্থা হইয়াছে ঠিক যেন সাপে ভেক ভক্ষণ। ভেক আজ এমন অবস্থায় গলায় বাধিয়া গিয়াছে যে ইহাকে গিলিতেও পারা যাইতেছে না, উদ্গীরণ করিয়া ফেলিয়া দেওয়াও যাইতেছে না।

বন্দুক, কামান, এরোপ্লেন, টর্পেডো, যুদ্ধ জাহাজ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতেও এই নিরস্ত্র ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরাজ রাজ যে তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না ইহা কম দুঃখ ও আফ্‌শোসের কথা নয়।

আজ ভারতের এই অহিংস আইন লঙ্ঘন প্রচেষ্টার ফলে হয়তো অনেককেই দুঃখ, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিয়া লইতে হইবে। ভারতবাসী সেই সংকল্পে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াই যে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠেই জানা যায়। সুতরাং জেলের ভয়, ফাঁসীর ভয় কিছুতেই আজ আর ইহাদিগকে নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। তেত্রিশ কোটী নরনারীকে জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা কিম্বা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা কোন শক্তিশালী গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং ভারত সরকার যে সে রকম দুশ্চেষ্টা করিতে যাইবেন তাহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

মহাত্মা ভারতের মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়া অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন, সেই অভিযানের প্রথম লক্ষ্য হইতেছে লবণ শুল্কের বিরুদ্ধতা করা। কেহ কেহ এই ব্যাপারকে ঠাট্টা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে সমুদ্রের জল গরম করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা বাতুলতারই নামান্তর মাত্র। কিন্তু সেই সকল ক্ষুদ্র দৃষ্টি লোকদিগকে আজ একথা তর্ক করিয়া বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র যে এই অতি তুচ্ছ ঘটনার পশ্চাতে অতি বড় আইন অমান্যের বজ্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং তাহা একদিন রুদ্র মূর্তি ধারণ করিয়া সমগ্র শাসন ক্ষমতাকে পঙ্গু, পর্য্যুদস্ত করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। লবণ শুল্ক অমান্য করার ফলেই যে ইংরাজ রাজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং আমরা নির্বিঘ্নে স্বরাজ লাভ করিয়া আরাম কেদারায় হেলান দিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে থাকিব এমন কল্পনা কোন মূর্খও করে না। লবণ শুল্ক অমান্য করা বৃহৎ যজ্ঞের প্রাথমিক অনুষ্ঠান মাত্র। যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গেলে সেই যজ্ঞাগ্নিতে অন্য বহুবিধ আইন অমান্যের যজ্ঞকাষ্ঠ যে নিক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হইবে না তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? সুতরাং আজ যজ্ঞারম্ভের সময় বহুদিক হইতে বহুবিধ বাধা, বক্তৃতা এবং চীৎকার শুনিতে পাওয়া যাইবেই কিন্তু মহাত্মার এই রাজনীতিক চাল যে বহুদূর প্রসারি ; তাহা সুচতুর শাসক সম্প্রদায় মনে মনে ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

যাঁহারা আজ মহাত্মার এই বুদ্ধিকে পরিহাস করিতেছেন তাঁহারা বাস্তবিকই দেশপ্রেমিক, না ইংরাজভক্ত তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতেছি না। তবে কতিপয় লোক যে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রয়াস পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ একদিন যে ইংরাজ ভারত অধিকার করিয়াছিল তাহা কতিপয় ভারতবাসীর সাহায্য দ্বারাই করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্ত যে ভারতের শাসন ব্যাপার নির্বিঘ্নে চালাইয়া আসিয়াছে, তাহাও ভারতবাসীর সহযোগিতার কল্যাণেই। সেই সহযোগিতার বন্ধন আজ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসীর দাবী যতদিন পর্য্যন্ত না বৃটিশ পার্লামেণ্ট পূরণ করিতে স্বীকৃত হইবে ততদিন পর্য্যন্ত এই সহযোগিতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা করা সমীচীন হইবে বলিযা আমরা মনে করি না।

দেশের দশা।

১৩৩৬ সাল ১৫শ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা

পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। কথাটি যে অতি সত্য তাহা পরাধীন ভারতবাসী নিত্য জীবনে নানা দিক দিয়া প্রত্যহ অনুভব করিতেছে। পরাধীন জাতির রাজনীতি না থাকিতে পারে কিন্তু পেট-নীতি আছে। পরাধীন জাতিরও ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে—তাহারাও পেটে খাইয়া পরিধানের বস্ত্র পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়—চলিতে চায়। জগতের নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক অতি কঠোর পেটের নীতি হইতেই অন্যান্য যত সব উচ্চাঙ্গের নীতি শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ আগে খাইবার পরিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার নীতি জানিতে চাহিবে—তারপর সে অন্য নীতির কথা কহিবে। এই মূল নীতিটাকে নিজ নিজ সুবিধামত প্রাধান্য দিবার জন্যই শক্তিশালী জাতিরা ইচ্ছামত আরও বহু প্রকার নীতি সৃষ্টি করিয়া ঐ নীতিটারই ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছে। তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারত নিজ স্থান যতই কিছুমাত্র পাইতেছে না পেটের জ্বালায় সে ততই আরো অস্থির ও বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। ভারতের অভাবজনিত দুর্ভোগের মধ্য দিয়া কিভাবে কি নীতি ফুটিয়া উঠিবে কে জানে ?

আমাদের দেশে খাইবার পরিবার অভাব কোন দিন ছিল না। এখনও দেশের উৎপন্ন শস্য সম্পদ যাহা দেখা যায়, তাহাতে দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোক যে না খাইয়া মরিতেছে—অসহনীয় দারিদ্র্যের জ্বালায় মনুষ্যত্ব হারাইতেছে, দারিদ্র্যজনিত ব্যাধিপীড়ায় দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে—এমন হইবার কথা নয়। দেশের এমন শস্য সম্পদ থাকিতে তবে দেশবাসীর ভাগ্যে তাহা জোটে না কেন —কারণ শুনি Exploitation. শোষণ—বাহির হইতে এমনভাবে শোষণ চলিতেছে যে ভারতীয়ের এই শস্য সম্পদ সেই শোষণ যন্ত্রের মধ্যে গিয়া এমনভাবে পড়িবে যে তাহাতে তাহাদের আর কোন হাত বা আশা থাকিবে না। এই ব্যাপার ভারতে বরাবর চলিতেছে--তাহার ফল ভারতীয়ের নানা দুর্দশার মধ্য দিয়া নিয়ত প্রতিফলিত হইতেছে।

ভারতীয়ের ব্যবসা বাণিজ্য সব পরহস্তগত। নানা বিদেশী পণ্যের ভারতে একচেটিয়া রাজত্ব। পরদেশীয় দ্রব্যাদির এমন প্রাবল্য জগতে আর কোন দেশে বোধ হয় নাই। ভারতীয়ের শিল্প বাণিজ্য পূর্বে যাহা ছিল-- দেশের অভাব তাহাতে যথেষ্ট মিটিত, আজ দেশের সে সমস্ত শিল্প বাণিজ্য একেবারে লুপ্ত কোথাও প্রায় লুপ্তভাবে রহিয়াছে। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিম্বা আমলাতন্ত্র সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্বে তাহাদের এই দুর্দশা। দেশের বয়ন শিল্প প্রভৃতি এই ভাবে গিয়াছে। বিদেশী বণিকদের হাতে অর্থ —তাহারা এই দেশের কাঁচা মাল সব সস্তাদরে ইচ্ছামত কিনিয়া তাহা হইতে নানা দ্রব্য জাত করিয়া পরিপাটি শিল্প হিসাবে জগতের বাজারে চালাইতেছে— ভারতের বাজারেই আবার তাহার প্রচলন সবচেয়ে বেশী। শস্যের ও পণ্যের ফলন করিবে ভারতবাসী কিন্তু তাহার ফলভোগী হইবে বিদেশী বণিক কুল— এ ব্যবস্থা বরাবরই চলিবে--ইহার প্রতিকারের উপায় কিছুতেই হইবে না।

ভারতের কয়লা আসিবে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অথচ বাংলায় অজস্র কয়লার খনি। সেই সুদূর আফ্রিকা হইতে কয়লা এখানে আসিয়া যে দরে

বিক্রীত হইবে বাংলার কয়লা বোম্বাইতে গিয়া বিক্রী হইতে তার চেয়ে বেশী দাম পড়িবে। দেশী জিনিস দেশের অভাব মিটাইবার জন্য চালান দেওয়ার এমনি সুব্যবস্থা! এইভাবে অনেক দেশীয় জিনিসের ব্যবসায় মাটি হইয়া যাইতেছে। কিন্তু উপায় কি! ট্যাক্স, রেল ভাড়া ইত্যাদির মধ্যে দেশীয় ও বিদেশীয় জিনিসে এমন চমৎকার অসামঞ্জস্য এ যুগে চলিতে পারে কি? কিন্তু তাহাও এদেশে সচল!

অন্যান্য দেশের লোক এদেশে আসিয়া নবাবের মত বাস করিবে। অর্থ সম্পদ অর্জন করিবে, যেমন ইচ্ছা বুক ফুলাইয়া চলিবে—অথচ এদেশবাসী অপর কোন দেশে গিয়া সামান্য নাগরিকের অধিকারও পাইবে না। ইহা লইয়া এদেশবাসীকে বার বার পরম লজ্জাকর আবেদন নিবেদন করিতে হইবে—ও বার বার কুকুর বিড়ালের মত প্রত্যাখ্যাত হইবে।

যে দেশবাসী ভারতবাসীদের মানুষের অধিকার দিতে একেবারে গররাজী, ভারতবাসীকে যাহারা ঘৃণা করে, সেই দেশবাসীর অজস্র কোটি কোটি টাকার পণ্য ভারতের বাজারে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বিকাইয়া যাইবে—ভারতবাসী তাই হাসিমুখে কিনিবে—বিলাস ও আনন্দের দ্রব্য করিবে। তাহাদের পণ্যের বাজার এখানে তাহারা জোর চালাইবে—দেশবাসী বা দেশের বিধি বিধান তাহাদের বাধা দিবে না। এমনি চমৎকার বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ!

চোখের উপর এই সব দেখিয়া শুনিয়াও দেশবাসী চুপ করিয়া থাকে। জাতির ক্লৈব্য ও মোহ ইহাদের জড়তা ভাঙ্গিয়া এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস দেয় না। তাই অন্যায় দেশবাসীর ঘাড়ে ক্রমশঃ আরো জাঁকিয়া বসিতেছে! ভারতীয়ের নিজস্ব শিল্প বাণিজ্য লুপ্ত, অথচ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে পরের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তি নিজ দেশে বিস্তার করিবার জন্য তাহাকেই অর্থ ঢালিয়া দিতে হইবে। অভাবের তাড়নায় পরদেশী বাণিজ্যের প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন দেশীয় কাগজে ঘোষণা করিতে হইবে। কৌন্সিলে আবার ইহাই লইয়া দেশীয় কৌন্সিলরদের দায়িত্ব ও মর্য্যাদা জ্ঞানের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয়েরা অর্থ সামর্থ্য প্রাণ দিয়া সাম্রাজ্যের সম্মান রক্ষা করিবে অথচ ভারতীয়দের সম্মান—সম্মান দূরের কথা আশু প্রাণঘাতী নীতি যাহা সাম্রাজিক বিধান অনুসারে অবলম্বিত হইতেছে তাহার এতটুকু ব্যত্যয় কোন প্রকারে হইবার নহে।

বাল্যবিবাহ।

১৩৩৬ সাল ১৫শ বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা

বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের অনেক স্থলে একটা মজ্জাগত ব্যাধি। ইহা বিদ্যাশিক্ষার অন্তরায়, স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায়—নানাবিধ জটিল ব্যাধি এবং অকাল-মৃত্যুর অনুকূল কুপ্রথা। এই কুপ্রথার দূরীকরণ একাধিক কারণে সমাজের মঙ্গলজনক।

কেহ কেহ গৌরীদানের পুণ্যলাভে এবং পূর্বপুরুষের স্বর্গচ্যুতির আশঙ্কায়, আবার কেহ কেহ বা সনাতন ধর্মের মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় কুমারী কন্যার বয়োবৃদ্ধির প্রতিকূল মত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের

এরূপ আশংকা ভিত্তিহীন। প্রাচীনকালে গৌরীদানের কিশোরী কি যুবতী কন্যার বিবাহের কথাই গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আপনারা স্বয়ম্বর প্রথার কথা জানেন; স্বয়ম্বর সভায় কন্যার পাণিপ্রার্থী বহুলোক উপস্থিত থাকিতেন; সকলের পরিচয় অবগত হইয়া কন্যা নিজের অভিমত বরকে পতিত্বে বরণ করিত; অল্পবয়স্কা কন্যার পক্ষে বিচারপূর্বক পতিমনোনয়ন অসম্ভব। মৎস্যগন্ধা, দেবকী, কুন্তী, রুক্মিণী, সত্যভমা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রেবতী--ইহাদের কাহারই যৌবনোদ্গমের পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, যৌবনোদ্গম পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের অভিভাবকগণের সনাতন ধর্মের হানির বা পূর্বপুরুষগণের স্বর্গচ্যুতির কথাও কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

সম্ভবতঃ মুসলমান রাজত্বের কালে কোনও বিশেষ কারণে গৌরীদানের প্রথা প্রচলিত হয়, এখন সেই কারণ বিদ্যমান আছে কিনা জানি না, থাকিলেও গৌরীদানের দ্বারাই তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই—তজ্জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং বাল্যবিবাহের প্রয়োজনীয়তা এখন আর নাই, বরং দূষনীয়তাই প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হইতেছে।

তারপর বিবাহ একটা সামাজিক বিধি—শরীরের সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গেই ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আদিম যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষের মিলন প্রথার পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বহু সময়ে এই প্রথার বহু পরিবর্তন হয়া গিয়াছে। যাঁহারা সমাজ-তত্ত্ববিজ্ঞ, যাঁহারা শরীর তত্ত্ববিৎ, বিশেষতঃ যাঁহারা যৌন সম্মিলন বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন—তাঁহারা প্রায় সকলেই বাল্যবিবাহকে দেহের ও সমাজের অনিষ্টজনক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। আঁহাদের অভিমত উপেক্ষনীয় নহে।

জাগরণ।

১৩৩৬ সাল ১৫শ বর্ষ ৪৬শ সংখ্যা

"দেশ জেগেছে" "দেশ জেগেছে", এই যে একটা বিরাট রব চারিদিকে উঠেছে, এতে ভয়ের যতটা কারণ আছে, আনন্দের ততটা কারণ নাই। সুস্থ সবল স্বাধীন জাতির নিদ্রাভঙ্গ এক রকম। দুর্বল ভীরু পরাধীন জাতির নিদ্রাভঙ্গ অন্য রকম। রোগী ও মাতালের ঘুম ভাঙ্গিলে তাদের সুপ্ত বেদনা মাথার ভিতরে এমন যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি করে যে, তাতে তারা দুঃসহ কষ্ট পায়। চিকিৎসক সেই জন্য রোগীকে নিদ্রাভঙ্গের পরে ঔষধ সেবন করায়। মাতাল নিদ্রাভঙ্গে খোঁয়াড়ি কাটাইবার জন্য গরম পেগ সেবন করিতে বাধ্য হয়। অসময়ে অস্বাভাবিক উপায়ে নিদ্রাভঙ্গ করিলে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে। আমরা যেটাকে জাতীয় জাগরণ মনে করিয়া আনন্দে চীৎকার করিতেছি সেই জাগরণ তাড়নার ফল কুম্ভকর্ণের অসময়ে নিদ্রাভঙ্গের চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার। কুম্ভকর্ণ কয়েক মাস মাত্র নিদ্রা যাইত। আমরা যে প্রায় হাজার বৎসর নিদ্রাভিভূত ছিলাম! আমাদের এই দীর্ঘ কালব্যাপী নিদ্রা সুস্থ ও সবল জাতির নিদ্রা নহে। দুর্বল ভীরু পরাধীন জাতির নিদ্রা। অনৈক্য ও ধর্ম-

হীনতার মরফিয়া শাণিত অস্ত্রমুখে আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা যাহাতে চিরনিদ্রিত থাকি তাহার ব্যবস্থাও আমাদের দেশের শাসনকর্তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান সভ্যতা আমাদিগকে নিদ্রিতাবস্থায় নূতন ধরণের বিলাসিতায় পাশ্চত্য সভ্যতার বশীভূত হইয়াছি। সেই জন্য যাহাকে আমরা জাগরণ মনে করিতেছি তাহা সমাজকে সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। অবসাদ আমাদিগকে বিলাসিতার বাসর শয্যায় যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ঘরে আগুন লাগিলে মানুষ যখন জাগিয়া উঠে তখন কি তাহারা আগুন নিভাইবার চেষ্টা না করিয়া নাচ গান থিয়েটার বায়স্কোপ আরম্ভ করিয়া দেয় ? আমাদের তথাকথিত নেতারা বিকাল বেলা তিন টাকা দামের খদ্দর পরিধান করিয়া বক্তৃতামঞ্চে জাগরণের অভিনয় করিতেছে, কিন্তু বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া সারারাত্রি হাজার টাকা মূল্যের ফ্রেঞ্চ সিল্কে প্রস্তুত শয্যায় শুইয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে। নিদ্রিতাবস্থায় আমরা বদ্ধ কারাগৃহের বিষাক্ত বায়ুতে পূর্বেকার স্বাস্থ্য হারাইয়াছি। জাগরণের স্বাভাবিক ধর্ম মানুষকে নূতন শক্তি প্রদান করে। নিদ্রাবসানে সে কর্মক্ষেত্রে দৌড়িয়া গিয়া দেহ ও মনকে শ্রমশীল কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া রাখে। যেটাকে আমরা জাগরণ বলিয়া আস্ফালন করিতেছি সেটা বাস্তবিক জাগরণ নহে। এখনো যে আমাদের চোখে বিলাসিতার নেসা বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। যে শুভ পরিবর্তনের সঙ্গে চক্ষুর স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে তাহা অনেক সাধনা, অনেক ত্যাগের ফল আমাদের জাতীয় জীবনে যখন সেই শুভ পরিবর্তন সংঘটিত হইবে তখন আমরা আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিব না। বাঙ্গালার দেশ-জোড়া কর্মক্ষেত্রে তখন আমরা ঝাঁপাইয়া পড়িব। যথার্থ জাগরণ যে কি তখন আমরাও বুঝিব, জগতের লোকেও বুঝিবে। এখন যে জাগরণের অভিনয় আমরা করিতেছি তাহার চিত্র কবি নবীন সেন অংকিত করিয়া গিয়াছেন। পলাশীর রণক্ষেত্রে যখন বাঙ্গলার স্বাধীনতা অস্তমূখী হইয়াছিল সিরাজদৌল্লা তখন আমাদের মতই জাগিয়াছিলেন ও আমাদের মতই বলিয়াছিলেন—

"চলুক চলুক নাচ টলুক চরণ ;
উড়ুক কামের ধ্বজা, কালি হবে রণ।"

জঙ্গিপুর সংবাদের ষোড়শ বর্ষ প্রবেশ।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

এই ক্ষুদ্র সংবাদপত্র আজ পনের পেরিয়ে ষোল বৎসরে পদার্পণ করলো।

আজকাল সংবাদপত্র পরিচালনা যে কিরূপ বিড়ম্বনা তা' ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। সাধারণেরও ইহা উপলব্ধি করা খুব কঠিন নয়। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলায় প্রতি বৎসর কত নূতন নূতন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে, আর অল্পদিন পরেই শুকিয়ে যাচ্ছে। কাগজের দোকানদার বা ছাপাখানার অক্ষর বা কালী বিক্রেতারা তাদের ফার্মের সামনে দিয়ে ছাতা আড়াল দিয়ে লোক যেতে দেখলেই মনে করেন নিশ্চয়ই এ লোকটা কোন দেউলিয়া সংবাদ পত্র পরিচালক। অমনি তার পেছনে চাকর লেলিয়ে দিয়ে বলেন—দেখতো অমুক কাগজের অমুক কিনা ? ইহাতে সহজেই অনুমান করা যায়

যে এই সংবাদ পত্রের ব্যবসাটী কেমন লাভজনক। কাগজ বাহির কর্‌বার পূর্বেই কাগজের প্রধান রসদ-জোগানদার বিজ্ঞাপনদাতাদের করুণা ভিক্ষা কর্‌তে হয়। বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যেও আবার তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়। যাঁহারা ১ম শ্রেণীর, তাঁহারা বিলটী পেঁছিবামাত্র পাওনা টাকা পরিশোধ করিয়া দেন। ইঁহাদের সংখ্যা খুব কম। যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর তাঁহারা পাওনা টাকার জন্যে কিছুদিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রাপ্য টাকার আংশিক পরিশোধ করেন আর বলেন যদি খুব তাগাদা করেন তা'হলে আগামী মাস হ'তে আর বিজ্ঞাপন ছাপাবেন না। এঁরা কাগজওয়ালাদের ধাত বোঝেন ঠিক। এঁরা জানেন যে তাঁদের চেয়ে কাগজওয়ালাদেরই গরজ বেশী। ৩য় শ্রেণীর যাঁহারা, তাঁহারা কিছুদিন বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে নিয়ে ওয়াদার ওপর ওয়াদা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একেবারে গা ঢাকা দেন। তাঁদের অফিসে গেলে হয় দারোয়ান নয় কর্মচারী বলেন—বড় বাবু নাই অমুক দিন আস্‌বেন। তারপর একদিন দেখা গেল তাঁদের যে ঘরে ফার্ম ছিল তাতে তিনটী কুলুপ মারা। তারপর একদিন দেখা যায় সেই ঘরে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে TO LET. কাগজওয়ালা দেখিলেন যে 'ইনি হামসে ওস্তাদ।' মফঃস্বলের কাগজের খরচটা টায়ে টায়ে চলে যায় সরকারী বিজ্ঞাপনের আয় থেকে। যদিও এ খরচা দেশের লোকেই জোগায় তবুও এটা পাওয়া যায় সরকারের মারফৎ। জঙ্গিপুর সংবাদ এই সব শ্রেণীরই বিজ্ঞাপনদাতার অনুগ্রহ পেয়েছিল। সম্প্রতি শেষোক্ত বিজ্ঞাপনে বঞ্চিত হয়েছে। কেহ কেহ বলেন এতদিনের কাগজ যেমন করেই হোক চল্‌বে। আবার কেহ কেহ বলেন "হাড়িকে কুবুদ্ধি লাগে শূয়রকে মারে ঝাঁটা।" পায়ে লক্ষ্মী ঠেল্‌লে কে কি কর্‌বে? অত বাড় ভাল নয়। ঠিক হ'য়েছে। ভাত খাবে একজনের গীত গাবে আর একজনের—একি সয়!

যাঁর মনোবৃত্তি যে প্রকার তিনি সেই প্রকারের মন্তব্য প্রকাশ ক'রে থাকেন। আমাদের যে অবস্থা কি তা' আমরা ভিন্ন অন্যে সম্যক না বুঝলেও 'বেতি' সংখ্যার কাগজ দেখলেই অনুমান কর্‌তে পারেন যে আমরা কেমন আছি। যখন কোন দরদী বন্ধু এসে জিজ্ঞাসা করেন—তোমরা কেমন আছ? তখন মন খুলে বলি "মরম ব্যথা করলো কারে—আছি মরমে ম'রে।" কোন মুরুব্বি শুধালে বলি—"টানাটানি পড়েছে, উপার্জনের নামটী নাইকো দেনায় মাথা বিকিয়েছে।" আবার যখন কেহ আমাদের এবম্বিধ দশাটা উপভোগ কর্‌বার জন্য কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করে তখন বলি বেশ আছি—ক্যা পরোয়া

অজগর করে না নকরী
পঞ্ছী করে না কাম।
দাস মালিকা কহ্ গয়ে
সবকো দাতা রাম॥

এমনি খোট্টাই বুলি কপচিয়ে বাহাদুরী দেখাই। আবার কখনও জ্ঞান-গর্ভ শ্লোকে বলি—"অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ।" সত্যি কথা বল্‌তে গেলে এই পনের বৎসর ধরে কাগজের ব্যবসা ক'রে হিসেব খতিয়ে দেখেছি "আমরা যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল!" যদি বলেন—তবে একাজ করা কেন? এ কাজটা পেশা হিসেবে কিছু না হলেও নেশা হিসেবে মন্দ নয়। নেশা ধরে গেলে ছাড়া কঠিন। অন্য লোকে যাই ভাবুন না নিজেকে

যে গুণী লোক ব'লে ভাবে সে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না। তা" লাভই হোক আর লোকসানই হোক।

একটা গল্প মনে হলো। বিরক্তি হ'লেও, ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি মনে হলেও শুনুন—এক জমিদারের ছেলের মগজে চাপলো সঙ্গীতের নেশা। বাপ ম'রে গেলে এই নেশার ঝোঁকে খুলে ফেললে এক যাত্রার দল। এদল ওদল সেদল থেকে মোটা মোটা মাইনে দিয়ে ভাল ভাল অভিনেতা ভাঙ্গিয়ে নিজের দলে বাহাল করলে। যাত্রার দলের ব্যয় তো কম নয়। কিছুদিন পরে 'আইরন্ চেষ্ট্' খালি হলো। তখন এখানে ওখানে বায়না গেয়ে যা' পায় সে টাকা নিয়ে যতদূর হয় বাকি খরচ জমিদারী রেহান দিয়ে চালাতে লাগ্লো। একদিন এক রাজবাড়ীতে বায়না গাইতে গিয়ে গান ভাল না হওয়ায় পাল চাপা দিয়ে উত্তম মধ্যম দিলে। উপরন্তু সাজ-পোষাক যন্ত্র-তন্ত্র সব কেড়ে নিয়ে বিদেয় ক'রে দিল। যখন সদলবলে রেলে ফিরে যাচ্ছে তখন এক ভদ্রলোক প্যাসেঞ্জার এত লোক একসঙ্গে দেখে জিজ্ঞেস কল্লেন "আপনারা কি বিয়ের বরযাত্রী?" তখন অধিকারী মশায় বাজখাঁই গলায় উত্তর কল্লেন "মশাই, আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছেন না?"

ভদ্রলোক—আপনারা বুঝি যাত্রাদলের লোক?

অধিকারী—আজ্ঞে হাঁ।

ভদ্রলোক—আপনাদের সাজ-পোষাক যন্ত্র-তন্ত্র সব কোথায়?

অধিকারী-মশাই! যেখানে গান গাইতে গিয়েছিলাম গান খুব ভাল হয়েছিল কিনা, তাই মালিক বল্লেন যে ঝুলনে আবার আসতে হবে। আমরা বল্লাম "যদি অন্য কোথাও মোটা বায়না হয় তবে আসতে পারবো না।" হুকুম হলো —যন্ত্র-তন্ত্র আটকে রেখে দাও। তাই সব কেড়ে নিয়ে রেখে দিয়েছে।

ভদ্রলোক—পাওনা কেমন হলো?

অধিকারী—পিঠ খুলে দেখ্লেই পারেন।

ভদ্রলোক—যদি এমনি পাওনা হয় তবে দল চলে কিসে?

অধিকারী—বাপ দাদার কিছু ছিল তাই দিয়ে চালালাম, আর বোধ হয় চলে না।

ভদ্রলোক—তবে একাজ করা কেন?

অধিকারী—গুণী লোক কিনা—চুপ ক'রে কি ব'সে থাকা যায়।

আমাদেরও তাই। যেমন ক'রেই হোক কাগজ চালাতেই হবে। যখন ভবিষ্যৎ ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠে তখন "জবাকুসুম" "কেশরঞ্জন" "রেডক্রস্" এর ভরসায় সেটা ঠাণ্ডা করি—"সুরবল্লী" দিয়ে তাগদ আনি।

বিধি বাম হয়েছে বলে "হিলিংবাম" "ইলেক্ট্রিক সলিউসন" "আতঙ্ক নিগ্রহের" ভরসায় আতঙ্ক দূর করি। চোকে যখন সর্ষপ পুষ্প দেখি তখন "পদ্ম মধু"র দিকে চাই। তারপর 'বণ্ড' তো আছেই। চরমে ডসেন কোম্পানীর বিনাসার দিকে চাইতেও ভুল করি না।

যদিও আমরা ইতিপূর্বে একবার "ডাইং ডিক্লারেসন" দিয়েছিলাম তবুও মরিবার ইচ্ছা নাই। যেমন ক'রেই হউক কাগজকে বাঁচিয়ে রাখতে ত্রুটি করবো না।

ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।" এ কামনা আমরাও করি। তাই ব'লে আমাদের

যথেচ্ছাচারীর হুমকীতে ভীত হ'য়ে "আমার মাথা খে°তো ক'রে দাও হে তোমার সবুট পায়ের তলে" বলে নত হওয়া নীতি অবলম্বন যেন না করতে হয়। আমাদের নববর্ষ প্রবেশে আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট এই আশীর্বাদ যাচ্ঞা করি।

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম।

১৩৩৭ সাল ১৬শ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা

যষ্ঠীপর বৃদ্ধ, কটিবাস সম্বল মহাত্মা গান্ধী আজ ভারতের বুকে নব সাধনার হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন। দরিদ্রের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রকৃতিদত্ত যে লবণ তাহার উপর সরকার কর্তৃক যে শুল্কের প্রবর্তন তিনি সর্বাপেক্ষা অন্যায় বলিয়াই মনে করেন এবং সেই অন্যায়কে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন। গত ১২ই মার্চ তারিখে তিনি মাত্র ৭২ জন সহকর্মীকে লইয়া সবরমতী আশ্রম হইতে ডান্ডির সমুদ্রোপকুল অভিমুখে রওনা হন। পদব্রজে ২৫০ মহিলা পর্য্যটন করিয়া ৪০টী গ্রামেব উপর এই নব-যাত্রার রাণী ছড়াইয়া ২৫ দিন পরে তিনি ডান্ডিতে পে°ছান। ৬ই এপ্রিল প্রাতে ৮৷৷৹ ঘটিকার সময় তিনি লবণ আইন অমান্য করিয়াছেন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানে মহাত্মা এই সত্যাগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছেন। ভারত তাঁহার আহ্বান নত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে লবণ আইন অমান্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক মহাত্মাজীর অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। বাঙ্গলায় মহিষবাথান, কাঁথি, নোয়াখালীতে প্রথম কার্য্য আরম্ভ হয়। এক্ষণে প্রত্যেক জেলা হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জগতের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত বহু স্বাধীনতার সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, সে সমস্তই হিংসা ও পশুবলের সাহায্যে। মহাত্মা গান্ধী যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন ইহা জগতে অপূর্ব ; মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। এ সংগ্রামের ফলাফলের জন্য শুধু আমাদের দেশবাসী নয়, সমস্ত জগৎ আজ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

লবণ যুদ্ধ।

১৩৩৭ সাল ১৬শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধীর জয় হইয়াছে—তিনি প্রকাশ্যভাবে সরকারী আইন অমান্য করিয়া লবণ প্রস্তুত করিয়াছেন কিন্তু পুলিশের লোক তাঁহাকে বাধা দেয় নাই কিম্বা গ্রেপ্তারও করে নাই। তিনি চুরি করিয়া লবণ প্রস্তুত করেন নাই বহু স্বেচ্ছাসৈনিকদের গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং বিচারে তাঁহাদের কারাদণ্ডের আদেশও হইয়া গিয়াছে কিন্তু একই অপরাধে অপরাধী বহু সংখ্যক লোকের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া স্বল্প সংখ্যক লোকের উপর আইনের প্যাঁচ খেলান কোন্‌দেশী আইন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইংরাজের রচিত আইন

পুস্তকেই না লিখিত আছে—"আইনের চোখে সকলেই সমান" তবে আজ মহাত্মার বেলায় এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করার কৈফিয়ৎ কি?

মহাত্মা অনেক চিন্তার পর লবণ আইনের প্রতিই প্রথম অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ভারতীয় শাসক সম্প্রদায়কে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন। সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে বিপক্ষ দল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিতেছে না, পরন্তু অন্যান্য সমরাঙ্গণে কর্তৃপক্ষগণ অপরাপর কর্মীদিগকে লইয়া টানা হ্যাঁচড়া করিতে বিশেষ কার্য্যতৎপরতা দেখাইতেছে। মহাত্মা তখনই ছুটিয়া গেলেন সেইখানে কিন্তু তাঁহাকে আইন অমান্য করিতে দেখিয়াও কেহ আজ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করিতে পারিল না। ইহাতে কি তাঁহারই জয় হইয়াছে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইব না?

মহাত্মা এই লবণ আইনের প্রতি কেন তাঁহার প্রথম অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন তাহা একবার দেশবাসীকে অনুধাবন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। লবণের প্রতি ইংরাজ প্রথমে কিভাবে ট্যাক্স বসাইয়া এদেশের লবণ কারখানাগুলি ধ্বংস করিয়াছিল তাহার ইতিহাস অতি মর্মান্তিক। নীলের কুঠিওয়ালাদের অত্যাচার হইতে তদানীন্তন গভর্ণমেণ্টের এজেণ্টগণের দ্বারা দেশীয় লবণ কারখানার কারিকরগণের প্রতি অত্যাচার কোন অংশেই কম ছিল না। শ্বেতাঙ্গ এজেণ্টগণ দেশী কারিকরগণের প্রতি ঐ রকম করিতে পারে তাহা আমাদের ধারণার অতীত।

কোম্পানীর আমলের পূর্বে এদেশের লোক বিনা লবণে ভাত খাইত না। কিন্তু সেই লবণ আসিত কোথা হইতে? বাংলা দেশের সমুদ্রোপকূলে বহু স্থানে তখন লবণ প্রস্তুত করিবার কারখানা ছিল এবং সেগুলি এদেশবাসীদের দ্বারাই পরিচালিত হইত। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজগণ লবণের উপর ট্যাক্স বসাইতে আরম্ভ করে। মীরকাসিম সেই ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলেই বক্সার যুদ্ধ হয়। তারপর ক্লাইভ কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ বণিকসহ এক সোসাইটী অব্ ট্রেড গঠন করিয়া নিয়ম করিয়া দেন যে ঐ সমিতির অনুমতি ছাড়া কেহ লবণ তৈয়ার করিতে পারিবে না। ফলে ঐ সমিতি দেশীয় সমস্ত লবণ আটক করিয়া ইচ্ছামত লবণের দর চড়াইয়া দেয়।

ইহাতেও সুবিধা হয় না দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট বিলাতী লবণের অবাধ গতি করিয়া দিবার জন্য বাঙ্গলা দেশস্থ সুন্দর বন, ২৪ পরগণা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের লবণের কারখানাগুলি একেবারে তুলিয়া দিলেন। কিন্তু দেশীয় গরীব লোকগণ তখন গোপনে লবণ প্রস্তুত করিয়া নিজেদের কাজ চালাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট আইন করিলেন—কোন জমিদারের এলাকায় কেহ গোপনে লবণ প্রস্তুত করিলে সেই জমিদারের ৫000 টাকা জরিমানা হইবে। কোন প্রজা যদি ভাতের হাঁড়ীতে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করিয়া খায়, তবে প্রত্যেক হাঁড়ীর জন্য জমিদারকে ৫00 টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। এই আইন করিবার পর দরিদ্র জনসাধারণ সমুদ্রের জলে খড়কুটা ভিজাইয়া, তাহা বাড়ী আনিয়া ক্ষার করিয়া সেই লবণাক্ত ক্ষার মাখিয়াই ভাত খাইতে থাকে। বণিক গভর্ণমেণ্ট উহাও সহ্য করিতে না পারিয়া আইন করিল—সমুদ্রের জলে কিছু ভিজাইয়া ক্ষার করিলেও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে!

সমুদ্রবেষ্টিত ভারতে লবণের জন্য আজ লিভারপুলের জাহাজের দিকে

চাহিয়া থাকিতে হয়—বিনা পয়সায় যেখানে মুঠা মুঠা লবণ সংগ্রহ করা যায় সেখানে আজ পয়সা দিয়া লবণ কিনিতে না পারিলে আলুনী ভাত খাইতে হয়—পরাধীনতার লাঞ্ছনা বন্দী জীবনের পরিহাস ইহার চেয়ে অধিক আর কি হইতে পারে তাহাত জানি না।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে এদেশে এত সস্তায় লবণ তৈরি হইত যে, বিলাতের লবণ প্রতিযোগিতায় এদেশে দাঁড়াইতে পারে নাই কিন্তু গভর্ণমেণ্ট দেশীয় লবণের দর অত্যধিক চড়াইয়া বিলাতী লবণ সস্তা দরে বিকাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। কিন্তু হিন্দুগণ প্রথম প্রথম বিলাতী লবণ খাইতে অস্বীকার করেন, শেষে বাধ্য হইয়াই উহা গ্রহণ করিতে হয়। দেশীয় লবণ শিল্প ধ্বংস এবং বিলাতি লবণ আমদানির ইতিহাস ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের এক অতি নির্লজ্জ স্বার্থসিদ্ধির তুলনাবিহীন ইতিহাস। সে ইতিহাস ইংরাজের দপ্তরখানায় রহিয়াছে। কিন্তু দেশবাসী তাহা জানিতে পারে নাই বলিয়াই এই বিশাল দেশের অগণিত জনসাধারণ এতকাল যাবত এই দুর্নীতিমূলক আইন নীরবে নির্বিবাদে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। মহাত্মা জনসাধারণের দুঃখকে অবলম্বন করিয়াই আজ এই লবণ সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আমার ঘরের পাশে সমুদ্রের জলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ লবণ সঞ্চিত রাখিয়াও আমাকে আজ লিভারপুলের লবণ পয়সা খরচ করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। আমার ঘরে পয়সা নাই, তাই বলিয়া প্রকৃতি দত্ত লোণাজল সিদ্ধ করিয়া দুটি ভাত মুখে দিবার অধিকারও আমার নাই—ইহা কি বিচার, ইহা কি আইন, ইহা কি স্বার্থ-গৃধ্নু আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার নয়?

যাহা অত্যাচার তাহা মিথ্যা। সেই মিথ্যার বিরুদ্ধেই আজ মহাত্মার সংগ্রাম আবদ্ধ হইয়াছে। সত্যের প্রতি যাঁহার অচল নিষ্ঠা, ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার অটল বিশ্বাস রহিয়াছে—তাঁহার জয় অবশ্যম্ভাবী।

বাঙ্গলার দুর্দশা।

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

বাঙ্গালা দেশের দুর্দশার আর অন্ত নাই। যেভাবে দিনে দিনে—পলে পলে বাঙ্গলায় লোকক্ষয়, ধনক্ষয়, আয়ুক্ষয় হইতেছে, তাহাতে কতদিন যে এজাতি বাঁচিয়া থাকিবে, সেই বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ হয়। বাঙ্গলায় প্রতি বৎসরই লোক সংখ্যার হ্রাস হইতেছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান কর্মচারী ডাঃ বেণ্টলী এক বিবরণ দিয়া জানাইয়াছেন যে ভারতে সকল প্রদেশের তুলনায় বঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত কম।

প্রদেশ	প্রতি সহস্রে ১৯২৯ সালে লোকসংখ্যা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে
পঞ্জাব	২১·৬
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৩·২
যুক্ত প্রদেশ	১৪·১

কিন্তু দেশের অশিক্ষা দূর, কৃষিকার্য্যের উন্নতি, গ্রামের সংস্কার, জল সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না।

আবার দেশের ধনী লোকদের কথা আর কি বলিব? ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া যৎসামান্য সুদ ভোগ করিয়া তাঁহার আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া থাকিবেন; কিন্তু দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ২/৪ হাজার টাকা ধরিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নাই। এই যে দেশে বিদেশীদ্রব্য বয়কটের তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এখন যদি ধনী জমিদারগণ মূলধন সরবরাহ করিয়া কারবার খুলিয়া দেশে জিনিষপত্র উৎপাদন করিতে আরম্ভ করেন, তবেই ত দেশের টাকা দেশে থাকিবে। শুধু "বয়কট" আন্দোলন করিয়া লাভ নাই। সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্র উৎপাদনের দরকার। আমরা আশা করি, যাঁহাদের প্রাণে বাঙ্গলার দুর্দশা স্মরণ করিতে বিন্দুমাত্রও আঘাত লাগে, তাঁহারা বৃথা বাক্য-ব্যয় না করিয়া যাহাতে বাঙ্গালী আধি, ব্যাধি, জ্বরা, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাব হইতে রক্ষা পায় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন।

"সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মা! আমাদের যে কিছুই নাই। সকল দিকেই অভাব, সকল বস্তুরই অনটন।

আমরা অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত্ত, জলাভাবে তৃষ্ণার্ত্ত, বস্ত্রাভাবে শীতার্ত্ত, চিকিৎসাভাবে রোগার্ত্ত, বলাভাবে ভয়ার্ত্ত, অর্থাভাবে বিপন্ন, দুর্ভাবনায় অবসন্ন। তাই মা তোমাকে জানাইতেছি আমাদের অভাব অভিযোগের অবধি নাই। আমাদের সবই চাই। বরাভয়দাত্রি! তোমার বরে আমাদের সকল সাধ পূর্ণ হউক; আমাদের শঙ্কা দূর হউক।

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই,
আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু;
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য,
চাই আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।"

আমাদের ক্রমাগত ও কেবল দেহি দেহি রব মাত্র সম্বল। অন্ন, জল, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ সবই দিতে হইবে। তবে মা, আমাদের প্রার্থিত অন্ন দাসত্বের নিবীর্য্য অন্ন নয়; প্রবঞ্চনা প্রতারণার কদর্য্যান্ন নয়; ভিক্ষালব্ধ মৃতান্ন নয়। আমরা চাই সদুপায়ের শুদ্ধান্ন; স্বাবলম্বনের অমৃতভোগ; "মাথার ঘাম পায় ফেলার" মোটা ভাত, মোটা কাপড়। সেই অন্ন, যাহা স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল পরমায়ুর নিঃসংশয়িত নিদান।

প্রাণ চাই; যে প্রাণ পরের দুঃখে সমবেদনা, পরের সুখে সহানুভূতি প্রকাশে কুণ্ঠিত হয় না। চিত্তের কৃপণতায় সদা আচ্ছন্ন প্রাণ নয়। যে প্রাণ সদনুষ্ঠানের সহায়তায় ও সহকারিত্বে বিমুখ হয় না।

তাহার পর বল ও স্বাস্থ্য। নির্য্যাতন নিপীড়নের সামর্থ্য নয়;—কর্ত্তব্য সাধনের সংযত সমাহিত শক্তি। সুস্থ মন সুস্থ দেহ—এ আর ইহজগতে কাহার কাম্য বা ঈপ্সিত নয়?

এখন আনন্দের কথা ; যে আনন্দ জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া দিবে। সে আনন্দের স্বাদ কিসে পাওয়া যায় ? সেই আনন্দ চাই যাহার অস্তিত্ব কঠোর জীবন-সংগ্রামে, কর্তব্য কর্মের সম্পাদনে ; জীবন সমস্যার সমাধানে ; উদ্দেশ্য সিদ্ধির কষ্টভোগে।

ত্যাগের আনন্দ—সম্ভোগের তৃপ্তি নয়। কর্মনিষ্ঠার আনন্দ—আলস্য অবসাদের জড়তা নয়। সেবাপরায়ণতার নির্মল অনুভূতি—স্বার্থসিদ্ধির উল্লাস নয়। আত্মনির্ভরশীলতার পুরুষত্ব—পরবশতার নিশ্চেষ্টতা নয়।

স্বাধীন অন্নের, অক্ষুন্ন চিত্তের, অটুট স্বাস্থ্যের, আত্মশুদ্ধির, আত্ম-সংযমের, আত্মমর্য্যাদাবৃদ্ধির আনন্দ ;—মনুষ্যত্ব বিকাশনের নিবিড় নিষ্কলঙ্ক আনন্দ।

উত্থান পতনের, আলো ছায়ার, হর্ষ বিষাদের, শ্রম বিশ্রামের আনন্দ। সুরেশ্বরি ! মা আমাকে এই আনন্দের অধিকারী হয় ; এই আনন্দ মন্দিরে প্রবেশের আগমনমন্ত্রে দীক্ষা দাও, নির্গম আমি চাই না।

বাণীবন্দনা।

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

বসন্ত বায়ুর স্পর্শে শীতের জাড্যজাল যেমন অপসারিত হয়, বসন্ত প্রভাতের অরুণের হিরণকিরণদ্যুতি মানুষের চিত্তকে যেমন কর্মের প্রেরণা দিয়া অপূর্ব পুলকে নাচাইয়া তোলে, তেমনি জাতির জীবনেও একদিন বসন্তাগম হয়। সেদিন জাতির যুগান্তের জাড্যজাল বিচূর্ণ করিয়া আপনার মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, দিকে দিকে তাহার প্রতিভার ধারা বিস্ফুরিত হইয়া থাকে। জাতির জীবনমূলে অবস্থান করিয়া এই যে শক্তি—কখনো সুপ্তা, কখনো জাগরিতা হইয়া থাকেন, তিনিই ভারতী, বাণী, বা সরস্বতী। ব্যক্তির জীবনে তিনি যেমন নিগূঢ় অন্তঃপ্রবাহিনী তেমনি জাতির জীবনেও তিনি অন্তঃ প্রবাহিনী স্বরূপে সমভাবে বহমান।

হিন্দুর প্রাণতন্ত্রী একদিন এই শক্তির স্পর্শ পাইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, অন্তরের সেই দেবীর মোহন বীণার ঝঙ্কারে সেদিন হিন্দু জাগ্রত হইয়া আপনার সেই মর্মবাণী বিশ্বসংসারে প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়, সৃজণী প্রতিভার বিভিন্ন এবং বিচিত্র ভঙ্গীর ভিতর দিয়া সে সেই জীবন্ত যৌবনের বাণী প্রচার করিয়াছিল—মরণের বিভীষণতার উর্দ্ধে মানবকে এক অব্যয় অমৃতের সন্ধান দান করিয়াছিল। সেই অমৃত ধারার স্পর্শেই নালন্দা জাগিয়াছিল, বিক্রমশীলা জাগিয়াছিল,—রবাব মুরজ, বীণা সমস্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। এই যে চিরযৌবন বিভ্রমময়ী দেবী, জাতির অন্তরে থাকিয়া বীণাটি বাজাইতেছেন, হিন্দু একদিন তাঁর দর্শনলাভ করিয়াছিল দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে তাঁহার রূপের ছটা তাহাকে কোন কল্প-লোকে তুলিয়া লইয়া বাস্তব জগতে আপনার বিভূতিকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিল—সেই যৌবনরূপ সাধনার প্রেরণাতেই জাতি জাগিয়াছিল—তাহার জীবনে বসন্তাগম হইয়াছিল।

সে বীণা নীরব হইয়াছে,—নালন্দা তক্ষশীলা হিন্দুর আর নাই—হিন্দু

সভ্যতার বিশিষ্টতা, বিশ্বদেবতার বরণডালায় তেমন স্বচ্ছন্দ সম্ভার আর নাই। সে শক্তি যেমন শীতের জাড্যে, আজ সংকুচিত হইয়া গিয়াছে কতদিনে তাহার জীবনে আবার বসন্তাগম হইবে কে জানে? এই বসন্তাগমের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ বা ধারা আছে কি?

ইতিহাসের পাতা ঘাঁটিয়া সে তত্ত্ব নিরূপণ অতি দুরূহ কার্য্য। অতীতের অনেক মহতী সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—রোম গিয়াছে, গ্রীস গিয়াছে, বেবিলন গিয়াছে, মিশরের সেই অতীত সভ্যতার বাণীও আজ নীরব—বিশ্বদেবতার যৌবন-লীলায় তাহাদের বিকাশ ও বিলাস অপর সভ্যতার ভিতরে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিয়াছে—তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আর নাই। কিন্তু হিন্দু আজও মরে নাই, যুগ যুগান্তের আঘাত সহ্য করিয়া সে বাঁচিয়া আছে। ইহার কারণ কি? অতীতের শত সভ্যতা লোপ পাইল, কিন্তু বিশ্বদেবতার বিকাশ বিলাসের, তাঁহার সমন্তোৎসবের কোন গূঢ় এবং গোপন রসসম্ভার হিন্দু সভ্যতার এই বুকে সঞ্চিত সংকুচিত রহিয়াছে যে সে আজও বাঁচিয়া আছে।

বিশ্বের দরবারে হিন্দুর বাণী এখনও শেষ হয় নাই—এই যে বর্তমান অবসাদের ভাব ইহা তাহার দূরীভূত হইবে। হিন্দু আবার আত্মস্থ হইয়া আত্মশক্তি মহিয়ান হইয়া, মধুমাসের মধুর মলয় সংস্পর্শে সেই মাধুরীময়ী দেবীর মাধুরীকুঞ্জে ফুটিয়া উঠিবে—বিশ্ব সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।

শীতের জাড্য ও অবসাদ এই যে অপসৃত হইল, বসন্তের বিকাশগরিমা প্রাচীর দিকভালে এই যে, অরুণদ্যুতিতে দেখা দিল, বিশ্ব প্রকৃতিতে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল, হিন্দু তোমার জাতীয় জীবনে একদিন কি এমনি বসন্ত আসিবে না? আসিবে সেদিন আসিবে। বাণীর সেই বসন্ত বাসরের উৎসব যে অবদান ভিন্ন সপূর্ণ হইবার নহে। তুমি আবার আত্মস্থ হও, নিজের অন্তরের দিকে ফিরিয়া তাকাও শ্বেতশতদলবাসিনী বাণীকে তুমি তথায় দেখিতে পাইবে। শোন, তাঁহার বীণার ধ্বনি যাহার কাণে গিয়াছে সেই তো নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। সে জীবনের আনন্দ কি তোমাকে এই দীর্ঘ প্রসুপ্তি হইতে জাগ্রত করিবে না?

বিলাতী দ্রব্যের আমদানী।

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে সুপারি আমদানি হইয়াছে ২ কোটী ৪৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, আদা ১ লক্ষ ৫৪ হাজার, কপূর ৩১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, টিনে ভরা মাছ আসিয়াছে ২৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা, ইহা ব্যতীত সাবান, এসেন্স, বাতি, ধাতু পাত্র প্রভৃতি বিলাতী জিনিষ লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে। মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, মালাবারে প্রচুর সুপারি উৎপন্ন হয়। ভারতের সুপারি বিদেশজাত সুপারি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। আসামেও সুপারি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বাংলার বাগানে সুপারি বৃক্ষের শ্রেণী শোভা বৃদ্ধি করে। কিন্তু তবুও প্রায় আড়াই কোটী টাকার সুপারি ভারতে আমদানি হয়—ইহা বড় ভয়ংকর কথা। বাংলার সুপারি বৃক্ষ কেবল যে শোভার কারণ তাহা নহে, নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় সুপারিও প্রচুর ফলিয়া থাকে। এই দিকে

সকলে দৃষ্টি দিলে, আমরা আড়াই কোটী টাকার সুপারি বন্ধ করিতে পারি। গৃহশিল্পের ন্যায় কার্পাস বৃক্ষ রোপণ করিয়া প্রতি গৃহস্থ যেমন তাঁত চরকা চালাইতে পারে, মুখশুদ্ধির জন্য, ঔষধাদি প্রস্তুতের জন্য সুপারির যে প্রয়োজন, তাহাও আমরা গৃহস্থের অঙ্গনে বাগানে সুপারি বৃক্ষ রক্ষা করিয়া অনায়াসেই মিটাইতে পারি। আমাদের ঘুম কি ভাঙ্গিবে না? চক্ষের সম্মুখে অনায়াসে বিদেশী বণিক্ আমাদের নিকট হইতে আড়াই কোটী টাকা লইয়া যায়, আমরা শ্রমজীবির ন্যায় কলের কুলি হইব আর শ্রমের কড়ি দিয়া জীবনের প্রয়োজন বিদেশীর নিকট খরিদ করিব—ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত কথা আর কি হইতে পারে।

সমুদ্রমেখলা ভারত, অসংখ্য নদনদী শোভিত এই সুজলা সোনার দেশে, ২৬ লক্ষ টাকার বিলাতী মাছ বিক্রয় হয়—আমাদের চক্ষু খুলিবে কবে? দেশের জিনিষ থাকিতে বিদেশের কাছে হাত পাতিয়া আমরা এমন করিয়া মরণের পথে কেন ছুটি? আজ অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানীর খবর পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। ভারতে যন্ত্র-যুগ চলুক, রজত মুদ্রার বিনিময়ে আমরা পঙ্গু হইয়া থাকি—এই বিরাট আত্মদানের ফলে অনুর্বর ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, কৃষির উন্নতি করিয়া লউক। এমন দিন আসিবে না তো, টিনে ভরা দুগ্ধের ন্যায়, বস্তা বস্তা চাউলও এদেশে আমদানী হইবে। গম যখন আসিতে পারে, সে দুর্গতি যে অসম্ভব, তাহা আর মনে করি কি প্রকারে? সত্যই আমরা অধঃপতিত জাতি—স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনা পরিত্যাগ করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইতে যে কত সাধ তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নহে। ভারতের সীমাহীন প্রান্তর অনাবাদে পড়িয়া থাকে, ভাগীরথী তীরের দুই-পার্শ্বে যন্ত্র-মহিমার যাদুগৃহে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী শোণিতপাত করিয়া উপায় করে প্রতি সপ্তাহে কয়েক খণ্ড রজত মুদ্রা—তাহাও ব্যয় করিতে হয়—জীবনের দায়ে বিদেশীর পণ্য খরিদে। তবুও বলিব—কল বসাও, শ্রম সংক্ষেপ কর, ধন্য আমাদের মস্তিষ্ক!

বিশাল দেশ, এই অসংখ্য জনসংখ্যা যদি আজ জীবনের দায় মাটী চষিয়া মিটায় তাহা হইলে এই দুর্ধর্ষ জাতির দুয়ারে যে বিশ্ব আসিয়া মাথা খুঁড়িবে—ভিক্ষাপাত্র হাতে; একবার দুর্গতি বহিবার জন্য প্রস্তুত হও রজত মুদ্রার মোহ ত্যাগ কর, রাজনগরীর বিলাসে আত্মহারা হইও না। হে ভারতের মহাজন, তোমরা অগ্রণী হও, হীন ও অধমেরা তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশের দুর্দিন দূর করিবে। আবার ঐশ্বর্যলক্ষ্মী তোমাদের ললাটে মুক্তির জয়টীকা আঁকিয়া দিবে। (বণিক)

পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যু

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

আমরা গভীর শোকের সহিত এই দুঃসংবাদ প্রকাশ করিতেছি। লক্ষ্মৌ সহরে পণ্ডিত মতিলাল গত শুক্রবার প্রাতঃকাল ৬-৪০ মিনিটের সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসার জন্য পূর্বরাত্রে লক্ষ্মৌএ তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। পথে কোন মন্দ চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। তাহার পর দেহাভ্যন্তরে কি পরিবর্তন হইয়া সব শেষ হইয়া গেল।

পণ্ডিতজীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে মহাত্মা গান্ধী, পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল,

ডাঃ জীবরাজ মেটা, পণ্ডিতজীর পরিবারস্থ অন্য সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র সহরের সমস্ত লোক আসিয়া অসম্ভব জনতার সৃষ্টি করিয়া বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে শোক প্রকাশ করিতে থাকে। বাড়ীর চারিদিকে বহু দূর ব্যাপিয়া লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতাতে এই সংবাদ আসিবামাত্র সমস্ত বেসরকারী স্কুল কলেজ ও সমুদয় দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিত মতিলাল এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তাঁহার বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা আয় ছিল। তৎকালে তাঁহার নিজের জন্য খরচের সীমা ছিল না। তাঁহার পরিহিত বস্ত্রাদি প্যারিসে পাঠাইয়া কাচান হইত। পুত্র কন্যা সকলকেই ইংলণ্ড পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়াছিলেন।

সেই পণ্ডিত দেশের প্রেমে পড়িয়া এক সম্পূর্ণ পৃথক মনুষ্য হইলেন। সমস্ত সম্পত্তি ও আয় কংগ্রেসে অর্পণ করিলেন। দেশের জন্য স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া জেলে গেলেন। রোগে ভগ্নদেহ অবস্থায় তাঁহাকে জেল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল, এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ন্যায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

দেশের লোককে আমরা কি বলিব, কেবল কাঁদ, আমাদের এমন একজন পরমাত্মীয় আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আকাশ অন্ধকার করিয়া ভারতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।

কঃ পঃথাঃ

১৩৩৮ সাল ১৮শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

চারিদিকে স্বরাজের কথা শুনিতেছি, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে স্বাধীনতার বুলি কপচাইতেছে—শুনিতেছি দেশ আগাইয়া যাইতেছে। কিন্তু ঘরের দিকে তাকাইতে গেলে যে মুখ শুকাইয়া যায়, মন দমিয়া যায়, চোখে আঁধার দেখিতে হয়। কী জীবন যাপন করিতেছি! কী হইতে চলিয়াছি। সত্য নাই, আচার নাই, ধর্ম নাই, সংযম নাই, উৎসাহ নাই, আনন্দ নাই। আছে শুধু অর্থের জন্য যে কোনও পাপকার্য করিতে কুণ্ঠিত না হওয়া। নিজেরা ত মরিয়াছিই—উদ্ধারের আর আশা নাই কিন্তু যাহাদের জন্য "হা অর্থ হা অর্থ" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি সেই সন্তান-সন্ততিগুলির কথাই কি ভাবি? পিতার কোন! দায়িত্ব পালন করিতেছি—আমরা পিতা "কেবলং জন্মহেতবঃ।" পুত্র কন্যাকে স্কুলে দিয়া ভাবিতেছি—মাসে মাসে বেতন দিই আবার কর্তব্য কি? ছেলের শরীরে বল আছে কি না, মনে সংযম আছে কি না, চরিত্রে ও চিন্তায় পবিত্রতা আছে কি না এবং না থাকিলে তাহা প্রতিবিধানের উপায় কি তাহা আমরা কে কবে ভাবিয়া দেখি? ছেলের চোখে মুখে অবয়বে ব্রহ্মচর্যহীনতা দেখিয়াও লজ্জায় কিছু বলি না। মৃত্যুর আর বাকি কি? আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভাবিতেছি স্কুল কলেজ গড়িয়া উঠিয়াছে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পাইয়াছি, দুদিন পরে দেশের ব্যবস্থাপক সভা মুঠির মধ্যে আসিবে—দেশের দুর্দিন ঘুচিয়া যাইবে, আবার সুদিন আসিবে। কিন্তু এ যেন বৃথা স্বপ্ন! দেশে সুদিন আনিতে হইলে "ভোল" ফিরাইতে হইবে, "মোড়" ঘুরাইতে হইবে। আবার সহজ সরল জীবনকে আদর্শ করিতে হইবে, চরিত্র ও জ্ঞানকে সম্মান করিতে হইবে,

পত্র কন্যাকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও নৈতিক চরিত্রে পবিত্র করিতে হইবে ; আর হইবে দুর্দমনীয় বিলাসলালসা ও অর্থাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করিতে। ধনৈশ্বর্য্যদীপ্ত পাশ্চাত্যের দিকে তাকাইয়া লাভ নাই। সেখানে আরাম আছে—আনন্দ নাই, ইন্দ্রিয়সুখ আছে—প্রাণে শান্তি নাই, আত্মসুখ সাধন আছে—বিশ্বজনীন করুণা ও প্রীতি নাই। আজ ভাবিবার দিন আসিয়াছে—কেন গ্রামে গ্রামে আনন্দ কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, পরিবারের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। সাহস সম্পদ কিছুই নাই। ইহার একমাত্র কারণ আজ আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছি—আগে দশজন না হইলে কোনও জিনিস ভোগ করিতাম না আর আজ দশজনকে বঞ্চিত করিয়া নিজের ভোগকেই সবচেয়ে বড় বলিয়া ভাবিতেছি। আগে যাঁহারা সমাজের সহস্র জনের আশ্রয় হইতেন, সহস্র লোকের উপকার করিতেন, দোলদুর্গোৎসবে দশজন দরিদ্রকে অন্ন দিতেন, সাধারণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া পথঘাট নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ কূপ তড়াগ খনন প্রভৃতি করিতেন তাঁহারাই সমাজের নেতা বলিয়া গণ্য হইতেন—সমাজের সকল লোক স্বভাবতঃই তাঁহাদের নিকট মাথা নত করিতেন। আজ জোর করিয়া দলাদলি পাকাইয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকি, স্কুল কলেজের ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বর হই, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করি কিন্তু কেহ যদি বলে মিউনিসি-প্যালিটী অর্থাভাবে এই সৎকার্য্য করিতে পারিতেছে না—তোমার প্রচুর অর্থ আছে কিছু দাও, দরিদ্র স্কুলকে কিছু অর্থ সাহায্য কর—তোমরা ত মিউনি-সিপ্যালিটীর কমিশনার, তোমরা ত স্কুল কমিটীর সভ্য—তবেই আমাদের চক্ষু চরক গাছ। আমরা উপদেষ্টার মস্তিষ্কবিকৃতি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহাকে রাঁচি পাঠাইবার জন্য ব্যবস্থা করি। পক্ষান্তরে এই সকল সাধারণের প্রতিষ্ঠান হইতে যদি কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে তবে তাহা লাভ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। দু এক স্থানে ধরা পড়িয়া রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইতেছি। কিন্তু নিদারুণ অর্থলোভে আজ লজ্জা নাই—আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান নাই। এরূপ নৈতিক অবস্থা লইয়া উন্নতির, স্বাধীনতার, ভবিষ্যৎ সুখের আশা নাই। কিন্তু কেহই ভাবিতেছি না, কঃ পন্থাঃ ?

শিক্ষক সমস্যা।

১৩৩৮ সাল ১৮শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা

মহাযুদ্ধের পর রণক্লান্ত পরাজিত জার্মানি, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক নূতন করিয়া দেশ গড়িয়া তুলিতেছে। অর্থবল নাই বলিলেই চলে তবু কত চেষ্টা, কত উদ্যম। তাঁহারা বুঝিয়াছে সকল উন্নতির মূল শিক্ষায়—আর শিক্ষাকে উন্নত করিতে হইলে চাই আদর্শ শিক্ষক। এই দেশগুলি তাই উঠিয়া পড়িয়া শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কেমন করিয়া শিক্ষকতা করিতে হইবে এই শিক্ষা যে না পাইয়াছে এমন কোনও ব্যক্তি ইউরোপের কোনও দেশের, আমেরিকার বা জাপানের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে পায় না। তাই এই সকল দেশের শিক্ষা সমুন্নত।

আমাদের দেশে কিন্তু ট্রেণিং এর কথা বলিলেই স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা উদাসীনতার সহিত হাই তোলেন আর যাঁহারা ট্রেণিং পান নাই এমন শিক্ষকের

প্রচার করেন যে ট্রেণিং না পাইলেও দক্ষতার সহিত শিক্ষকতা করা যায়। সুতরাং সময় ও অর্থব্যয় অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয়।

ট্রেণিং না পাইয়াও এতদিন বহু শিক্ষক আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সুখ্যাতির সহিত নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের কথা। ব্যবসায় হিসাবে দেখিতে হইলে ট্রেণিং অপরিহার্য্য। টাকা হাতে পাইলেই দোকান খোলা যায়—কেহ কেহ এইরূপ দোকান করিয়া দুপয়সা রোজগারও করেন কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা স্বীকার করা যায় না যে ব্যবসাদারকে ব্যবসা সম্বন্ধে একটা ট্রেণিং লইতে হইবে না। মাড়োয়ারী নিজের ছেলেকে ট্রেণিং দেয় তাই তাহার এক অবস্থা, আর বাঙালী বিনা ট্রেণিংএ ব্যবসা করে, তাহার আর এক অবস্থা। উপস্থিতবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও বাহ্যজ্ঞান না থাকিলে ওকালতিতে প্রসার প্রতিপত্তি লাভ হয় না, রোগ নির্ণয়ে সহজ স্বাভাবিক শক্তি ও তাহার মূলোচ্ছেদের ঔষধ প্রয়োগে ব্যক্তিগত বুদ্ধিপ্রয়োগ না করিতে পারিলে চিকিৎসকের "হাতযশ" হয় না সত্য কিন্তু ওকালতি করিতে হইলে যেমন আইন পড়া অপরিহার্য্য, চিকিৎসক হইতে হইলে চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ব করা অপরিহার্য্য তেমনি শিক্ষকতা করিতে হইলে শিক্ষকের ট্রেণিং আবশ্যক।

বিশেষতঃ অগ্রগামী দেশসমূহে যেভাবে শিক্ষাপ্রণালীর ধারা গতি পরিবর্তন করিতেছে, যেভাবে শিশুচিত্তের নিত্য নিত্য নব নব অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ের আবিষ্কার হইতেছে তাহাতে শিক্ষকগণের নিজ রাজ্যের সকল বিষয়ের সম্যক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। জাপান, রাশা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিক্ষা প্রণালীর কথা পরে আলোচনা করিব।

জগৎ যেভাবে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলে কোন ফললাভের আশা নাই বরং ক্রমে পিছনে পড়িবার আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। সমস্ত দেশকে আজ শিক্ষা সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে—সমস্যার সমাধানে প্রাণপণ যত্ন ও শ্রম করিতে হইবে। অন্যথা "পিছে পড়া থাকা মিছে মরে থাকা।"

শিক্ষা ও অর্থকরী বিদ্যা।

১৩৩৯ সাল ১৯শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল দোষারোপ করা হয় তন্মধ্যে শিক্ষিতকে অর্থাজ্জনক্ষম করিতে না পারা অন্যতম। এই দোষ দিয়াই অনেকে আবার বর্ত্তমান স্কুল কলেজ উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী। "চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া"র মত এই যে মনোবৃত্তি ইহার মূলে অনুসন্ধান করিতে হইলে বর্ত্তমান শিক্ষার ইতিহাসের দিকে তাকাইতে হয় ; সঙ্গে সঙ্গে জগতের বিভিন্ন জাতির শিক্ষা পদ্ধতির তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন সহস্রাধিক-ব্যাপী শিক্ষাপদ্ধতির মৃত্যুর ইতিহাসও আলোচ্য।

জগতের সর্ব্বত্রই লোক লেখাপড়া শিখিতেছে, স্কুল কলেজ গড়িয়া তুলিতেছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিতের সংখ্যার সহিত জগতের যে কোন সভ্য-দেশের শিক্ষিত সংখ্যার তুলনা করিলে লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হইতে হয়।

আমাদের স্কুল কলেজ অর্থকরীবিদ্যা দিতেছে না বলিয়া স্কুল কলেজের উপর যাঁহারা রাগ করেন তাঁহাদের জানা উচিত যে কোনও দেশের সাধারণ স্কুল কলেজে অর্থকরী বিদ্যা দেওয়া হয় না। স্কুল কলেজের উদ্দেশ্য, ছেলেদেরকে অর্থশালী করা নহে, ইহাদের মূল উদ্দেশ্য কৃষ্টি (Culture) সাধন। তবে প্রত্যেক দেশেই অর্থোপার্জ্জনক্ষম করাইবার মত শিক্ষার ব্যবস্হাও আছে। ভারতবর্ষে তাহা নাই বলিলেই হয়। অন্যান্য দেশে স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া ছেলেরা সংসারে প্রবেশ করে না। যে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিবে তদুপযোগী শিক্ষা (training) লাভ করে। সেখানে বিনা ট্রেণিংএ সামান্য চাষের কাজ বা দাসীবৃত্তিও দুর্লভ। উক্ত দেশসমূহের গভর্ণমেণ্ট ও প্রজা-সাধারণ যাহাতে বেকার বসিয়া না থাকে তদ্বিষয়ে সচেষ্ট। কৃষিশিল্পবাণিজ্যের লক্ষ পথ সেখানে উম্মুক্ত। পক্ষান্তরে আমাদের এ সকল বিষয়ে নিদারুণ দৈন্যই শিক্ষিত-বেকার সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছে। অর্থকরী বিদ্যা দিবার কোনও ব্যবস্হা নাই সেজন্য কৃষ্টিমূলক বিদ্যার উপর রাগ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করা একটা প্রাচীন সভ্যতা ও শিক্ষাধারার মূলোচ্ছেদ করা একই কথা।

আমরা প্রাচীন ভারতের যে ব্রহ্মণ্য শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যের গৌরব করিয়া থাকি। যাহা জগতের কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, সাধারণ গণিত, জ্যামিতি ও বীজগণিতাদি বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের ভিত্তি সেই শিক্ষায় শিক্ষিত—ব্রাহ্মণতনয়ের নিকট ভারতবর্ষ কোনও দিন এ দাবি করে নাই যে তুমি অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিলে তোমার সর্ব্ববিদ্যার ও বিদ্যানিকেতনের ধ্বংসসাধন করিব। প্রত্যুত এক-দিকে প্রাচীন ভারতবর্ষ যেমন কৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে অন্যদিকে জাতি শৃঙ্খলার স্তরে স্তরে বংশানুগ শিক্ষার ব্যবস্হা করিয়া অর্থকরী বিদ্যা প্রদানেরও বিশেষ ব্যবস্হা করিয়াছিল। আমরা আজ শেষোক্ত বিদ্যার বিলোপ করিয়া প্রথমোক্তর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া মূর্খতার পরিচয় দিতেছি। প্রাকৃত জড় শরীর ধারণ করিতে হইলে যেমন অর্থকরী বিদ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তেমনই জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য রাখিতে গেলে কৃষ্টিমূলক শিক্ষা অপরিত্যজ্য।

ম্যালেরিয়া ও বেণ্টলী সাহেবের ড্রেণেজ স্কীম।

১৩৪০ সাল ২০শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা

প্রায় ১৩/১৪ বৎসর পূর্বে সরকারী স্বাস্হ্য বিভাগ তদানীন্তন ডিরেক্টর বেণ্টলী সাহেবের নির্দেশ অনুসারে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া জঙ্গিপুর মিউনি-সিপ্যালিটির উভয় পারে অনেকগুলি ড্রেণ কাটিয়া নিকটস্হ পুকুর ডোবার সহিত সংযোগ করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে ভাগীরথী নদীর উক্ত ড্রেণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমস্ত পুকুর ডোবায় পড়িয়া যাইতে ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণু-বাহক মশককুলের ডিম্ব নষ্ট করে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপভাবে বৎসর বৎসর বন্যার জলে সমস্ত পুকুর নালা ভরিয়া গিয়া মশককুল নষ্ট হইলে স্হানীয় অধিবাসীগণ ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবে ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই ড্রেণ হইবার পরেই জঙ্গিপুর ক্রমশঃ ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। উপর্য্যুপরি ৭/৮ বৎসর এখানে ম্যালেরিয়া না হওয়ায় জনসাধারণের স্বাস্হ্যোন্নতি হইয়াছিল এবং লোকে ম্যালেরিয়া রোগের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল।

বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ সরকার বাহাদুরের অজস্র অর্থব্যয়ে নির্মিত ড্রেণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া দূরের কথা স্থানে স্থানে সহরের আবর্জনা ফেলিয়া উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং উহার নিকটেই দুর্গন্ধময় দূষিত ভ্যাটের জল ফেলিবার ব্যবস্থা করায় উক্ত দূষিত জল ড্রেণের জলের সহিত মিশিয়া নিকটস্থ ডোবায় পড়িয়া ডোবার জল বিষময় করিতেছে। দুই এক স্থানের শ্লুইজ গেটও সময়ে খুলিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা না করায় সেই স্থানের আবদ্ধ জলে ম্যালেরিয়ার আকর মশককুল বৃদ্ধি পাইতেছে। এ বছরে প্রায় বাড়ীতেই দুই একটী করিয়া ম্যালেরিয়া রোগী দেখা যাইতেছে। ড্রেণগুলি ক্রমশঃ আবর্জনা দিয়া বন্ধ করার ফলে শীঘ্রই জঙ্গিপুর পুনরায় ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর করাল গ্রাসে পতিত হইবে সন্দেহ নাই। আমরা এই বিষয়ে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের বর্তমান ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জঙ্গিপুর "এণ্টি-ম্যালেরিয়াল ড্রেণ।"

১৩৪০ সাল ২০শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা

আমরা গত ২২শে কার্তিকের 'জঙ্গিপুর সংবাদে' এই ড্রেণের স্থানে স্থানে মিউনিসিপালিটির আবর্জনাদি নিক্ষিপ্ত হইয়া ড্রেণের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা সম্বন্ধে আলোচনা করায় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বাহাদুর কোন লিখিত প্রতিবাদ করেন নাই বটে তবে আমরা ইহা লিখিয়া অন্যায় করিয়াছি বলিয়া আমাদিগকে মৌখিক বলেন যে "শুধু মিথ্যা লিখলে হবে না প্রমাণ ক'রে দিতে হবে।"

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম—বর্তমানে ঁইন্দ্রবাবুর বাটীর ও তৎসংলগ্ন পুষ্করিণীর উত্তর পার্শ্বস্থ রাস্তার পার্শ্বে ড্রেণের মাটি তুলিয়া আবর্জনাগুলি চাপা দেওয়া হইতেছে। ড্রেণের মুখ বন্ধ হওয়ায় যে জল আবদ্ধ অবস্থায় ছিল তাহা এখনও আছে। জনৈক ইষ্টক নির্মাতা উক্ত ড্রেণের বদ্ধ জল লইয়া ইট তৈয়ার করিতেছেন। আমরা আশা করি যে অল্পদিনের মধ্যেই সেই বদ্ধ জল নিঃশেষ হইবে। বোধ হয় এতদিন পরে সুযোগ্য চেয়ারম্যান বাহাদুর স্বয়ং ড্রেণের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া প্রতিকারে যত্নবান হইয়াছেন। ধন্যবাদ।

খড়খাড় নদীর সাঁকো।

১৩৪১ সাল ২০শ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলা-বোর্ড খড়খড়ি নদীর উপর একটী লৌহনির্মিত সাঁকো তৈয়ার করিয়াছেন। আজ ৩/৪ বৎসর হইতে প্রতিবার সাঁকো বন্দোবস্ত হইবার পূর্বে জনরব হয় যে এবারই শেষ, আসছে বারে আর নিলাম হইবে না। কিন্তু "আজ নগদ কাল ধার" এর মত ক্রমান্বয়ে এই বন্দোবস্ত হবে না শুনিয়া চারিদিকে হর্ষধ্বনি হইতেছিল। দীন দুঃখীদের

মুখে হাসি দেখা দিয়াছিল। তারপর জেলা-বোর্ডের ঘাটসমূহ নিলামের বিজ্ঞাপনে খড়খড়ি নদীর সাঁকোর নাম দেখিয়া স্থানীয় জনসাধারণ বিচলিত হইয়া পড়েন এবং কর্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এবারেও পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত সাঁকো বন্দোবস্ত হইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে এই সাঁকোর নীচের জল শুকাইয়া যাইত। তখন লোকজন নীচে দিয়া স্বচ্ছন্দে চলাচল করিতে পারিত। কয়েক বৎসর হইতে ইজারদারগণ খেয়ালের বশবর্তী হইয়া যাহাতে সাঁকোর নীচ দিয়া লোক চলাচল করিতে না পারে সেজন্য স্থানে স্থানে খাল কাটিয়া রাখিয়াছে। খালের জল সহজে শুকায় না কাজেই গ্রীষ্মকালেও লোকের নিকট জবরদস্তিভাবে পয়সা আদায় হইতেছে। সময় সময় খালের মধ্যে কাঁটাও থাকে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। এসব ব্যাপারে নজর না দিলে জেলা-বোর্ডের সুনাম অটুট রহিবে কি?

ম্যাকেঞ্জি পার্ক 'ফ্রি রিডিং রুম'।

১৩৪১ সাল ২১শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক কমিটীর চেষ্টায় ম্যাকেঞ্জি পার্ক ভবনের মধ্যে একটি 'ফ্রি রিডিং রুম' স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহাতে অনেকগুলি ভাল ভাল সময়োপযোগী মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা লওয়া হইতেছে। এরূপ ধরণের সর্বাঙ্গসুন্দর 'ফ্রি রিডিং রুম' মফস্বল সহরে বড় একটা দেখা যায় না। আমরা এই জনহিতকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি সহরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যত্নে ও চেষ্টায় ইহা কালে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

মা!

১৩৪১ সাল ২১শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা

দুঃখ-দৈন্য-দুর্গতিপূর্ণ বঙ্গে মা দুর্গতিনাশিনী আসছেন। এ বৎসর তো নূতন আসা নয়, বছর বছরই আসেন, এবারও আসছেন। মায়ের আসার আশায় সারা বঙ্গে সাড়া পড়ে। সারা বৎসরের কর্মক্লান্ত সন্তানগণ মায়ের আগমন উপলক্ষে অবকাশ পেয়ে কিছুদিনের জন্য শ্রান্ত জীবনে শান্তি পাবে ব'লে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে। যাহাদের কর্মস্থল প্রবাসে, তারা স্বগৃহে ফিরে এসে স্বজনের সঙ্গলাভে জননী ও জন্মভূমির ক্রোড়ে অনিবর্চনীয় আনন্দ উপভোগ করে। স্বামী—পত্নীর জন্য, পিতা—পুত্রকন্যার জন্য, ভ্রাতা—ভগিনীর জন্য, আত্মীয়—আত্মীয়ের জন্য নানারূপ খাদ্য পরিধেয় উপহার দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে। যাদের "দিন ভিক্ষা তনু রক্ষা" তারাও মায়ের আগমনের জন্য পূর্ব হ'তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগ্রহ ক'রে এই মহাপূজার তিন দিন একটু বিশেষভাবে ছেলেপিলের আহার পরিধেয়ের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগী হয়।

জহুরী, স্বর্ণকার, বস্ত্রব্যবসায়ী, মোদক, মুদী সকলেই দু পয়সা লভ্যের আশায় স্ব স্ব বিপণি সাজায়ে ক্রেতার চিত্তাকর্ষণ করে। মায়ের আগমন

বঙ্গের এমন শিল্পী, কৃষক ও ব্যবসায়ী নাই যারা দু পয়সা উপার্জন না করে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হ'তে আরম্ভ ক'রে মুচি ডোম প্রভৃতি সকলেই সমানভাবে মায়ের আগমন প্রতীক্ষা ক'রে বসে থাকে।

কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! সর্ব-জন-বাঞ্ছিত মায়ের এই আগমন আর তেমন আনন্দ দেয় না। সারা বৎসর রোগ, শোক, অজন্মা, নৈসর্গিক দুর্ঘটনা যেন সমস্ত দেশটাকে দ'লে, পিষে, এমন ক'রে দিয়েছে যে আনন্দ উপভোগ করার শক্তি, সামর্থ্য লোকের আর নাই।

আনন্দময়ীর আগমন যেন অনেকের পক্ষেই মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যাদায়ের মত বিপদে পরিণত হ'য়েছে। মায়ের পূজা উপলক্ষে যে ধনী বা গৃহস্থ, প্রার্থী বা অতিথি কখনও বিমুখ করেন নাই, তাঁকে আজ সাধারণের চক্ষের অন্তরালে নিভৃতে চুপটী ক'রে ব'সে মনের দুঃখ মনে মারতে হয়েছে। বাহির হ'তে পারেন না—কোন মুখে বলবেন দীন দরিদ্র আতুরকে—ওগো ফিরে যাও আমি কিছু দিতে পারবো না।

মেয়ের বাপ আজ মেয়ে জামাই এর তত্ত্ব করাকে মামলা মোকর্দমার মত বিপদ ব'লে মনে করছেন। আনন্দ আজ চারিদিকের হাহাকারে চাপা পড়ে গেছে।

এই নিরানন্দের কারণ কি—কে বলবে—মা আদ্যাশক্তির সে শক্তি নাই না আমাদের সে ভক্তি নাই—কে বলে দিবে এর কারণ।

মা শক্তি শিবসহ শ্মশানে বাস করতে ভালবাসেন বলে সমস্ত দেশটাকে ধীরে ধীরে শ্মশানে পরিণত করছেন কি?

তাই বুঝি ভক্ত গেয়েছিলেন—

"শ্মশান ভাল বাসিস বলে
শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী তারা
নাচবি বলে নিরবধি।"

আমরা ভাল মন্দ কিছু বুঝি না। যা' ভাল বুঝিস তাই কর। তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক মা!

৺বীরেন্দ্র শাসমল।

১৩৪১ সাল ২১শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা

কাঁদ, বঙ্গমাতা কাঁদ! কান্নাই তোমার নিত্যকর্ম! সুখের হাসি তোমার অদৃষ্টে নাই! তোমার এক সুসন্তান-বিয়োগের অশ্রু শুকাইতে না শুকাইতে আবার সুসন্তান বিয়োগ। তুমি যখন যার মুখ চেয়ে থাক, যার আশা ভরসা কর, তোমার মুক্তি-যজ্ঞে যে সন্তান হোতার পদ গ্রহণ করে, তুমি তাকেই হারাও! যে সন্তানের জন্মে মাতা পুত্রবতী বলিয়া পরিগণিতা হন, তেমন সন্তানের জননী হইয়া পুত্রের গরবে গরবিনী হইয়া থাকা বিধাতা তোমার অদৃষ্টে লিখেন নাই।

বাঙ্গালী! চির-দুঃখ-দৈন্য প্রপীড়িত বাঙ্গালী! তোমরা এই দুঃসময়ে নেতৃত্বে বরণ করিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে, তিনি তাঁহার কর্ম অসমাপ্ত রাখিয়া

মহাপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহার শূন্য আসনে বসাইলে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনকে। তিনিও কালের আহ্বানে অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। সুভাষচন্দ্র আজ দেশান্তরে। শরৎচন্দ্র বসু আজ অন্তরীণে আবদ্ধ। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব পদে বরণ করিলে সহসী, নির্ভীক, বীরেন্দ্র, তেজস্বী বীরেন্দ্র শাসমলকে তিনিও স্বেচ্ছায় তোমাদের আহ্বানে অগ্রসর হইতে না হইতে স্বর্গগত হইলেন। তিনি বর্তমান ভারতীয় পরিষদের নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইয়া জাতীয় দলের গৌরবধ্বজা উড্ডীয়মান করিতে না করিতেই তাঁহার শেষের আহ্বান আসিল।

তিনি সত্যই বীরেন্দ্র ছিলেন। কখনও কোন কর্মে ভীত বা পশ্চাৎপদ হন নাই, স্বার্থ বলিদান তাঁহার জন্মগত স্বভাব ছিল। যে কর্মে একবার 'হাঁ' বলিয়াছেন তাহাতে কেহ তাঁহাকে 'না' বলাইতে পারেন নাই। আজ তিনি তোমাদের নেতৃত্ব করিতে অবসর পাইলেন না। তাঁহার অভাব আজ তাঁহার স্বজনগণের মত সমগ্র বঙ্গবাসী মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। সমস্ত জাতি আজ অশ্রুজলে তাঁহার তর্পণ করিতেছে। তাঁহার স্বর্গলাভ কামনা বাহুল্যমাত্র। কারণ যিনি আজীবন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া জানিতেন স্বর্গ তো তাহার পক্ষে চিরদিনই লঘু বলিয়া পরিগণিত।

বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের শরৎচন্দ্র অস্তমিত।

১৩৪৪ সাল ২৪শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা

বিগত ১৬ই জানুয়ারী রবিবার বেলা দশ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক শরৎচন্দ্র চিরতরে অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। নশ্বর জগতে শরৎচন্দ্রের পুনরুদয় অসম্ভব হইলেও তিনি যে কিরণ সাহিত্যরসিকগণের সম্মুখে বিকীরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ঔজ্জ্বল্যে সাহিত্য-জগৎ চিরদিনই উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা। যাঁহারা মরিয়াও চির-অমরত্ব লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন শরৎচন্দ্র তাঁহাদেরই একজন। তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি নাই। সন্তান সন্ততি থাকিলেও সব সন্তান তো পিতার নাম রাখিতে পারে না। শরৎচন্দ্রের লেখনী প্রসূত যে সকল রত্ন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটীই তাঁহার যশ অক্ষুন্ন করিয়া রাখিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রজনীকান্ত সেন প্রমুখ স্বর্গীয় কবিগণের দেহত্যাগের পর বাঙ্গালীমাত্রকেই তাঁহাদের জীবদ্দশায় তাঁহাদের আদর আপ্যায়ন না করার জন্য লজ্জায় অধোবদন হইতে হইত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের জন্য আজ বাঙ্গলাকে তাঁহার বিরহব্যথা ব্যতীত তাঁহার অনাদরের জন্য মর্মাহত হইতে হয় নাই। কারণ শরৎচন্দ্রের গণমুগ্ধগণ তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষ করিয়া নানা স্থানে শরৎ সম্বর্দ্ধনার আয়োজন লইয়া তাঁহার প্রতিভার পূজার ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। শরৎ জয়ন্তী ও সাহিত্য-সেবীর পূজার এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান। ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা রেডিও (বেতার-প্রতিষ্ঠান) ষ্টেশনে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রতি বৎসর শরৎ-শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার

ব্যবস্থা হইয়াছে। মোট কথা তাঁহার জীবদ্দশাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে বাঙ্গালী কোনদিনই কুণ্ঠিত হয় নাই।

কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপই হইতেছিল। তাঁহার জন্মদিনে কোন স্থানে আহূত হইলেই তিনি বলিতেন আগামী বৎসর এদিন পাইব কিনা সন্দেহ। তাঁহার অসুখ মাঝে মাঝে হইত কিন্তু এবারে যেমন হইয়াছিল তাহাতে অনেকেই এই হৃদয় বিদারক বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। ডাক্তার বিধান রায় প্রমুখ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণও তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন। কলিকাতা নগরীতে যতদূর সুচিকিৎসা ও সেবাযত্ন হওয়া সম্ভব শরৎচন্দ্রের রোগশয্যায় তাহার ত্রুটি হয় নাই। কাল পূর্ণ হইলে কেহ থাকে না, শরৎচন্দ্রই বা সে নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন কেন?

এই প্রসঙ্গে তাঁহার এখানে আসার কথা স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিতেছে যখন শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল মহাশয় জঙ্গিপুর আদালতের মুন্সেফ. শরৎচন্দ্র তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন বলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য রঘুনাথগঞ্জ শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমাদের "জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়েও পদধূলি দিতে ভুলেন নাই। আমাদের ছাপাখানার ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—আমাকে বসাবে তো তামাক সাজো। ২।৩ কলিকা তামাক খাইয়া অনেকক্ষণ গল্প করার পর মুন্সেফ বাবুর বাড়ীর ডাক আসায় তখন হুঁকো ছাড়িলেন। তারপর যখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইত তখনই পরম আত্মীয়ের মত কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। বার্দ্ধক্য যাহাকে বলে শরৎচন্দ্রের সে বয়স হয় নাই। তাঁহার মৃত্যু অকাল মৃত্যুই বলিতে হইবে। আমরা তাঁহার বিয়োগ-ব্যথা স্বজন বিয়োগের মতই অনুভব করিতেছি। ভগবানের চরণে শরৎচন্দ্রের শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

শৃঙ্খলা না শৃঙ্খল।

১৩৪৭ সাল ২৭শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা

আধুনিক রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞানে পররাষ্ট্রনীতির প্রাধান্য বেশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পররাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি—অভিনব এই রহস্যময় কথাটা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সত্য কথা বলতে কি, কথাটার যথার্থ অর্থ আমি বুঝতে পারি না। আপন রাষ্ট্রের অর্থ, স্বার্থ, শাসন, বাণিজ্য প্রভৃতির সঙ্গে অন্যান্য প্রতিবাসী রাষ্ট্রের অর্থ বাণিজ্যাদির যোগ সম্বন্ধ সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত করবার এবং স্বাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সর্ববিধ অধিকার স্বীকার করা ও করানোর 'নীতি'কে পররাষ্ট্রনীতি বলবো, না আপন রাষ্ট্রের অস্ত্রবল ও লোকবলের সহায়তায় অন্যান্য রাষ্ট্রকে পদানত করবার এবং পদানত রাখবার কূটনীতি ও বীভৎস অভিলাষকে পররাষ্ট্রনীতি আখ্যা দেব? সম্প্রতি জার্মানী, ইতালী ও জাপানের রাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্রগুলিকে ছলে বলে-কৌশলে পদানত করবার চেষ্টায় যে ভাবে উদ্বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাতে বরং ইউরোপের আধুনিক পররাষ্ট্রনীতির যথার্থ অর্থোদ্ধারে অপারগ হয়ে উক্ত 'নীতি'টাকে হয়তো একটা 'অনীতি'র নামান্তর বলে যদি সন্দেহ করতে থাকি, তাহলে বিশ্বের বিজ্ঞ রাষ্ট্রবিদ্‌গণ কি আমাকে, মানে আমার স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করবে না?

না করবে না। কেননা আমার সন্দেহ অজ্ঞের সন্দেহ। ইতালী, জার্মানী এবং জাপান অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহকে নীতিই-ই অনীতি নয়; কেননা তার উদ্দেশ্য অতীব মহান; এবং মহান এই উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব মূর্খ পৃথিবীবাসী কিছুতে উপলব্ধি করতে পারছে না বলে, সম্প্রতি হিটলারজী ঘোষণা করেও দিয়েছেন। ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তাঁদের পররাষ্ট্রনীতির প্রধানতম 'প্রোগ্রাম' হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র 'নূতন শৃঙ্খলা'—নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, অব্যাহত স্বাধীনতা আনয়ন করা। তাহলেই বেশ সহজে বুঝে ফেলা গেল যে পৃথিবীকে শান্তিময়ী, মুক্তিময়ী এবং প্রগতিশীলা করবার মহান আদর্শে পরিচালিত হয়েই জার্মানী, ইতালী ইয়োরোপে এবং জাপান এসিয়ায় তাদের পররাষ্ট্রনীতির পরিচালনে যত্নবান হয়েছে মাত্র। কথাটাকে বেশ সরলভাবে বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, আজকেকার পৃথিবীরাষ্ট্রে সুখ নাই, শান্তি নাই, স্বাধীনতা নাই, প্রগতি নাই এবং সেই জন্যই নাকি তাঁদের আকস্মিক অভ্যুদয়। কেননা, তাঁদের মতে, অন্যান্য সকলে পৃথিবীটাকে উৎসন্নে দেবার চেষ্টা করছে—আর দুদিন চুপ করে থাকলে তারা পৃথিবীটাকে শ্মশান করে ছাড়বে। তাই তারা তিন বন্ধু—জাপান-জার্মানী—ইটালী—একদা একত্র হয়ে ব্যথিত-হৃদয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বললে—"এসো পৃথিবীকে বাঁচাই। বিশৃঙ্খল ও বন্দিনী পৃথিবীটার কাণে, এসো নূতন শৃঙ্খলার এবং অপরূপ মুক্তির মন্ত্র দিই।"

মন্ত্র বেরুলো। মন্ত্র বেরুলো ঋষিত্রয়ের আত্মা থেকে—নাজী মন্ত্র, ফ্যাসিস্ট-মন্ত্র, মনুরো-মন্ত্র। সেই মন্ত্রের প্রধানতম নির্দেশ হলো—পরকে আপন করে আনা। এসিয়ার ঋষি তাই ছুটলেন, 'মহাচীন'কে আপন করে নিতে—আর ইয়োরোপের ঋষিদ্বয়ের একজন চললেন আবিসিনিয়ার অৰ্দ্ধসভ্য বর্বরদের —চৈতন্যপ্রভুর 'জগাই-মাধাই'কে আলিঙ্গন দেবার মতই, আলিঙ্গন দানে সভ্য করে নিতে—তার অন্যজন ছুটলেন 'ম্যানকাইণ্ড'এর 'সেভিয়ারের মত সমগ্র ইয়োরোপকেই আপন আত্মার অভ্যন্তরে স্থান দিতে। নূতন শৃঙ্খলা আসতে তাই বাধ্য,—নূতন নিয়ম, নূতন শাস্তি, নূতন রূপ, নূতনতর আইন প্রবর্তিত হতে তাই বাধ্য।

পৃথিবী অপরূপ পরিবর্তনের পথে এলো চক্ষের নিমেষে। পুরাতন মরে যেতে লাগলো নূতনের স্পর্শাঘাতে। মরে গেল পুরাতন আবিসিনিয়া—সম্রাট হাইলী সিলাসী ফকির হলো, ফকির দরবেশদের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো, এপাড়া-সেপাড়া, এদেশ-সেদেশ; তার প্রজাগুলো ধারণ করলো ফ্যাসিস্ট পরিচ্ছদ; যারা ধারণ করতে চাইলো না, তারা নূতন হতে চায় না বলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল, অসভ্য এবং গোঁড়া বলে নিন্দিত হয়ে নির্বাসিত হলো জনহীন কান্তারে, অন্ধকার গুহায় আবাসহীন আকাশতলে। মরে যেতে বসলো প্রাচীন চীন,—নূতন শৃঙ্খলা গ্রহণের আইন অমান্য করতে চাইলো বলে, খেলো গোলা আর গুলি, পেলো উড়ো জাহাজের হুড়ো, আর বোমাবৃষ্টির চোখ-রাঙানি। পুরাতন চেক, পুরাতন বেলজিয়াম, পুরাতন হল্যাণ্ড-পোল্যাণ্ড-ফ্রান্স মরে গেল, একেবারে মরে গেল; তার পরিবর্তে জাগলো নূতন রাষ্ট্র,—একরাষ্ট্র—,চেকের 'চেকত্ব' বেলজিয়ামের 'বেলজিয়ামত্ব' হলাণ্ড-পোলাণ্ড-ফ্রান্স প্রভৃতির স্বকীয় সমস্ত আত্মস্বত্ব একীকৃত হয়ে, জাগ্রত হ'লো নূতন এক নাজী-রাষ্ট্র, যার শৃঙ্খলা শুধু নূতন নয়, অভিনবও বটে। কেননা পুরাতন বলতো

'খেয়ে মানুষ বাঁচে' ; নূতন বললে যে, সে দেখিয়ে দেবে, না খেয়েও মানুষ বাঁচতে পারে। কথাটা সত্যি, মিথ্যা নয়। দেখা গেল—নূতন শৃঙ্খলা শৃঙ্খলে আবদ্ধ (ঐক্যবদ্ধ ?) নাজীরাষ্ট্র মোষের মত খাটতে লাগলো, খেতে লাগলো হিটলারের 'গোত্তা'—কিন্তু অন্নাভাবে, অর্থাভাবে, মুক্ত বাতাসের অভাবে তারা একেবারে যে মলো তা নয়,—তারা বেঁচেই রইলো। হিটলারের 'গোত্তা' খেয়ে কি বাঁচা যায় ? হিটলারীয় শৃঙ্খলাশুদ্ধ নাজীরাষ্ট্রগুলির মানুষগুলোও ধুকতে ধুকতেও বেঁচে আছে দেখে মনে হয় হিটলারের 'গোত্তায়' সম্ভবতঃ না খেয়েও বাঁচবার অলৌকিক কোন 'মেডিসিন' বা 'ভিটামিন' আছে।

কিন্তু থামি। রসিকতার খরস্রোতে ভেসে গিয়ে ফল নাই। যেখানে জ্বালা, যেখানে অবসান,—যেখানে—অর্থহীন, অন্নহীন, শান্তিহীন, মর্মদাহন,—যেখানে মুক্তিবিহীন নিরানন্দ অন্ধকারে সরীসৃপের মতো জীবনযাপনের দুর্বিসহ যন্ত্রণা,—সেখানে রসিকতার স্থান নাই, স্থান নাই হাস্য-পরিহাসের। শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতি এনে দেবার প্রচার-কার্য্যের অন্তরালে যারা দেশের ও বিদেশের সর্ববিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হরণ করছে নির্মমের মত, তাদের কথার ও কার্য্যসমূহের সমালোচনা প্রসঙ্গে রসরচনা সমীচীন হয়। ভারতবর্ষের মানুষ নিজের দুঃখেই শুধু অশ্রু ফেলে না, যারা নিপীড়িত, যারা শৃঙ্খলিত, যারা অতিবেদনা ও দারিদ্র্যদুঃখে নিত্য বিপর্য্যস্ত, ভারতবর্ষ তাদের দুখেও অশ্রু ফেলতে জানে। স্বৈরতন্ত্রী জাপানের নিত্য নিপীড়নে চীনের যে ক্ষতি হচ্ছে প্রতিদিন, ভারতবর্ষ তাতে ব্যথিত না হয়ে পারে না, জাপানের বিরুদ্ধে বীর-বিক্রমে প্রচারকার্য্য পরিচালন করতেও পশ্চাপদ হয় না। [জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য।]

স্বেচ্ছাচারী ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ, তার বহুদিনের সুরক্ষিত স্বাধীনতা অপহরণ, তার অর্থ, স্বার্থ, বাণিজ্য-শক্তির নিষ্পেষণ প্রভৃতি হেয়তম হীন কাজগুলোকে সুবিধাবাদী কয়েকটা রাষ্ট্র সমর্থন করতে পারে, কিন্তু আমরা, ভারতীয়, কিছুতে সমর্থন করি না। অর্থ ও প্রভুত্বলোলুপ হিটলার আর তার নাজী-দস্যুদল চেক, পোলাণ্ড প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সর্ববিধ কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা যে কেড়ে নিল, তাদের করে নিল আপনাদের হাতের খেলার পুতুল,—সে সব কি নূতন শৃঙ্খলা ? যারা এগুলোর মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার সম্ভাবনা দেখে ও দেখাতে চায়, তারা অজ্ঞ, না ভণ্ড ?

আসল কথা অন্যায় যারা করে, তারা বেশ ভালভাবেই জানে—পৃথিবীর মানুষ অন্যায়কে সমর্থন করবে না। তাই তারা কথার পর কথা সাজিয়ে, যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে বহু ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, তাদের সমস্ত কাজই ন্যায়সঙ্গত। তারা মনে ভাবে পৃথিবীর মানুষগুলো সব নির্বোধ।—তারা কাজ দেখবে না কথাই শুধু শুনবে। তারা জানতে চাইবে না, পৃথিবীর মানুষ আজ কেন এত কষ্ট পায়। জানতে চাইবে না—যারা পৃথিবীতে 'নূতন শৃঙ্খলা' আনতে চায়, তাদের নিজের দেশের মানুষগুলোই অসীম দারিদ্র্যে কেন বিপর্য্যস্ত ? কেন ইতালীর পথে-ঘাটে আজ ভিখারী ভিখারিণীর ভিড় ? কেন জার্মাণীর লোকগুলো আজ ক্রীতদাসের দুর্বহ জীবন যাপনে মুমূর্ষু ? কেন জাপানের মানুষগুলো আজ পশুর মত প্রতিবাসীদের গাত্রে আঁচড়াতে কামড়াতে হচ্ছে অভ্যস্ত ?

নিজেদের ঘর সামলাতে যারা এনে দিতে পারে না শান্তি, তারা আন-

ঘরে এনে দেবে শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নতি আর প্রগতি! হাসি পায়। হাসির সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত হয়ে ওঠে চিত্ত। যারা স্বাধীনচিন্তাশীল মনীষীদের দেয় না সম্মান, রক্ষা করে না ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানুষকে করে তোলে প্রাণহীন কলের পশু, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রভুত্ব সংরক্ষণই যাদের পররাষ্ট্রনীতি,—যারা প্রতিবাসী রাষ্ট্রের লুণ্ঠন করে যায় অর্থ, নারী, গৃহ, গৃহের আসবাব—পদতলে পিষ্ট করে যায় সমগ্র জাতীয় স্বার্থ ও শান্তি—তারা আনবে নূতন শৃঙ্খলা, নূতন-স্বাধীনতা!

স্বেচ্ছাচারী হিটলার যা করছে, স্বৈরতন্ত্রী মুসোলিনী, যা করছে কুপরামর্শশ্রয়ী মিকাডো—তার সমর্থনে ভারতবর্ষ একটা কথাও বলবে না। যারা সত্যসত্যই পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি এনে দিতে চাইবে, এনে দিতে চাইবে গণতান্ত্রিক সত্যকার স্বাধীনতা, যাদের পররাষ্ট্রনীতি লুণ্ঠননীতির নামান্তর নয়, তারাই শুধু গর্ব করতে পারে পৃথিবীতে নূতন শৃঙ্খলা আনতে পারে বলে। ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে—সত্যেরই শুধু জয় হয়। অসত্য, তার জয় হবে না। মিথ্যা ধাপ্পাবাজীর দ্বারা বাজীমাত করতে আসছে, তারা যেই হোক, ঈশ্বর তাদের সহায়ক হতে পারেন না।

মোটর-শিল্পের সুবিধা।

১৩৪৮ সাল ২৭শ বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা

ভারতে যে মোটর-শিল্প প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে—ইহা বিদেশী মোটর-কোম্পানীও স্বীকার করিয়াছেন। শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ মোটর কারখানার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা আমেরিকার ফোর্ড মোটর কোম্পানী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। একখানি মোটর গাড়ীর ওজন সাধারণতঃ ৩০/৩৫ মণ। একখানি মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিতে ৩০ মণ আন্দাজ লোহা ও ইস্পাতের প্রয়োজন হয়। ভারতে লোহার অভাব নাই; পরন্তু ভারতেই এখন উৎকৃষ্ট রকমের ইস্পাত তৈয়ারি হইতেছে। তাহা ছাড়া, শ্রমিক ও শিল্পিরও অভাব ভারতে নাই। উচ্চ শ্রেণীর সুদক্ষ শিল্পি এবং কৃতকর্মা অসংখ্য শ্রমিক এদেশে কাজের মত কাজ পাইলে তাহারা তাহাদের গুণের পরিচয় দিতে পারে। মূলধনের যে অভাব হইবে না, তাহা শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাহার উপর ভরসা করিয়াই এত বড় কাজে হাত দিয়েছেন। প্রথমে কোম্পানীর মূলধন দেড় কোটি টাকা ছিল; সম্প্রতি তাহা বাড়াইয়া সওয়া দুই কোটি করা হইয়াছে। কিছুরই যখন অভাব নাই, তখন ভারতে কোম্পানী গঠন করিয়া মোটর গাড়ীর কারখানা খুলিলে, তাহা চলিবে না কেন, —ইহার কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৈদেশিক প্রতিযোগিতার কথা? তাহা চিরকাল থাকিবে এবং সকল দেশেই তাহার আশংকা সমান। প্রতিযোগিতার দায়িত্ব মাথায় না লইয়া কোন দেশেই কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভারতে যখন টাটা কোম্পানীর লোহার ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও স্বার্থ-সংস্রবযুক্ত বিদেশী কোম্পানীর দালালেরা এইরূপ ভয় দেখাইতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু টাটা কোম্পানীর সাফল্য এখন এই সব স্বার্থপর প্রচারকের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। টাটার মালিকেরা সাহসে ভর করিয়া অনেক বাধা বিঘ্ন ঠেলিতে ঠেলিতে বৎসরের পর বৎসর ক্রমেই

উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপে উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন। শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ টাটার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইবে। প্রতি বৎসর ভারতে বহু লক্ষ টাকার বিদেশী মোটর গাড়ী বিক্রয় হয়। এই টাকা বিদেশে না গিয়া এদেশে থাকিলে, সমগ্র দেশবাসী যে উপকৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ আছে কি?

রেশন ও রসনা।

১৩৫০ সাল ৩০শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা

চিকণ মুখের সম্মুখে রেশনের চাল কিভাবে আদর পাচ্ছে সেই বিষয়ই আজ আমাদের বক্তব্য। এর আগে যখন কলকাতা যেতাম তখন অবস্হাপন্ন গৃহস্হের ঘরেই আতিথ্য গ্রহণ করতাম। রেশন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর গত সপ্তাহে কলকাতা গিয়েছিলাম। জানিনা যার বাড়ীতে উঠবো সে বেচারী নিজে উপোস করে বা কম খেয়ে আমা হেন অতিথির সেবা করবে কি না। এই সব ভেবে চাল, ডাল, মুড়ি, চিড়ে সব বেঁধে নিয়ে এক গৃহস্হের বাড়ীতে উঠলাম। গৃহস্হ তো হেসেই অস্হির। বল্লেন—থাকবেন তো ৪ ৫ দিন তার জন্যে এসব বেঁধে আনা কেন?

গত সপ্তাহের পূর্ব সপ্তাহে যে চাল তাঁরা রেশনে পেয়েছিলেন তা অতি সুন্দর। আমরা যাওয়ার পর যে চাল পেলেন তা তাঁদের চাকররা ইতিপূর্বে যে চালের ভাত খেতো তার চেয়েও নিকৃষ্ট। চাল দেখে কর্তা গিন্নীর চক্ষু চড়ক গাছ। বাপরে—এই চালের ভাত খাব কি করে! তাঁদেব অবস্থা দেখে বলে উঠলাম চাকররা এতদিন এই চালের ভাত খেতো কি ক'রে তা ভেবেছিলেন কি? তেমনি রেশন প্রথার প্রবর্তকগণও আপনারা কেমন ক'রে এই চালের ভাত খাবেন তা ভেবে দেখা আবশ্যক বোধ করেন না। ঠাকুর আপনাদের দাদখানি বা বালাম চালের ভাত রেঁধে দিত কিন্তু নিজে খেতো সেই মুগুরে বালাম চালের ভাত। আজ সব মাথাই এক ক্ষুরে মুড়োবার দিন এসেছে। সেই পুরাণো গানটা মনে পড়ছে আজ—

"হবে নামতে ধূলোর তলে
হাটে মাঠে পথে ঘাটে সবাই যেথা চলে।"

আজ বহু কর্তাকেই দেখছি সাহেব সেজে মোটা বস্তার ঝোলা হাতে মোটা চাল নিয়ে রসনায় প্রায়শ্চিত্ত করছেন। রসনার কাজ দুটী (১) কথাবলা (২) খাদ্য আস্বাদ আজ বচনে ও ভোজনে উভয় কর্মই রসনার সংযম বাধ্য হ'য়ে করতে হচ্ছে।

মা গঙ্গার গঙ্গা প্রাপ্তি।

১৩৫০ সাল ৩০শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা

আজ ফাল্গুন মাস। এখনও চৈত্র বৈশাখের গ্রীষ্ম বাকী আছে। এরই মধ্যে জঙ্গিপুরে ভাগীরথীর দশা যা হয়েছে তাতে গঙ্গায় অবগাহন তো হয়ই

না, বরং গঙ্গায় গড়াগড়ি দেওয়া ছাড়া স্নানার্থীগণের গত্যন্তর নাই। পণ্ডিতরা বলেছেন—

তত্র মিত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ং।
ঋণদাতা চ বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজলা নদী॥

অর্থাৎ যে স্থানে ঋণদাতা, বৈদ্য, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সজলা নদী নাই সে স্থান বাসের অযোগ্য।

আমাদের এতদঞ্চলে ঋণদাতা কুসীদ্ ব্যবসায়ী অনেকে ছিলেন ও আছেন। ঋণসালিশী বোর্ডের আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে গা ঢাকা দিয়েছেন। বৈদ্য অর্থাৎ আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক বেশী না থাকলেও না থাকা নয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ খুব বিরল হলেও খুঁজলে পুরোহিত একেবারে অমিল নয়। উল্লিখিত তিনটীর অল্পতা বা অভাবে নিত্য অসুবিধা হয় না। কিন্তু সজলা নদীর পরিবর্তে স্রোতহীনা স্রোতস্বতী ভাল চেয়ে মন্দই করে বেশী। ভাগীরথী গ্রীষ্মে স্বল্প তোয়া হ'লেও গ্রীষ্মে স্বচ্ছসলিলা, খরস্রোতা মূর্তিতে প্রবাহিত হতো। আর আজ জনশূন্যা ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ গ্রামগুলি নানারূপ ব্যাধিতে জনশূন্য হ'তে বসেছে। অপেয় জল পান স্বাস্থ্যের পক্ষে কত অনিষ্টকর। আজ গঙ্গাতীরে বাস করে কূপোদক পান ক'রে পিপাসা নিবারণ করতে হচ্ছে।

সরস কবিতা
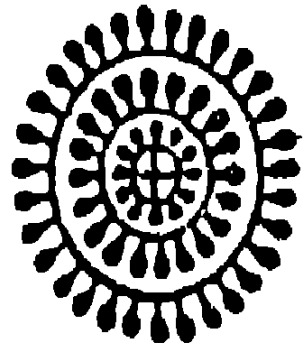
গুড়গুড়খ ঘোড়ের গান।

১৩২২ সাল ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

তামাক সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশক।
বিপদে সম্পদে, বিবাদে বিসম্বাদে
আমোদে আহ্লাদে অতি আবশ্যক।
কিবা সুবাসিত তামাক বাজারে বিকায়,
বাঁধা দর তার, সওয়া সের টাকায়,
অন্ধকারে খেলেও গন্ধ না লুকায়,
যে যায় সে পায় বড় সুখ॥
বাড়ীতে দশজন একত্রে বসিলে
কিম্বা কোন কার্য্যে কুটুম্ব আসিলে,
অগ্রে তামাক দিয়ে নাহি সম্ভাষিলে,
তাকে দেয় লোকে অধিক ধিক॥
পিতৃশ্রাদ্ধ আদি কন্যাসম্প্রদান,
অনাহার করা শাস্ত্রের বিধান,
সে দিনেও লোকে করে ধূমপান,
খায় হিন্দু মুসলমান একাধারে দেখ॥
কলিকালে দেখ তামাকের সম্মান,
যবনের উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণেরাও খান,
শুনে হুঁকোর টান, চমকে উঠে প্রাণ,
যে না খায় সে মহাপাতক॥
ও রসে বঞ্চিত দীন জঙ্গলী কান্ত,
জনমে জানেনা তামাকের কি গুণত,
যে দিনে এ দীনে হইবে প্রাণান্ত,
বাঁধিবে কৃতান্ত সেই ভাবনা অধিক॥

ভাষার নমুনা।

ইং ২১শে জুলাই, ১৯১৫,
১৩২২ সাল ৫ই শ্রাবণ ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা

ভাষাবিৎ আমরা ক'ভাই
'বাঙলা' ভাষাটার গলাটী ধরিয়া
করিতে এসেছি জবাই।
আমাদের ভাষার বাঁধুনি যত
তোমরা বুঝিবে কত,
কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়ার খিচুড়ি
যেন কোপ্তা কাবাব মত।
আমরা যা কিছু "লিখা" লিখি,
আর যা কিছু আমরা শিখি,

হইতে তোমরা পণ্ডিত হস্তী—
পাইলে তাহার সিকি।
আর যেখানে একটু সন্দ,
এই ধরনা যেমন বন্ধ,
সেখানে "বন্দ" বন্ধ দুই চালাই
হওনা তোমার ধন্ধ।
"কৃত্তি" মোদের কত
সেটা যায় না বোঝান অত,
কীর্ত্তি মোদের "কৃত্তিনাশিনী"
ঢেউয়ে তুলে ধরে শত।
পানিনি পদাঙ্ক লক্ষ্যে
গোটা কত হস্তী মূর্খে
করিছে ভীষণ পদাঘাত নিত্য
মৌলিকতার বক্ষে।
তাই হয়েছি আগুয়ান
রাখিতে ভাষার মান
নত্ব, সত্ব বিধানের মাথে
করেছি পাদুকা দান।
আমরা দেশের দুঃখে কাঁদি,
লোকের পায়ে ধরে কত সাধি,
রচনায় মোরা সিদ্ধহস্ত
আর দুনিয়ায় নাই বাদী।
আমার বুদ্ধি যা তা লম্বা
ডাক ছাড়ি আমি হাম্বা
তার শৃঙ্গবিহীন এই যা দুঃখ
আর বিদ্যা অষ্টরম্ভা।

ইতি—ভাষাবিৎ কবিজে:

(ডি এল রায়ের 'আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক'ভাই' সুরে)

শুক-সারীর দ্বন্দ্ব।

ইং ৪ঠা আগষ্ট ১৯১৫,
১৩২২ সাল ১৯শে শ্রাবণ ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা

সকল গুণে গুণনিধি কৃষ্ণ আমার।
কৃষ্ণ আমার, প্রভু আমার, প্রভু আমার ধর্ম্মাবতার॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ বুনিয়াদী ধনী।
সারী বলে ছেঁড়া পীত-ধরা পরাও জানি।
ব্রজের শালিস মানি॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ করে বাবুগিরি।
সারী বলে পরের পেলে আমিও তো পারি।
করে ডাকাত চুরি॥
শুক বলে তাইতে বেঁধেছিলেন যশোমতী।
সারী বলে বৈকুণ্ঠনাথ জানেন সে দুর্গতি।
বোধ হয় আছে স্মৃতি॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ সকল ধনে ধনী।
সারী বলে লিখিতং এ নাম লেখা ঘুর্চোনি।
এখনও আছে ঋণী॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কিবা বাঁকা ঢং।
সারী বলে সাঁওতালদের মত গায়ের রং।
আলকাতরা মাখান সং॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কিবা মোহন ছাঁদ।
সারী বলে আহা! যেন অমাবস্যার চাঁদ।
কেন ঘটাও প্রমাদ?
শুক বলে আমার কৃষ্ণে সকল লোকে মানে।
সারী বলে বিদ্যা বুদ্ধি সকল লোকেই জানে।
প্রকাশ গোচারণে॥
শুক বলে পড়্‌তেন কৃষ্ণ ইংলিশ, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ।
সারী বলে রোজই হ'ত ষ্ট্যাণ্ড আপ অন্‌ দি বেঞ্চ।
কানে ঘুরিত রেঞ্চ॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের প্রাইজ পেল।
সারী বলে তখন বুঝি লাষ্ট প্রাইজটা ছিল।
নইলে কোথা পেল॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণে প্রভু কন সকলে।
সারী বলে বেদেনীরাও হীরামণি বলে।
নাচায় তালে তালে॥
শুক বলে দেশের লোকে কৃষ্ণ অনুরাগী।
সারী বলে খোসামোদী কাজ বাগাবার লাগি।
ও সব সুখের ভাগী॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ বাজান মোহন বাঁশী।
সারী বলে ফুকবে শিঙ্গা তোমার কাল শশী।
পড়ে থাকবে বাঁশী॥
শুক বলে হবেন কৃষ্ণ গৌর অবতার।
সারী বলে দেখ্‌বে আবার তোর কৌপিনী সার।
কতদিন বাকী আর?
শুক সারী দুজনাতে করুক এখন দ্বন্দ্ব।
দীনের কষ্ট ঘুচাও হে শ্যাম, রাধা গোবিন্দ!
মোদের কপাল মন্দ॥

কেনচিৎ ভক্তেন রচিত।

স্বায়ত্ত শাসন।

ইং ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫,
১৩২২ সাল ২২শে ভাদ্র ২য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

হর-পার্ব্বতী সংবাদ।

হর প্রতি প্রিয়, ভাবে বশ হৈমবতী।
স্বায়ত্ত শাসন ফল কহে পশুপতি॥
কোন্ গ্রহ হৈল রাজা কেবা মন্ত্রী তার।
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি দিগম্বর॥
ভব কন ভবানীকে মধুর বচনে।
ভারী গোলযোগ এবে স্বায়ত্ত শাসনে॥
রাজশক্তি প্রজাদের মঙ্গল কারণ।
স্বায়ত্ত শাসন প্রথা করে প্রচলন॥
রাজার প্রদত্ত এই স্বায়ত্ত শাসনে।
প্রজাগণ অধিকারী সভ্য নির্ব্বাচনে॥
স্বার্থপর সয়তানের সয়তানিতে ভুলে,
ডুবিছে নিরীহ প্রজা স্বখাদ সলিলে॥
মিথ্যা প্রলোভন কিংবা পীড়নে পীড়িয়া।
অযোগ্যরে যোগ্য বলে বাঝিতে নারিয়া॥
লভ্য আগে অনেকেই সভ্য হতে চায়।
দেশের দশের হিতে ক'জন দাঁড়ায়?
রোগীর শুশ্রূষা আর মৃতের সৎকারে।
তাহলে কি লোকাভাব হইত সংসারে?
কেহ ভাবে সভ্য হলে মান বৃদ্ধি হবে।
কেহ ভাবে দেশে মোর প্রভুত্ব বাড়িবে॥
কেহ সভ্য-পদপ্রার্থী অর্থ পাব বলি।
কেহ ভাবে করে নেব ফাঁপর দালালী॥
লোক হিতে স্বার্থত্যাগ করেন কেবল।
হেন মহাজন কিন্তু অতীব বিরল॥
যদিও বা আছে দেশে দুই একজন।
হয়ত সহায়হীন না হয় নির্ধন॥
জমিদার মহাজন পাশ করা লোক।
এ বিভাগে সভ্য হয় অধিক সংখ্যক॥
জমিদার আর মহাজন সভ্য হয়।
প্রজা ও ঘাতকগণে দেখাইয়া ভয়॥
নিজে সভ্য হইয়াও মিটেনাক আশ।
দলপুষ্টি করিবারে করেন প্রয়াস॥
আপনার অনুগত সভ্য নির্ব্বাচন।
করিবারে করে পুনঃ কাঙ্গাল পীড়ন॥

স্বার্থত্যাগী মহাত্মারা ভোট নাহি পাবে।
রাজার কোটাল হলে সেও সভ্য হবে ॥
স্বচক্ষে দেখেছি যাহা শুন আমি কহি।
এক স্থানে সভ্য এক ধনীর সিপাহী ॥
পাশ করা লোক দেশে আছে দুপ্রকার।
তাহাদের কথা আমি বলিব এবার ॥
একদল তেজী, নাহি জানে খোসামোদী।
সভ্য হতে পারে নাই তারা অদ্যাবধি ॥
অন্যদল পায়ে ধরা, বিষম বেহায়া।
ভোট পাব বলে ধরে বড় লোক পায়া ॥
লেখাপড়া শিখিয়াছে তবু এ প্রকৃতি।
এদের স্কন্ধেতে আছে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
বিদ্যায় ভূষিত কিন্তু চিত্ত ভয়ঙ্কর।
মণিতে ভূষিত যথা দুষ্ট বিষধর ॥
মূর্খ যারা সভ্য হয় সুপারিশ জোরে।
গণ্ডায় গোজান আণ্ডা সভার ভিতরে ॥
এদের দুর্দ্দশা আমি বলি গোপ দেবি।
(যেন) আসে বসে চলে যায় বায়স্কোপ ছবি ॥
তিনটে বচন [illegible]
তবুও বাসনা আছে মেম্বর হইতে।
রাজশক্তি করে কিছু সভ্য নির্ব্বাচন।
তাই আজও বেঁচে আছে স্বায়ত্ত শাসন ॥
নির্ব্বাচিত সভ্যগণ হয় দুইদল।
সভাপতি নির্ব্বাচনে কলহ কেবল ॥
আজিও হয়নি দেবি! সভ্য নির্ব্বাচিত।
সে কারণে এ সংবাদ আছে অনিশ্চিত ॥
মোটামোটী অনুমান করে নিতে পার।
যার দলে সভ্য বেশী তার পোয়া বার ॥
সভ্য হন এ প্রভুরা হাতে পায়ে ধরি।
ভক্তে বসে করে শেষে দন্ত কিড়িমিড়ি ॥
চিরদিন এ প্রভুত্ব থাকে নাক ঠিক।
বর্ষত্রয় পরে হন পুনশ্চ মৌখিক ॥
যেমন অদৃষ্ট তেমনি ফল ভোগ করে।
আবার মাগিয়া ভোট ফিরে দ্বারে দ্বারে ॥
আর এক কথা দেবি! কর অবধান।
পর জন্মে ইহাদের দণ্ডের বিধান ॥
গরীবে পীড়ন করি সভ্য যারা হয়।
মরিয়া ড্রেনের পোকা হইবে নিশ্চয় ॥

ত্রেতার বীর।

ইং ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫,
১৩২২ সাল ২২শে ভাদ্র ২য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

হুপ্ হুপ্ হুপ্
গোল করিস না চুপ্,
(দেখ) যেমন আমার বল বিক্রম
তেমনি আমার রূপ।
পরের গাছের আম কিম্বা,
পরের বাড়ীর পাকা রম্ভা,
ছিঁড়ে নিয়ে দিই লম্বা,
খাই কুপ্ কুপ্।
গোল করিস্ না চুপ্॥

আমি ত্রেতা যুগের বীর,
বুদ্ধি ভারী ধীর,
এচাল হতে ওচাল যাই,
থাকিনাক স্থির।
অশোক বন হ'তে,
আম আনি ভারতে,
এমনি তোরা নিমক হারাম
দিসনাক খেতে,
খেতে গেলে করিস তাড়া
নিয়ে ধনুক তীর।
আমি ত্রেতা যুগের বীর।
এখন নাই আমার সে দিন,
ক্রমে তনু হচ্ছে ক্ষীণ
তার উপরে ছোঁড়াগুলো
দেখ্‌লে বাজায় টিন।
কাজেই আমার নাচতে
হয় ধাতিন্ তিন্ তিন্॥
সবাই কাঁপে আমার তেজে,
বোধ হয় মালুম পাচ্ছ লেজে,
আমি সাগর বেঁধেছি,
রাবণ বধেছি,
সোনার লঙ্কা আগুন দিয়ে
দগ্ধ করেছি.
হাতে মুখে পায়ে আমার
আছে তাহার চিন্।
এখন নাই আমার সে দিন॥

কুত্তায় কামড় মারে,
তাইতে লেজ নিয়েছি ঘাড়ে,
এখন কুকুর দেখে ভয় করিনে
আর কি খেতে পারে ?
আমার পেছন ছোটে যদি
মারব্ এক আছাড়ে।
আমি লেজ নিয়েছি ঘাড়ে।

কুত্তা মশায়।
ভেক ভেক ভেউ,
ভয় করনা কেউ,
লেজে কসে মারব কামড়
বইবে রুধির ঢেউ।

আমি মুনিবের বিশ্বস্ত,
সদাই থাকি ব্যস্ত,
কাম করিনে, কাজ করিনে
তবুও নাই স্বস্ত।

বাহাদুরী মোর
সন্ধ্যা থেকে ভোর
মুনিব বাড়ী পাহারা দিই
আসবে বলে চোর।
তু তু করে ডাক দিলে পর
অমনি মারি দৌড়,
বাহাদুরী মোর।

ভাঙা ঘরে থাকবো না মা আর। **(বাউলের সুর)**

ইং ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫,
১৩২২ সাল ২২শে ভাদ্র **২য়** বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

কার ঘাড়ে ধরেছ মহিস মর্দ্দিনী।
কখন কোন মহিযে কর মদ্দর্ন, অবোধ মোরা কি জানি।

আমরা লোক মুখে শুনি, বাল্মিকী মুণি
আশ্রমের নিকটে আছে তোর মণ্ডপ খানি,
তোমার জীর্ণ মন্দির সংস্কারে চেষ্টা করছ আপনি ॥

জেনেছি রামায়ণ পড়ে, সীতা উদ্ধারের তরে
মুস্কিলে পড়িয়া শ্রীরাম তোর পূজা করে,
নীল পদ্মাভাবে আঁখি দিতে উদ্যত রঘুমণি।

কলিতে নাইক রাবণ রাম
কে আর করবে সংগ্রাম,
তোমার সেবা করবে কেবা নেয়না দুর্গা নাম,
এবার শাক্তদেবতা শান্তি সেবায় অনুরক্ত তাই ॥

ঠেলাতে পড়ে, মান বাঁচাবার তরে,
ভক্তিতে বা অভক্তিতে তোর পূজা করে,
তারে করিস দয়া মহামায়া ভুলে সাবেক দনুসমনী।

কহে দ্বিজ হরেরাম ত্রেতায় পদ্মলোচন রাম,
তোর দয়াতে রাবণ সনে জিনেছে সংগ্রাম,
কোন্ পদ্মলোচন যুদ্ধে দেখব করবে এবার মর্দ্দানি।

পূজায় দ্বিপত্নীকের বিপদ।

ইং ১৩ই অক্টোবর ১৯১৫,
১৩২২ সাল ২৬শে আশ্বিন ২য় বর্ষ ২১শ সংখ্যা

শ্রীল শ্রীযুত শ্রীশ বাবু শ্রীরামপুরে বাড়ী।
বিদ্যা বুদ্ধি চলন সহি, সৌখীন কিন্তু ভারী ॥
ডাক নাম তার ফটিক বাবু ফটফটে চেহারা।
নাদুস্ নুদুস্ দেহখানি দোহারা পাহারা ॥
এক পুত পুত নয়, এক চোক নয় চোক।
এইজন্য উঠে বাবুর দুটো বিয়ের ঝোঁক ॥
বড় বউটী শ্যাম বর্ণা নামটি তার জলদা।
ছোটটির নাম সুহাসিনী বর্ণটি বেশ সাদা ॥
ছোট গিন্নি পেয়ার বেশী কার বা তা না হয় ?
বড় বউকে দেখে কিন্তু ফটিক করে ভয়।
গিন্নি দুটি ভিন্ন বাবুর আর কেহ নাই ঘরে।
দুই বউয়েরই ছেলে পিলে তাইরে নারে নারে ॥
ফটিক বাবু ঠিক হয়েছেন ব্রজের বনমালী।
কভু ভজেন শ্রীরাধিকা কভু চন্দ্রাবলী ॥
এই উপমা না বোঝেন ত সোজা কথায় বলি।
ফটিক বাবুর ডাইনে বাঁয়ে শ্যামলী ধবলী ॥
ম্যালেরিয়া রোগীর সঙ্গে বাবুর দশা মিলে।
এক কোঁকেতে যকৃত যেমন আর এক কোঁকে পিলে ॥
পূজোর হুজুগ লেগে গেছে বাংলা দেশটা ময়।
শুনুন এবার ফটিক বাবুর বাড়ীর অভিনয় ॥
গত প্রতিপদের দিনে ঠিক বেলা দুপুরে।
টুলের উপর বসে ফটিক বৈঠকখানা ঘরে ॥

এমন সময় ছোট গিন্নি সেই ঘরেতে ঢুকে।
পূজোর ফর্দ্দ করল হাজির হাসি হাসি মুখে॥
ফর্দ্দ দেখে বলছে ফটিক তোমার যা যা চাই।
চুপি চুপি এনে দেব গোল করনা ভাই॥
মহাল থেকে আসি বলে কলকাতা কাল যাব।
তোমার বরাত জিনিসগুলি পার্শেলে পাঠাব॥
বড় গিন্নি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যদি।
ঝগড়া করে ফাঠিয়ে দেবে পাজি হারামজাদি॥
আমি ছিলাম এ কথাটি গোপনে রাখিবা।
তাহার কাছে ব'লো এসব পাঠিয়ে দেছে বাবা॥
বড় গিন্নি সব শুনেছে দাঁড়িয়ে থেকে আড়ে।
হন্ হনিয়ে একেবারে ঢুকল এসে ঘরে॥
(বলে) কিরে মিনসে হাড় হাভাতে! আমি হারামজাদি?
একচড়ে গাল ফাটিয়ে দেব আবার বলিস্ যদি॥
বলিহারী বুদ্ধিকে তোর গণ্ড মুর্খ হাবা।
আমার ভয়ে হ'তে চাচ্ছ ছোট গিন্নির বাবা?
তোরও দেখছি লজ্জা নাই বেহায়া অভাগী।
কলসী দড়ি নিয়ে জলে ডুবে মরগে মাগী॥
সতীনের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে ভারী।
অভিমানে সুহাসিনীর ঝড়্ছে নয়ন বারি॥

বড় গিন্নির বাক্যবাণ, ছোট গিন্নির অভিমান
ফটিক পড়্ল বিষম সংকটে।
করে দুটী শুভ কর্ম্ম, হাড়ে হাড়ে বুঝছে মর্ম্ম,
দুমেগেদের এমনি দশাই ঘটে॥

কেরাণী-বিদায়।

ইং ১০ই নভেম্বর ১৯১৫,

১৩২২ সাল ২৪শে কার্ত্তিক ২য় বর্ষ ২৪শ সংখ্যা

পূজোর ছুটী কেটে গেল
খুলবে আপিস দুদিন বাদে।
জন্মভূমির মায়া ছেড়ে,
বিদেশ যেতে পরাণ কাঁদে॥

নাই কোন হাত যেতেই হবে
ওপরওয়ালা বিষম কড়া
মরি বাঁচি কম্পালসারি
ওপ্নিং ডেতে জইন্ করা॥

ভুলে গিয়ে মায়ের স্নেহ
প্রিয়তমার ভালবাসা।
বিদেশ গিয়ে দুর্গা বলে
কর্ব্ব শুরু কলম পেষা

তাড়াতাড়ি এলাম বাড়ী
হবা মাত্র পূজোর ছুটী।
বকেয়া কাজ বহুত আছে
ভাবতে ঝরে নয়ন দুটী ॥

রাত্রি জেগে সে সব গুলো
সারতে হবে তাড়াতাড়ি।
ঘুমের ঘোরে লিখতে গিয়ে
ভুলও হবে ঝুড়ি ঝুড়ি ॥

স্লিপ অফ্ পেন্ এক্সকিউজ্ মি,
বলতে হবে যুগ্ম হাতে।
এবার দফা রফা হবে
কৈফিয়তে কৈফিয়তে ॥

যে দশ টাকা এনেছিলাম
ব্যয় হল সব বাড়ী এসে
একটি পয়সা নাইক হাতে
রাস্তা খরচ হবে কিসে ॥

কর্ম্মস্থানে গেলে পরে
ধরবে যত পাওনাদারে।
এবার কিন্তু শুন্‌বেনা ক
দিব বল্লে মাস কাবারে ॥

দুধওয়ালী, নাপিত, ধোপায়
দিয়ে এসেছিলাম ফাঁকি।
হোটেলওয়ালা ভাত দিবে না
বাড়ী ভাড়াও ছমাস বাকি ॥

কেমন করে মুখ দেখাব
খাবই বা কি থাকব কোথা ?
ক্ষুণ্ণ মনে ঘরের কোণে,
ভাবছি এ সব দুঃখের কথা ॥

এমন সময় খোকা এসে
গলা ধরে বস্‌ল কোলে।
বল্লে 'বাবা বালীতে থাক্
দাৎনে বাবা আমায় ফেলে ॥

এমন সময় প্রিয়তমা
কইলেন এসে মধুর ভাষে।
মহরমে না এস যদি
এস যেন খৃীষ্ট মাসে॥

শিশুর আধ করুণ বাণী
অবলার এই ব্যাকুলতা।
পরাধীন বই অন্য লোকে
সইতে কভু পারত কি তা?

শুধু হাতে বিদেশ যাব
টাকাকড়ি নাইক বলে।
পত্নী আমার খোকার হাতের
বালা দুটি দিলেন খুলে॥

কঠিন প্রাণে পাষাণ বেঁধে
শক্ত করে নিদয় হিয়ে
রাস্তা খরচ যোগাড় হ'ল
খোকার বালা বাঁধা দিয়ে॥

প্রিয়তমার নিকট হ'তে।
'আসি' বলে বিদায় নিলাম
এখন মনের কথা আদান প্রদান
পোষ্টম্যানের গুজারতে॥

যদি বলেন তবে কেন
এত দুখের চাকরী করা।
কিন্তু এমন পার্মানেন্ট পোষ্ট
সহজে কি যায়গো ছাড়া॥

গোলাম গিরি মোলাম বটে
পেন্সন পেলে বুড়ো কালে।
সবার ভাগ্যে ঘটে কি তা?
অধিকাংশই পটোল তোলে॥

দীন বাউলের গান।

ইং ৫ই জানুয়ারী ১৯১৬,
১৩২২ সাল ২০শে পৌষ ২য় বর্ষ ৩১শ সংখ্যা

জয় নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গ, কত রঙ্গ, দেখাবে আর
এ সংসারে।
আশা দড়িতে বেঁধে, পদে পদে, বানর নাচা
করছ নরে॥

দেখাতে স্ব প্রভুত্ব, সবাই মত্ত, সত্য তথ্য
গোপন করে—
করিছে বাহাদুরী, হয়ে মুদাড়ি, বিকাইয়ে
মিছরী দরে ॥
ভিতরে স্বার্থভরা, আগা গোড়া, মতলব
পোরা হাড়ে হাড়ে—
বাহিরে অনাহারী, ধর্ম্মাচারী, বক যেমন
রয় পুকুর ধারে ॥
কেহবা দেশের হিতে, দিনে রেতে, খাটছে সকল
স্বার্থ ছেড়ে—
কারো বা দশের কাজে লভ্য আছে, জুতো দান
তার গরু মেরে ॥
মাখিয়ে তিলক মাটী, ফোটা কাটি, খাঁটির
মত চটক ক'রে—
মাথাতে উঁড়িয়ে টিকি, দিচ্ছে ফাঁকি, করছে
চুরি দিন দুপুরে ॥
কেহবা ভাবে পাগল, ভেবে পাগল, কেহ পাগল
ভাত বেগরে—
হইয়ে কেউ মানের পাগল, বাধাছে গোল মরছে ভেবে
মানের তরে ॥
এ সকল মনের ভ্রান্তি, এ অশান্তি, শুধুই
ভোগে অহংকারে—
যদি চাও হতে মান্য, যে নিরন্ন দুটি অন্ন
দাও তাহারে ॥
ভেবে দীন বাউল বলে, অবহেলে, মান পাবি
মন সে দরবারে—
যেখানে আসল ফাঁকি, খাঁটি মেকি আপনা
হ'তে ধরা পড়ে ॥

স্বায়ত্ত আসন।

অনাহারী পোষ্ট।

(৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আমার জন্মভূমি" সুরে)

পাগল হলাম আমি।

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা

(Parody)

এমন পোষ্ট কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
যাহার জন্য ভেবে ভেবে পাগল হলাম আমি।

মান সম্মান যশের খনি, আমাদের বাংলা দেশ খানি,
তাহার মধ্যে আছে পোষ্ট সকল পোষ্টের সেরা।
ইলেক্‌সনে তৈরী সেটা কম্পিটিশন ঘেরা।।
এমন পোষ্ট ইত্যাদি ....

নাইক এতে মাইনা কড়ি, কেবলই পোষ্ট অনাহারী,
তারি তরে মারামারি করে ঘরে ঘরে।
(খালি) 'নামকা বাস্তে' ভোট কিনিতে টাকা খরচ করে।
এমন পোষ্ট ইত্যাদি........

দেখ এক বিষম আশ্চর্য্য, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য,
তারাও পাচ্ছে এসব কার্য্য, কেবল ভোটের চোটে।
(যারা) বায়না নইলে কয়না কথা তারাও বেগার খাটে।
এমন পোষ্ট ইত্যাদি........

যদি বল দেশের লাগি, এঁরা তবে স্বার্থত্যাগী,
বেগার খাটে এই বাবুরা দেশের উপকারে।
(তবে) মরা ফেলতে ডাক্‌লে কেন লুকিয়ে থাকে ঘরে।।
এমন পোষ্ট ইত্যাদি........

এ সব দেখে লাগে ধন্ধ, মনে মনে হচ্ছে সন্দ
হয়ত এতে আছে কোন লুক্কায়িত মধু।
(নইলে) একটা পয়সার মা বাপ যারা বেগার খাটে শুধু?
এমন পোষ্ট ইত্যাদি........

আমার বিদ্যা যৎ সামান্য, কিন্তু ইচ্ছা হ'তে মান্য,
অনাহারীর অগ্রগণ্য পারি হতে যদি।
যারা মূর্খ বলে, তারাই আবার কর্‌বে খোসামোদী।
এমন পোষ্ট ইত্যাদি........

পাইতে এই মানের পোষ্ট, পূর্ব্ব সম্মান হ'ল নষ্ট,
তবুও বেগারী পোষ্ট দিবনাক ছাড়ি।
(যেন) অনাহারী পোষ্টে থেকে অনাহারেই মরি।।
এমন পোষ্ট ইত্যাদি........

পেটুক বামুন।

১৩২৪ সাল ৪র্থ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা

বাজারে যে ঘী পাওয়া যায়
শুনেছি সে সব ভেজাল ঘী।
লুচি খাওয়া ঘুচ্‌লে বুঝি
এখন আমার উপায় কি?

আর বুঝি পাবনা খেতে
ছানাবড়া, পানতোয়া
খাজা, গজা, মিহিদানা,
জিলাপী আর মালপোয়া !

এতদিনে মোর রাশিতে
এসে ঢুকেছেন শনি ;
লুচির ছাঁদা না পেলে যে
ধরবে ঝাঁটা ব্রাহ্মণী !

পাকা ধানে মই দিনু কার ?
ভাত রেঁধেছি কার বুকে ?
আমার সঙ্গে বাদ সাধিতে
কে লেগেছিস্ বুক ঠুকে ?

কে রটালি এসব গুজব ?
কি দুস্মনী বাপরে বাপ !
শুন্ছি আবার চিনি নাকি
গরুর হাড়ে হচ্ছে সাফ্ ।

ঘীয়ের আইন জারী হল
তবে এ সব নয় ফাঁকা ।
ভেজাল বেচে মাড়োয়ারীর
দণ্ড হল লাখ টাকা ।

রসনারে ! এবার হ'ল
বাসনা তোর করতে দূর ;
নেহাৎ তোমার ভাগ্যে আছে
চিড়ে, দৈ আর কোৎরা গুড় ।

আমার মত পেটুক বামুন
নিরানব্বই শতকরা ;
চর্ব্বি মিশেল ঘৃত খান সব
অস্থি মিশেল শর্করা ।

চর্ব্বি খাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত
কর্ব বল কি দিয়া ?
প্রায়শ্চিত্ত কর্ছি রোজই—
ধরেছে ডিস্পেপ্সিয়া ।

জেনে শুনে ঠাকুর সকল !
এই গু যদি খাও আবার
ব্রহ্ম অগ্নি নিবিয়ে যাবে
ব্রহ্মণ্যে দেব পগার পার ।

দেশোয়ালী ভকতেরা
আনে যদি সাচ্চা ঘী,
দু'হাত তুলে কর্‌ব আশীষ
"জীত্তা রহো ভকতজী।"

উদর সর্ব্বস্ব দেবশর্ম্মা

তঙ্কাস্তোত্র।

১৩২৪ সাল ৪র্থ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

দুরিত বিনাশিনী তঙ্কে
রাজ রাজেশ্বর মূর্ত্তি বিভূষিতা
রজত শুভ্র শুভ অঙ্কে।

কত শত তস্কর সাধু হইল তব
পুণ্য চরণ যুগ পরশি
কত দীন দীনা ধন্য হইল তব
স্নিগ্ধ মধুর স্নেহে সরসি,
ভ্রমিছ "ঝণিকি ঝিনি" নুপুর ঝঙ্কারিয়া
কত শত ঘরে কত বাক্সে
করি সম্মার্জিত মলিন ভাগ্য কত
দলিয়া মথিয়া দুখাতঙ্কে।।

মানব-কীর্ত্তন-পুলকিত কমলা-
বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া
শুভ্র কমল-দল উচ্ছলি ঝলমলি
রজত আকর পরে ঝরিয়া
টাক শাল হইতে কত শত সাজে
কিরণ বিকীরিয়া তিমিরে
নামি কারেন্সী, এক্সচেকার আফিসে
দীপ্তি সঁপিলে সব ব্যাঙ্কে।।

সমাপিয়া দৈনিক গোলামী যখন গো
প্রত্যাগত নিজ ভবনে
বরিষ শ্রবণে তব ঝন ঝন রব
বিকাশ দীপ্তি প্রিয়া নয়নে
বরিষ শক্তি মম দুর্ব্বল বক্ষে
বরিষ ভরসা মম প্রাণে,
হে জগ-মোহিনী, জগজন পালিকে
রাখ এ দীনতা-পঙ্কে।

শ্রী গোলামী জীবন শর্ম্মা।

চণ্ডী-রিহার্সাল।

১৩২৪ সাল ৪র্থ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ,
বোধোদয়ে বাংলা শোধ,
"মুকুন্দ সচ্চিদানন্দে"
সাঙ্গ করি মুগ্ধবোধ।
অধ্যাপক সব হার মেনেছে
আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে,
বিনা পাঠে জ্ঞান লভেছি
কৃতন্ত ও তদ্ধিতে।
দৈব-বলে বলী আমি
সে সব কথা বলব কি ?
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
আমি কলির বাল্মিকী।
দশের কাছে ভারী খাতির
দশ কর্ম্মে বিষম যশ,
তবুও তো পড়ি নাই কো
সু, ঔ, জস্ কি অম্, ঔট, শস্।
দু অক্ষরে সিদ্ধ আমি
বিসর্গ ও অনুস্বর,
এরই জোরে গড়বো সমাজ,
আর কিছু দিন সবুর কর।
বেওয়ারিশ সমাজ তোদের
ইহার কোন রক্ষী নাই,
অঘটন সব ঘটিয়ে দিব,
পেলে পুরো দক্ষিণায়।
আমার জোরে কুলীন হ'ল
কত শত শ্রোত্রিয়,—
যে জাত হ'না, আয় চলে' আয়,
করে দিব ক্ষত্রিয়।
পৈতা নিবি যদি তোরা
আমার সঙ্গে কর ঠিকা,
ক্ষত্রী করার 'রেট' বেঁধেছি
মানুষ পিছু পাঁচ সিকা।
পৌরোহিত্য কার্যটি আমার
হ'য়ে উঠ্‌লো একচেটে,
পূজা-পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ আদি
করি আমি 'হাফ্ রেটে'।
সিদ্ধ আমি জপে তপে
প্রাণায়াম-ন্যাস-কুম্ভকে,

তোটক ছন্দে সকল কার্য্য
কর্ত্তে পারি চুম্বকে।
অস্থিযুক্ত চিনির মিঠাই
সর্ব্বাচ্চ ঘিয়ের লুচি,
"অপবিত্র পবিত্রো বা"
মন্তরে করি শুচি।
এবার আমায় কর্ত্তে পূজো
জেতে হবে বর্দ্ধমান,
পাছে কেহ ভুল ধরে' তাই
আওড়ে' নিচ্ছি চণ্ডীখান।

কেরাণী বিদায়।

১৩২৪ সাল ৪র্থ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা

আলুভাতে ভাত রেঁধেছি
খেয়ে যাবে চাট্টি ক'রে ;
বাসি মুখে গেলে পরে
বেয়ারাম হবে পিত্তি প'ড়ে।

রাস্তা খরচ নাইক হাতে
বলেছিলে আমায় কাল
টাকার জন্য দেরী হল
নইলে রাঁধা হতো ডা'ল।

পাঁচটী টাকা এলাম নিয়ে
রায় মশায়ের বাড়ী থেকে।
আনা সুদে কর্জ্জ ক'রে
খোকার তবক বাঁধা রেখে।

যাচ্ছ মেলেরিয়ার দেশে
সাবধান হ'য়ে যেন থেকো
খোকার দিব্বি থাকে তোমার
একটি কথা মনে রেখো—

কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটাব
না খেয়ে নয় যাব মারা
একটি পয়সা নিয়োনাক
কেবল ন্যায্য মাইনে ছাড়া।

মনে রেখো ঘুষের টাকায়
হবে নাক কোন ফল
কেবল লোকের অভিশাপে
খোকার হবে অমঙ্গল।

বাপের বাড়ী যাবনা আর
যদিও সুখ বাপের ঘরে
কাঙ্গাল মোরা তাইতে মোর
বৌদিদিরা ঘেন্না করে।

যে চাল আজও ঘরে আছে
মা বেটার খুব এ মাস যাবে
ডাকে টাকা পাঠিয়ে দিও
যখনি তুমি মাইনে পাবে।

আর বেশী করনা দেরী
হ'য়ে এল ট্রেণের বেলা
দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা
জয় মা সর্ব্বমঙ্গলা।

সুমতি দিও হে হরি
ধর্ম্ম রেখো দয়াময়
ঘুষের অন্ন খাবার আগে
যেন আমার মৃত্যু হয়।

কাঙ্গাল সাধুর পত্নী ক'রে
রাখিস মোরে মা ভবানী।
ঘুষখোর তস্করের ঘরে
চাইনা হ'তে রাজার রাণী।

ঘুষখোর বাবুর টেরীর উপর
হয়না কেন বজ্রপাত
তাদের কাঙ্গাল কাঁদা ঐশ্বর্য্যেতে
করি আমি পদাঘাত।

ঘোড়ার-গাড়ীর আশীর্ব্বাদ।

১৩২৪ সাল ৪র্থ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা

জয় জয় মিনুসিপালী
বেঁচে থাক বাপ্।
জন্ম জন্ম যেন
আমার ট্যাক্স থাকে মাপ।
যত পার গো-গাড়ীকে
দাওনা কেন হানা,
বেশ করেছ ন আনাতে
করলে তের আনা।
সবাই মরুক ট্যাক্স দিয়ে
আমি খাব ফাও।
সোয়ার আমার বল্‌বে "শুয়ার!

হট্ যাও ! হট যাও !!"
গোগাড়ীতে যদি আমার
গতি করে রোধ
পাঁচ আইনে দিয়ে তারে
নিও প্রতিশোধ।

টাকার ঊনপঞ্চাশৎ নাম।

১৩২৪ সাল ৪র্থ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা

জয় ধন জয় অর্থ রাজ-মূর্ত্তি-ধর।
রৌপ্যখণ্ড কর কৃপা সুখের সাগর ॥
জয় মুদ্রা জয় টাকা জয় জয় আধুলি।
কৃপণের প্রাণধন দাতার কাছে ধূলি ॥
টাকা নাম পয়সা নাম বড়ই মধুর।
যে জন না ভজে টাকা সে হয় ফতুর ॥
টাকা উপায়ের তরে সংসারে আইনু।
অভাবে পড়িয়া শেষে ভ্যাবাচ্যাকা হৈনু ॥
বন্যার মতন পুত্র কন্যা এল ঘরে।
কালরূপে কন্যাদায় চেপে বসে ঘাড়ে ॥
যখন টাকা জন্ম নিল টাকশাল ভিতরে।
মর্ত্ত্যলোকে নরগণ লোভবৃষ্টি করে ॥
উত্তমর্ণ রেখে এল অধমর্ণ ঘরে।
সুদরূপে তথা প্রভু দিনে দিনে বাড়ে ॥
দেনদার রাখিল নাম কর্জ্জ আর দেনা।
মহাজন নাম রাখে দাদন লহনা ॥
পশ্চিমবঙ্গের লোক টাকা নাম রাখে।
পূর্ব্বঙ্গবাসী সব টাহা বলে ডাকে ॥
সাহেব রাখিল নাম 'রূপি' আর 'মণি'।
বিলাতে হইল নাম পাউণ্ড, শিলিং, গিণি ॥
রূপেয়া রাখিল নাম দেশোয়ালী ভাই
টঙ্কা নাম রাখিলেন উড়িয়া গোঁসাই ॥
তহবিল নাম রাখে সওদাগর ধনী।
'ফেয়ার' রাখিল নাম রেলওয়ে কোম্পানী ॥
'ভিজিট' রাখিল নাম ডাক্তারের দলে।
'ফিঃ' নাম রাখিল সব মোক্তার উকিলে ॥
খাজনা ও সেস নাম রাখিল ভূস্বামী।
গুরুদেব নাম রাখে বার্ষিকী প্রণামী ॥
দক্ষিণা রাখিল নাম পুরুত ঠাকুরে।
বেতন মাহিনা নাম রাখিল চাকুরে ॥
লাভ নাম রাখিলেন যিনি ভাগ্যবান।
দেওলিয়া দুখে নাম রাখিল লোকসান ॥

উপরি পাওনা নাম রাখে ঘুষখোর।
বামাল রাখিল নাম ডাকাইত চোর॥
বাণি নাম রাখিলেন শিল্পকরগণ।
খোরাকী রাখিল নাম পেয়াদা পিয়ন॥
ডালি নাম রাখিলেন উপরওয়ালা।
পণ নাম দিল যত বেটা বেচা—॥
"টি, এ" নাম রাখিলেন "টুরিং অফিসার"।
"হল্‌টিং" ও "মাইলেজ" নামান্তর যার॥
সরকার রাখিল নাম টেক্স ক রকম।
"পার্শনাল" "লেটারিণ" আর "ইন্‌কম"॥
নজর সেলামী রাখে জমিদার ধনী।
গোমস্তা রাখিল নাম নিকাসী পার্ব্বণী॥
ভৃত্যগণ নাম রাখে ইলাম বখসিস্‌।
নোট নামে প্রকাশিল "করেন্সী অফিস॥"
ফৌজদারী আসামী রাখে নাম জরিমানা।
না দিতে পারিলে তার ভাগ্যে জেলখানা॥
ভোগ ও মানসা নাম দেবতা মন্দিরে।
সিন্নি নাম রাখিলেন মুসলমানী পিরে॥
দালাল সকলে নাম রাখিল দালালী।
"বলি" নামে অভিহিত করিল মা কালী॥
তীর্থের স্হানেও তব বাঁধা আছে রেট।
জগন্নাথে আটকা আর বৃন্দাবনে ভেট॥
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি সারাৎসার।
তুমি বিনা দেখি প্রভু সব অন্ধকার॥
তব পদে কোটী কোটী নমস্কার করি।
উনপঞ্চাশৎ নাম রচিল ফেরারী॥
ভোরে উঠে এই নাম যে করে বর্ণন।
অবশ্য হইবে তার দারিদ্র মোচন॥

Prestige বা Dignity
অর্থাৎ
সম্ভ্রম।

(আবির্ভাব) :

১৩২৬ সাল ৫ম বর্ষ ৪১শ সংখ্যা

মাতৃগর্ভ হ'তে আগমন মোর
যেদিন সূতিকাগারে ;
ইতর জাতীয়া ছিল ধাত্রী এক
অভ্যর্থনা করিবারে।

অপবিত্র খাই, অপবিত্র আমি
অপবিত্র বাসস্থান—
দৈবে যদি কেহ ভুলিয়া ছুঁয়েছে,
তখনি করেছে স্নান।
মল, মূত্র, ধূলা, কাদা মাটি ছাই
যা পেয়েছি সম্মুখে,
খাবার জিনিস ভাবিয়া তাহাই
তুলিয়া দিয়েছি মুখে।
এইরূপ ভাবে কাটি বহুদিন,
যখন হইনু বড়
বলিলেন বাবা "যাও খোকা তুমি
পাঠশালে গিয়া পড়।'
আজও মনে পড়ে গুরুমশায়ের
হাতের ভীষণ বেত্র—
বহুদিন ধ'রে এই পৃষ্ঠদেশ
ছিল তাঁর লীলা ক্ষেত্র।
বেঞ্চ পরে দাঁড়া, হাঁটু গেরে থাকা
আদি কত বিভীষিকা,
অতিক্রম করি, ছাড়িনু ইস্কুল
পাশ করি প্রবেশিকা।
কলিকাতা গিয়া কলেজে ঢুকিনু
আস্তানা হ'ল মেসে।
বছরে দু'বার অবকাশ পেলে
আসিতাম ফিরে দেশে;
ছুটি শেষ হ'লে, কলিকাতা যেতে
পাইত আমার কান্না:
কেন তা জানেন? খেতে হবে বলে'
উড়ে'র হাতের রান্না।
পাঠাতেন বাবা ডাক যোগে মোরে
কুড়ি টাকা প্রতি মাস।
দুবছর পরে ঈশ্বর ইচ্ছায়
করিলাম এফ, এ, পাশ।
দুইখানি পাশ এইবার মোরে,
প্রকাশ্য নিলামে তুল্লে।
বেচিলেন বাবা শ্বশুরের কাছে,
দুহাজার টাকা মূল্যে।
পাইলাম এক ষোড়শী যুবতী—
যাহা ছিল ভবিতব্যে।
এক রেতে 'আবু হোসেন' হইনু
শ্বশুরের দেয়া দ্রব্যে।

সাজিলাম বাবু, সুন্দর পোষাকে
সুবর্ণের ঘড়ি চেনে।
অমুকের বেটা অমুক বলিয়া
কে তখন মোরে চেনে?
শেষ করি বিয়ে, পড়িবারে বি, এ,
আবার করিনু যাত্রা।
শ্বশুরমশায় হ'য়ে গোরী সেন,
বাড়া'ল বিলাস মাত্রা।
প্রেমিক হইয়া শিখিলাম প্রেম,
প্রেম হ'ল ভারী জ্ঞান।
প্রেমিকার চিঠি দিয়ে যেত রোজ
দূতরূপী পোষ্টম্যান।
নভেল পড়িয়া শিখিলাম ক্রমে
নভেলী ধরণে চলা।
সদাই ধ্বনিত শ্রবণে প্রিয়ার
সা রে গা মা সাধা গলা।
এইবার আমি হব গ্র্যাজুয়েট
জেনে রেখেছিনু খাঁটি।
'ফোর্থ ইয়ারেতে' ইয়ার জুটিয়া
ক'রে দিল সব মাটি।
দুঃখের উপর অসহ্য দুঃখ,
ইহা কি পরাণে সয়
ফেল হ'নু আমি, লোকে বলে কিনা
মম অপরাধে শুধু অকারণ
'বউটির নাহি পয়!'
দোষী হ'ল মোর প্রিয়া।
অবলা সরলা শুনি এ গঞ্জনা
কেমনে বাঁধিবে হিয়া?
পড়িব আবার করিবই পাশ,
ঠেকিয়া পেয়েছি হুঁস্।
অধ্যবসায়েতে ফলিবে সুফল,
প্রমাণ রবার্ট ব্রুস্।
যে' কথা সে' কাজ পাশ হনু এম, এ,
খাটিয়া বছর তিন।
ইহার মধ্যে বাড়ী মুখো আর
হই নাই কোন দিন।
কি ছিনু কি হ'নু আমি একজন
মানুষ না পীর।
বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পাশ যেন
বিশ্বজয়ী বীর!

এবার আমার সাহেব সাজিতে
সাধ হ'ল বড় প্রাণে।
সাহেবী পোষাক কিনিলাম ক'টা
লেড্‌ল এর দোকানে।
যাত্রা করিয়া স্বদেশের দিকে
যখন আসিনু ঘর,
বাবা বলে 'ঘরে নারায়ণ আছে,
তাঁহারে প্রণাম কর্‌'।
সম্ভ্রম আমার কতদূর তাহা
বুঝিল না পিতা মাতা!
পাথরের কাছে করিতে প্রণাম
কাটা গেল যেন মাথা।
পাড়াগেঁয়ে নাহি জানে এটিকেট
এমনি তাহারা বোকা!
এম, এ পাশ আমি বাবা বলে কিনা
'তামাক সাজ্‌তো খোকা।'
যে কাজ করিতে বাবা বলে মোরে
তাই বিলো ডিগ্‌নিটি—
ভাবিতেছি ব'সে, এমন সময়ে
পাইনু খামের চিঠি।
"আহা কি নিঠুর! আহা হি নিঠুর!
রেখে গেছ একাকিনী;
বর্ষত্রয় ধরি জলধর আশে
বসে আছে চাতকিনী।"
চারি ছত্র পড়ি চোখে এলো জল
আর কি থাকিতে পারি?
পরদিন প্রাতে সূর্য্যনা উঠিতে
ছুটিনু শ্বশুরবাড়ী।
বিরহের পর মিলন হইয়া
ঘণীভূত হ'ল প্রেম।
প্রেষ্টিজ রাখিতে সাহেব সাজিয়া
তাহারে সাজানু মেম।
সম্ভ্রমে আঘাত যদি কেউ করে
বড় চটে যাই আমরা
বাড়ী ছাড়ি তাই করিলাম সার
"শ্বশুর বাড়ীর কামরা।"

একখানি আরজী।

দরিদ্রতা বনাম দরিদ্র।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা

চৌকী বিধাতাপুর নসীবী আদালত।
বাদী—দরিদ্রতা, পিতা—শ্রীবিধাতা,
সাকিম—মন্বন্তপুর,
পেশা—দেগদারী, ধরি গোবেচারী,
করে সব আশাচুর।
বিবাদী—দরিদ্র, চারিদিকে ছিদ্র,
পিতা মাতা নাই তার,
সাকিমবিহীন পেশা হচ্ছে ঋণ,
অন্নাভাবে হাহাকার।
দাবি—এই বিবাদীর যা আছে আপন
বাবত—স্বত্ব সাব্যস্তসহ দখল পালন।
বাদীর বর্ণনা এই,...ধর্ম্ম অবতার!
বিবাদীতে জন্মাবধি দখল তাহার।
বিবাদী ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দীনের কুটীরে,
অল্পদিনে করে শেষ মা বাপ দুটীরে।
তদবধি করি বাস বাদীর ছায়ায়,
পালিত হইয়াছিল পরের দয়ায়।
বাদীর দোহাই দিয়া বিদ্যালয় হ'তে
শিখিয়াছে বিদ্যাটুকু কেবল মুফোতে।
যৌবনে নিশ্চয় লিপ্ত হইত পাপেতে।
রক্ষা করিয়াছি এরে অভাব রূপেতে।
আছিনু বিবাদী সনে আমি অহরহ,
সে কারণে সবে এবে করে অনুগ্রহ।
বিধিদত্ত সর্ত্ত আছে দেখাতে পারিব—
আঁতুড়ে ধরিয়া এরে শ্মশানে ছাড়িব।
বিবাদী সে সব সর্ত্ত করিয়া লঙ্ঘন,
করিতে সচেষ্ট মোর উচ্ছেদ সাধন।
রাতারাতি বসিবারে চাহে রাজপাটে,
খণ্ডিয়া বিধির বিধি যা আছে ললাটে।
আকাঙ্ক্ষার পরামর্শে আমারে ত্যজিয়া
ধনী হ'তে চান ইনি সম্পদে ভজিয়া।
অত্র এলাকার এই বিবাদী মোকামে,
নালিশের হেতু হইয়াছে ক্রমে ক্রমে।

বাদীর প্রার্থনা করি বিবেচনা,
ডিক্রী দাও যেন তাকে ;
(ক) পুত্র পৌত্রাদি, ক্রমে এ বিবাদী
বাদীর দখলে থাকে।
(খ) সঞ্চিত নিধি অঞ্চলে বাঁধি
বঞ্চিত যেন হয়।
বাঞ্ছিত ফল লভিতে কেবল
লাঞ্ছনা যেন সয়।
এই মামলায়, খরচা যা পাই,
হয় যেন সব ডিক্রী,
থালা ঘটিবাটী বাস্তুভিটে মাটী
করিয়া লইব বিক্রী।

আমি শ্রীদরিদ্রতা
প্রকাশিনু যে যে কথা।
সত্য সব মম জ্ঞান মতে।
ত্র্যহস্পর্শ শনিবারে
বারবেলা ঠিক ক'রে
স্বাক্ষর করিনু আদালতে।

আরজীর জবাব।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত ১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

চৌকী বিধাতাপুরে নসিবী আদালত।
ঊনিশ স্বত্ব অম্বর ঊনপঞ্চাশৎ॥
বাদী দরিদ্রতা আর বিবাদী দরিদ্র।
চারিদিক ফাঁক তার নাহি কোন ছিদ্র॥
উপরোক্ত বিবাদীর জবাব বর্ণনা।
বর্ত্তমান আকারেতে নালিশ চলে না॥
যুগ ধর্ম্ম নজীরের দিতেছি দোহাই।
বাদী পক্ষ নালিশের হেতু কিছু নাই॥
তর্কস্থলে মানিলেও বাদীর কথায়।
আশ্রিতের কৃতজ্ঞতা কে কোথায় পায় ?
বিদ্যাসাগরের কথা খ্যাত চরাচরে।
উপকৃত বিনা নিন্দা কেবা কার করে ?
দাবি হইয়াছে এবে তামাদি বারিত।
পক্ষাভাব দোষ তায় হয়েছে ঘটিত॥
ভাগ্যে পক্ষ বিনা এই মামলা অচল।
ভাগ্য ছাড়া অন্য পক্ষ চাই কর্ম্মফল॥

এই বাদী আর তার পিতা শ্রীবিধাতা।
জন্মাবধি মম সনে করিছে শত্রুতা ॥
অন্যায় লাভের আশে করি প্রবঞ্চনা।
করিয়াছে মিথ্যা কথা আর্জীতে বর্ণনা ॥
দরিদ্র কোথায় ঋণ কোন্ কালে পায়।
পেশা অনাহার বিনা দিন চলা দায় ॥
ভাগ্যবশে দীনগৃহে জন্মিনু যখন।
পিতা মাতা করিলেন স্বর্গেতে গমন ॥
ভাগ্যবশে পাই আমি পরের আশ্রয়।
দরিদ্রতা সহ দেখ সেকালেতে নয় ॥
দরিদ্রতা আশ্রয়েতে থাকি কোন জন।
কে কথায় হইয়াছে দয়ায় ভাজন ?
ধনীর আত্মীয় সব সুপারিশ জোরে।
ফ্রিষ্টুডেণ্ট হ'য়ে থাকে মেম্বরের বরে ॥
নানাবিধ ফরমাস খাটায়ে তাহারে।
অকারণ শিক্ষকেরা তিরস্কার করে ॥
বহুবিধ পুরস্কারে বঞ্চিত করিয়া।
প্রকৃত দরিদ্র ছাত্রে দেয় তাড়াইয়া ॥
অভাবেই হ'য়ে থাকে চরিত্র স্খলন।
বাদী বলে অভাবেতে করেছে রক্ষণ ॥
অভাব দরিদ্র বোধ ছিল না তখন।
উপেক্ষিয়া পল্লীবালা হায়রে যখন !
বাবুর শিক্ষিতা কন্যা করিনু গ্রহণ।
বাদী আমি সেই কালে দিল দরশন ॥
আকাঙ্ক্ষার সহায়েতে অভাব সৃজিয়া।
বাদী হস্তে পড়িলাম নাচার হইয়া ॥
দূর দূর করি যদি দিই তাড়াইয়া।
লালসা রূপেতে পুন আসে ফিরিয়া ॥
তদবধি বাদী মোরে ছাড়িতে না চায়।
হে ধর্ম্মাবতার কর যা হয় উপায় ॥
চতুর এ বাদী মোর নালিশের ডরে।
অগ্রসূচী এই মিথ্যা মোকদ্দমা করে ॥
অন্যায় নালিশ হ'তে অব্যাহতি চাই।
আর সব খরচার ডিক্রী যেন পাই ॥
আমি যে বিশ্রী দরিদ্র করিনু স্বাক্ষর।
জ্ঞানমতে সত্য জানি ইহার উপর ॥

পূজার তত্ত্ব।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

সাত বছরের উমার নিয়ে
বিধবা হল দিগম্বরী ;
যত কষ্ট সব ভুলিত
কন্যাটীরে বক্ষে ধরি।
ক্রমে ক্রমে উমাশশির
চৌদ্দ বছর বয়স হ'লে,
পাড়ার লোকে উমার মাকে
যার যা' ইচ্ছা সেই তা' বলে।
রামহরি ঘোষালের ছেলে—
মদন এবার কি সুক্ষণে,
বি, এর ডিক্রী জয় করেছে
তৃতীয়বার আক্রমণে!
তারই করে কন্যা দিবার
অভিলাষে দিগম্বরী,
ও পাড়াতে হত্যা দিল
ঘোষাল বুড়োর চরণ ধরি।
দয়ার সাগর বরের বাবা
কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে,
মায় গহণা দান সামগ্রী
চারটী হাজার বসল হেঁকে।
গ্রামে উমার বিয়ে দিলে
তত্ত্ব পাবে সব সময়ে ;
নিজের ব্যারাম পীড়া হ'লে
আসবে ছুটে জামাই মেয়ে।
এই আশাতে দিগম্বরী
চার' হাজারেই হ'ল রাজি ;
ভাবলে না যে—ঘোষাল গিন্নি—
তরঙ্গিনী বেজায় পাজি।
পাড়ার লোকে তার জ্বালাতে
ব্যস্ত হ'য়ে থাকে ভারী,
স্বামীকে সে প্রহার ক'রে
নাম পেয়েছে 'ভাতারমারী'।
নিষ্কারণে ঝগড়া করে,
শুধুই করে গালাগালি
বছর চল্লিশ বয়স, কিন্তু
সেজে থাক খেমটায়ালী।

জেনে শুনেও দিগম্বরী
জমি বাগান বরগা ইঁটে
চার হাজারই করল যোগাড়
রইল শুধু বাস্তুভিটে।
কন্যা ভিন্ন কেউ নাহি তার
স্নেহে ভরা মায়ের প্রাণ,
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে কর্‌ল
গ্র্যাজুয়েট কন্যাদান।
আশ্বিন মাসটী পড়্‌ল যেমন
বেয়ান—ভীতা দিগম্বরী
কিছু টাকা কর্‌ল যোগাড়
এ গাঁ সে গাঁ ভিক্ষা করি।
বহুদিন দেখেনি উমায়
তাইতে নিজে তত্ত্ব নিয়ে
লাজ সরম সব দূরে রেখে
বেয়াই বাড়ী উঠ্‌লো গিয়ে।
বৌ এর মাকে তত্ত্ব নিয়ে
আস্‌তে দেখে তরঙ্গিনী—
ক্রোধে ভয়ংকরী মূর্ত্তি—
সদ্য যেন রাইবাঘিনী।
বেটা বউকে ডেকে বলে—
'দেখ্‌সে আমি সাধে রাগি!
তিন পয়সার জিনিস নিয়ে
এসেছে হায়'রে মাগি।'
দূর হ' মাগি হারামজাদি!
তোক ছরতের মাথা খেয়ে,
কোন্ সাহসে ঢুক্‌লি হেথা
আড়াই টাকার জিনিস নিয়ে।
আমার কথা ঠেলে দিয়ে
দিলে বুড়ো আফিং খোর।
খ্যাংরা পেটা কর্‌বে মাগি
নইলে উঠা জিনিস তোর।
হায়রে সমাজ! হায়রে প্রথা!
হায়রে বামুন সভার ফল:
এখনও হতেছে সহ্য
দীন-বিধবার চোকের জল!
তরঙ্গিণীর মত বেয়ান
পাঠক! যদি তোমার হতো,
ইচ্ছা কি হতো না দিতে
ঘা পাঁচ ছয় পুরাণো জুতো!

শ্বাশুড়ী-বধূ সংবাদ।

(শ্বাশুড়ী)

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

কি কুক্ষণে লক্ষ্মীছাড়ী
 ঢুক্‌লি এসে আমার ঘর!
স্কন্ধে চেপে আমার অমন
 সোণার বাছায় কর্‌লি পর!
মাইনে পেলে সব তোরে দেয়—
 দুখের কথা কারে বা কই
তুই মাগী তার আপন জনা
 আমরা যেন কেহই নই!
ভাগ্যে বুড়ো বেঁচে আছে
 তাইতো মিল্‌ছে শাক আর ভাত,
বুড়ো ম'রে গেলে কি যে হবে
 ভেবে হয় শিরে বজ্রাঘাত।
বুড়ো বুড়ী মোরা দুখে দিন কাটি,
 তোদের বেড়েছে রঙ্গরস।
হায়রে আমার বুকের বাছার
 কি মন্তরে কর্‌লি বশ।

(বধূ)

নিজের মন্দ নিজেই ক'রেছ
 ঝগড়ায় কোন নাহিক ফল।
কি আর হইবে বল মিছামিছি
 গোড়া কেটে দিলে আগায় জল।
আঁতুর হইতে কলেজ খরচা
 হিসাব করিয়া চার হাজার,
বাবার নিকটে নিয়েছ তোমরা
 পুত্রের দাবি কেন আবার?
পর্ব্বে পর্ব্বে জুলুম করিয়া
 আদায় করেছ তত্ত্বটা
পুত্র বলিয়া তবে আর কেন
 চাহিছ রাখিতে স্বত্ত্বটা।
সাবধান বুড়ি! আমার সহিতে
 ঝগড়া এরূপ ক'রোনা আর,
তোমার পুত্রে আইনতঃ আমি
 খরিদ সূত্রে দখিলকার।

সমাজ ন্যাতার 'ভ্যালু'।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা

সমাজ সমাজ শুনে শুনে
কাণটা হ'ল ভোঁতা।
খুঁজে কিন্তু পাইনা দেশে
সমাজ আছে কোথা।
যাদের ঘরে পয়সা আছে
আছে জমিদারী।
সব সমাজে নেতা তারা
করেন খুব সরদারী।
বক্তৃতাতে মানুষ ভোলায়
দিয়ে চোকে ধুলো—
সমাজেরই গলদ হচ্ছে
এই জানোয়ার গুলো।
নেমন্তন্নর গন্ধ পেলে
জোটেন সবার আগে
লম্বা লম্বা বুলি ছাড়া
কোন্ কাজে বা লাগে?
ডাক যদি মৃতদেহের
কর্‌বারে সৎকার।
বাঁধা বুলি শুন্‌তে পাবে
বৌ পোয়াতি তার।
কেহ বলে শরীর অসুখ,
অফিস হবে বন্ধ।
কেহ বলে সয়না আমার
মরা পোড়া গন্ধ।
কেহ বলে তাইত বটে
ভারী মুস্কিল হলো।
দিনে হ'লে যেতাম আমি
রেতে কেন মলো?
কেহ আবার চম্‌কে উঠে
কণ্টেজিয়াস্ নামে;
বোধ হয় ইনি যেতেন
ম'লে সুগন্ধি ব্যারামে।
ছোঁয়াচে ব্যারামে মরা
গরীব লোকের দোষ।
এঁদের ব্যামো হবে বুঝি
কুন্তলীন দেলখোস।

মোটামোটা বাবুর দেহ
আট যোয়ানের বোঝা—
ইঁনি ম'লে কি হবে তা
উচিত এখন বোঝা।
মর্‌বে যেদিন এসব বাবু
ছেলে যাবে ঠেকে—
উচিত এঁদের গতি করা
মুদ্দোফরাস ডেকে।
হ'তে যদি চাও হে বাবু,
সমাজেরই মাথা—
হিসেব করে কার্য্য কর
করো নাক যা' তা'।
রাত্রিকালে ওজর কর
মরা ফেল্‌তে যেতে।
ছেলেপিলে নিয়ে কিন্তু
ভোজ খেতে যাও রেতে।
'আয়রণ-চেষ্ট' আছে তোমার
খাও বটে দুধ ঘি ;
তোমার ভাল তোমাতে থাক
লোকের তাতে কি ?
ভাব্‌তে পার নিজে তুমি
মস্ত একজন 'হিরো'
সমাজের কার্য্যে কিন্তু 'ভ্যালু'
তোমার 'জিরো'।

পুরাতন চলিত কথা।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা

উকীল খোঁজে মকদ্দমা
কোকিলে বসন্ত চায়।
অগ্রদানী নিত্যি গণে
কোন্‌ দিকে কে গদা পায়॥
সাধু খোঁজে পরামর্শ
লম্পট খোঁজে বেশ্যালয়।
গোলমালেতে রেস্ত মেলে
হাটের নেড়ে হুজুক চায়।
এক ঠোকরে মাছ বেঁধেনা
সেই বা কেমন বড়শী ?
এক ডাকেতে সাড়া দেয়না
সেই বা কেমন পড়শী ?

বিনি তুফানে না' ডুবায়
সেই বা কেমন নেয়ে ?
একদিনও করেনি ঝগড়া
সেই বা কেমন মেয়ে ?

দা' ঠাকুরের বর্ষ ফল গণনা।

১৩২৭ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা

পাঁজি নিয়ে গোল বাধা'লে 'গুপ্ত' এবং বাক্‌চি,
কয়েক বছর দেখে দেখে চুপটী ক'রে থাক্‌চি।
গুপ্ত বলে রবি রাজা বাক্‌চি বলে গুরু।
আমার নিজের খাস গণনা করি তবে সুরু।
ধনীর রাজা যক্ষ মশায় মন্ত্রী কৃপণতা।
দীনের রাজা 'নাই, নাই, নাই' মন্ত্রী দরিদ্রতা।
যাদের বাড়ী প্রবেশ নিষেধ সঙ্গীন ঘাড়ে রক্ষী,
তাদের ঘরেই ঠেলে ঠুলে ঢুকবে গিয়ে লক্ষ্মী।
প্রবেশ-দ্বার যার সকল দিকে ভক্তি ক'রে ডাকে
তাদের ডাকে মা কমলা পেছন ফিরে থাকে।
এই প্রমাণে মনে মনে গণিনু এইটুকু—
সুখীর ঘরে সুখ হবে আর দুখীর ঘরে দুখ।
যাদের আয়ু ফুরিয়ে এলো এবার তারা মর্‌বে,
আয় হবে যার সেইত এবার বাক্সে টাকা ভর্‌বে
মেয়ের বিয়ে যত হবে ছেলের বিয়ে তত।
অন্নপ্রাশন হবে অনেক, শ্রাদ্ধ হবে কত।
কত লোকের গিন্নি যাবেন গৃহ ক'রে খালি,
পাকা খুঁটি কেঁচে আবার পাত্‌বে গৃহস্থালী।
কত নাড়ীর হাতের শাঁখা নোয়া যাবে খসি,
বাঁচ্‌বে য'দিন সেই অভাগী কর্‌বে একাদশী।
কত লোকের বাপ মরিবে কত লোকের ছেলে,
দু'দিন কেঁদে সব ভুলিবে পেটে অন্ন গেলে।
পরীক্ষাতে পাশ হবে কেউ, কেউ হবে ফেল,
পদের লাগি পরের পদে কেউ লাগাবে তেল।
কেহ হবে বরখাস্ত, কেউ হবে বাহাল।
কেউ কাঁদাবে, কেউ হাস্‌বে দুনিয়ার যা' হাল।
কেউ কিনিবে নূতন বিষয় কেউ করিবে বিক্রী,
কতক মামলা ডিস্‌মিস হবে কতক হবে ডিক্রী,
আদালতে হাজির হবে বাদী বিবাদীতে,
দুয়ের উকীল খুল্‌বে নজীর মামলা জিতে দিতে,
হাকিম চাবে ফাইল—ক্লিয়ার আমলা চাবে এবি,
একের যাতে লভ্য, তাতে অন্য জনের ক্ষেতি।
মফঃস্বলের দলচারী সত এডিটার
ভাব্‌বে সদা দেশের মন্দ—নীলাম ইস্তাহার।

মাল বেঁধে রেখেছে যারা বল্‌বে বাজার চড়ুক,
নিজের লভ্য হ'লেই হ'ল অন্য লোকে মরুক।
একের ভাল কর্‌তে গেলে অন্যে যাচ্ছে মারা,
এক্ষেত্রে কি করে বল ভগবান বেচারা।
সেই কারণে ভেবে চিন্তে সামঞ্জস্য ক'রে,
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিবেন সুখে দুখে গড়ে।
কি হইবে মিছে ভেবে দেহ হবে রোগা।
নসীব ভেবে থাক্‌ব ব'সে যো হোগা সো হোগা
খাদ্যাভাবে বোধ হয় এবার যাবনাকো মারা,
মহাল আমার উদর মৌজা প্রায় থাকে ইজারা,
কষ্ট হবে যদি মহাল খাসে থাকে রোজ,
ভরসা আছে পাবই পাব মরা পোড়া ভোজ,
রাজা হবার জন্যে আশা ক'রে এত কাল,
দেখলাম আমি 'যে পান্নালাল সেই পান্নালাল'।
নেহাৎ যদি উন্নতিটা করেন ভগবান ;
কচু আছি ঘেঁচু হব, বড় বাড়ি তো মান।

বনে'দী হারামজাদা।

১৩২৭ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা

বাবুদের ঘরে ক'পুরুষ ধ'রে
চাকরী খাটিয়া খাই।
খোরাক, পোষাক, দু'টাকা মাইনে
প্রতিমাসে আমি পাই।
থালা বাটি মাজি, তামাকুও সাজি,
ঘর দোর দিই ঝাঁ'ট।
বাটনাও বাটি, বিচালীও কাটি,
বহে' আনি ঘুঁটে কাঠ।
জল তুলে' আনি, পাঙ্খাও টানি,
সাফ করি আলো বাতি।
কোন কাজ হ'লে একটু কসুর,
খাই চড়, জুতো, লাথি।
কাপড় কোঁচাই, এঁটোও ঘুচাই,
বাবুরে মাখাই তেল।
পেলে কোন দোষ, বাবু করি রোষ,
বলেন খাটাব জেল।
মুনিব আমায় দিয়েছে উপাধি—
ছুঁচো, পাজি, বোকা, গাধা,
নন্‌সেন্স, ড্যাম, ষ্টুপিড, ফুলিস,
শুয়ার, হারামজাদা।

বাবু চেয়ে বাবু গিন্নিঠাকুরাণী,
নাকের ডগায় রাগ,
খোকার ন্যাকরা দেরিতে কাঁদিলে,
বলেন 'হিঁয়াসে ভাগ'।
বিধির বিপাকে বাবুর গৃহিণী,
ব্যারামে পড়িল খুব।
গু' মুত তাহার করে পরিষ্কার,
দু'বেলা দিয়েছি ডুব।
জল ঘেঁটে ঘেঁটে, দিন রাত খেটে,
নিমোনিয়া হ'ল মোর।
বলিলেন বাবু—যা চলিয়া বাড়ী,
প্রাণে আশা নাই তোর।
ইস্কুলের ছেলে গোটা কত মিলে,
বাড়ী নিয়ে গেল ধ'রে।
তারা দয়া ক'রে, দেখা'য়ে ডাক্তারে।
এ যাত্রা বাঁচা'ল মোরে।
দু'মাস বেতন আছিল পাওনা,
তাই আজ ধ'রে লাঠি,
দু'মাসের টাকা চারিটী চাহিনু,
আসিয়া প্রভুর বাটী।
বাবুজী আমায় বলিল—কামাই
বাদ দিয়া যাহা পা'স্
দিন দুই পরে, করিয়া হিসাব
মিটাইয়া নিয়ে যা'স্।
বলিনু—ব্যারামে করে'ছি কামাই,
আর করিবনা কভু।
অন্য মাসে খেটে শোধ দিব সেটা
এ মাসে কেটোনা প্রভু!
চারিটী টাকার ভারী দরকার,
পড়ে'ছি বড় অভাবে।
এখন কাটিলে পরিবার ছেলে
না খেয়ে যে মারা যাবে।
বলিল মুনিব কেমনে খাটিবি?
হাড় কয়খানি সার!
অন্য লোক আমি করে'ছি বাহাল,
তোরে রাখিব না আর।
এ হেন দয়ালু মুনিবের কাছে
এত দিন থাকি বাঁধা,
অনিচ্ছায় আজি হইল খালাস
বন্দে'দী হারামজাদা।

বাণী-চরণে

হতাশের প্রার্থনা।

বিদ্যা ফিরে নে জননি তোর।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ২৮শ সংখ্যা

বিদ্যারম্ভ হ'ল যবে মোর,
হাতে খড়ি দিল গুরু ম'শাই।
তুই মা জননী, বিদ্যাদায়িনী,
তোর পূজা আমি করি মা তাই।
তোমার কৃপায় যশের সহিতে,
চারিখানি পাশ পাইনু বেশ ;
ঘরে এসে দেখি আমারে পড়া'তে
বিষয় বিভব হয়েছে শেষ।
ছ'মাস না যেতে দেনা ভেবে ভেবে,
পরলোকগত পিতৃদেব ;
এদিকে যে আমি বিদ্যার চোটে
হইয়া পড়েছি হাফ-সাহেব।
দেনা করে টাকা পাঠাতেন বাবা—
তাহাতে কিনেছি বিলাতী বুট ;
জমি বেচে বাবা পাঠাতেন টাকা
তাহাতে খেয়েছি চা, বিস্কুট।
দেনা দেখে আমি করি নাই ভয়,
মনে মনে মোর ছিল এ বোধ—
ছ'টী মাস যদি হাকিমী করিত
সকল দেনাই হইবে শোধ।
খোসামোদ করি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
হাকিমনীর নেশা ছুটিল মোর।
পাশ করিলেই হয় না হাকিম,
দরকার সুপারিশের জোর।
হিতাকাঙ্ক্ষী যত আত্মীয় স্বজন,
যুক্তি তাহারা দিল আমায়—
পুলিশে ঢুকিলে হইবে আমার
হাকিমের চেয়ে অধিক আয়।
এম, এ, পাশ করি দারোগা হইব!
অদৃষ্টের ফের বাপরে বাপ!
আমি হ'নু রাজি বিধাতা তো নয়,
দু' ইঞ্চি কম বুকের মাপ।
বিদ্যার গরম হইল ঠাণ্ডা,
ভাঙ্গিল আমার দাঁতের বিষ—

পঁচিস মুদ্রা ভাতা নিয়ে হ'নু
কেরাণী গিরির এপ্রেণ্টিস্।
কিছুদিন পরে হইনু বাহাল
বেতন হইল পঞ্চাশৎ।
(i) আই এর ফুট্‌কি (t) টীর মাথা কাটা
ভুল হইলেই কৈফিয়ৎ।

গাঁজাখোরের গান।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩২শ সংখ্যা

মজা ক'রে খাওরে গাঁজা,
সদা মন আনন্দে র'বে।
সদা মন আনন্দে র'বে,
সদানন্দের দেখা পাবে॥
জানে ত্রিলোকবাসী লোক,
গাঁজা, গুল শোক নাশক,
যখন হবে আবশ্যক,
এই আবগারীতে গেলেই পাবে॥
আমায় বলে ছিলেন গুরু—
ভজ কল্‌কে নল মেরু,
তবে দৃষ্টি হবে সরু
নিত্য বস্তু দেখ্‌তে পাবে॥
ব'লে ভোলা বম্‌ বম্‌,
গাঁজার কল্‌কেয় লাগাও দম,
ভয় পেয়ে পালাবেরে যম
দম দিয়ে কাজ সেরে নেবে॥

এমন যে গাঁজা তা' কি ছাড়া যায়? সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারিবে কিন্তু গাঁজা ছাড়ার প্রবৃত্তি হইবে না। অনেক ভিখারী সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া যাহা পায় তাহার অধিকাংশই গঞ্জিকা সেবায় ব্যয় করিয়া থাকে।

আপনি না মজিলে পরকে কি মজাতে পার?

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা

সেলাম বাবু! কথা তোমার হাদিস বলে জানি।
যে কাজ করাও তাই করি আর সকল হুকুম মানি।
নিজে না মজিয়ে তোমরা লোককে মজাও খুব,
উপোস করে পানি খাও জলে দিয়ে ডুব।
যে কাজ করতে আমাদিগকে কর তোমারা মানা,
লেকচারেতে বল যে কাজ খোদার কাছে গোনা।

আমার বেলায় গোনা সেটা, তোমার বুঝি মাপ,
তোমার যেটা ধর্ম্ম, সেটা আমার বুঝি পাপ ?
সিগ্রেট খেতে মানা করে নিজেরাই খাও সেটা,
আমরা খেলে বল্‌তে "কিরে হারামজাদা বেটা।"
সরাপ খেতে করলে মানা তোমরা মহাশয়,
বেরাণ্ডি হুইস্কি বুঝি সরাপ খাওয়া নয় ?
বাদি কাম কর মানা করতে বল নেকী,
পরকে বল খাঁটি হ'তে নিজেই কিন্তু মেকী।
আপনি বুঝনা পরকে খুব বুঝাতে পার।
স্বদেশী হইবে যদি বিদেশী ভাব ছাড়।
মুখে এক বুকে অন্য মতলব যদি থাকে।
তা'হলে আর নেতা ব'লে মানবে কে তোমাকে ?
খবরদার, মুখ সামলে কথাগুলো কোস্।
মোদের উপর কথা বলার যোগ্য তোরা নোস্।
জানিস্ মোরা এডুকেটেড্ দেশের মোরা নেতা,
কারই অধীন নইরে মোরা নিজে স্বাধীনচেতা।
সিগ্রেট হুইস্কি খাওয়ার গূঢ় কারণ আছে,
বাধ্য নহি বল্‌তে সেটা চাষা ভূষোর কাছে।
ছোট মুখে বড় কথা ! স্পর্দ্ধা দেখি ভারী !
জাহাজের খবর নিতে চাস্ আদার ব্যাপারী ?
আমরা আছি তাইতে তোরা টিকে আছিস দেশে।
আমরা না থাকিলে তোরা উঠে গেছিস্ গাছে,
কৈফিয়ৎ চাহিতে বেটা এলি আমার কাছে।
সাহস তো তোর ভারী দেখি মোরে বলিস্ মেকী,
পলিটিক্যাল ব্যাপার তোরা বুঝিস্ কিরে ঢেঁকী।
স্বার্থত্যাগী দুনিয়ার কেউ নাইকো মোদের মত,
দেশকে ডক্টর রাসবিহারী দিয়ে গেছ কত।
মোদের কিম্মৎ বুঝবি কি তুই বেবুঝ মূর্খ বেটা,
(মোদের) চারপেয়েরই চলন এমনি বুঝে রাখিস সেটা।

তামাদী আরজী।

চৌকী নিশ্চিন্তপুর ইন্‌সাফী আদালত।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা

বাদী—ম্যালেরিয়া সিংহ বর্ম্মা,
পিতা—এনোফিলি মশা,
জাতি—ব্যাধিক্ষত্র, নিবাস-সর্ব্বত্র,
মানব ক্ষয়-ব্যবসা।

বিবাদী—কাঙ্গাল, অভাগা দিগর,
মা বাপ নাহিক কেহ,
জাতি—দীন দাস, পেষা-উপবাস,
নিবাস—দুর্ব্বল দেহ।
সরিক বিবাদী—বিসূচিকা ব্যাধি,
বসন্ত ও নিমোনিয়া,
যক্ষ্মা কাস ক্ষয়, রক্ত আমাশয় ;
উপদংশ, গণোরিয়া,
অন্নবস্ত্রাভাব, ডাক্তরের চাপ,
মেয়ের বিয়ের পণ,
জলে ডুবে মরা, কেরোসিনে পড়া,
আরও আছে কতজন।
দাবি পরিমাণ—গরীবের প্রাণ,
কড়ার অধিক নয় ;
ব্যবত খাজনা। বাদীর বর্ণনা—
নিম্নে দিনু পরিচয় :—
(১) এই আদালত এলাকাস্থিত
ডিবিজান মরাঘাটী,
পরগণে ঝিল তরফ মুস্কিল,
মৌজে বাঁশ বাঁধা পাটী।
নিম্নের লিখিত তার,
চৌদ্দ পোয়া জমি জীবন জমায়
বিবাদী দখলিকার।
(২) পূর্ব্বোক্ত মৌজায়, পনের আনায়
মৌরসীদার বাদী,
সরিকগণের এক আনা অংশে
স্বত্ব শুধু মেয়াদী।
বাদীর অংশের খাজনাদি সব
পৃথক আদায় হয় ;
(ক) তফশীল মত বাদীর অংশে
বাকী আছে সমুদয়।
তলব তাগাদা সঙ্গতি সত্ত্বেও
নষ্টামি ক'রে বিবাদী,
দিবে ব'লে ফাঁকি রাখিয়াছে বাকী
মায় সেস খাজনাদি।
(৩) আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্রে
আদায়ের প্রথা মতে,
উক্ত মৌজায় নালিশের হেতু
ঘটিয়াছে কিস্তি গতে।
(৪) সরিকগণ ও বিবাদীর কাছে
চেষ্টা করিয়া বাদী

জানিতে পারেন নি সরিকের বাকী
সঠিক সংবাদাদি।
১৪৮ (ক) ধারার মতে
সরিক বিবাদীগণে
মোকাবিলা করি হুজুরাদালতে
এ নালিশ সে কারণে।
(৫) বাদীর প্রার্থনা ঃ—(ক) বাদীর খাজানা
ডিক্রী হয় সুবিচারে,
মুলতবী কালের সুদ সহ যেন
উক্ত ধারা অনুসারে।
(খ) মোকাবিলাগণ বাদী হ'য়ে যদি
হিসাব দাখিল করে,
অতিরিক্ত কার্টফি দিতে রাজি বাদী
সংশোধিত দাবি ধ'রে।
(গ) সম্পূর্ণ খরচার ডিক্রী পাইতে
বাদী হন হকদার,
আইন ইকুইটী মতে যেন পায়
অন্য সব প্রতিকার।

তফশীল হিসাব (ক)

খাজনা—জীবন-ধন,
সেস—পুত্র পরিজন,
সুদ—তার যা কিছু সঞ্চিত।
চৌহদ্দী।
উত্তরেতে রুক্ষ্ম কেশ,
দক্ষিণেতে পাদ দেশ,
পুর্ব্বে প্লীহা পশ্চিমে যকৃৎ।
সত্যপাঠ।
আমি ব্যাধি ম্যালেরিয়া প্রকাশ করিনু এই—
আর্জির লিখিত যত তথ্য।
জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে স্বাক্ষরিনু আদালতে
সব মিথ্যা কতকাংশ সত্য।

সন ১৩২৭ সালের ৩১শে চৈত্র তারিখে
প্রকাশিত।

তামাদি আরজির জবাব।

১৩২৮ সাল ৭ম বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা

কাঙ্গাল বিবাদী পক্ষে লিখিব বর্ণনা।
সানুগ্রহে গ্রাহ্য হয় বিনীত প্রার্থনা॥

আরজি উক্ত দাবী বিবরণ আদি
সমুদয় অস্বীকার,
(বাদীর) বর্ত্তমান আকারে মামলা করিবারে
নাহি কোন অধিকার।
(ক) পক্ষাভাব দোষে দুষ্ট এ নালিশ
নাহি পারে চলিবারে,
শুধু আমি নয় ষড়রিপুচয়
এ জমি দখল করে।
পঞ্চ ভূতাত্মক এ দেহের মাঝে
তারাই মালিক খাঁটী।
আমিত কেবল তাদের অধীনে
ভূতের বেগার খাটি।
বাদীর পিতৃবংশ করিয়া ধ্বংশ
বাদী স্বত্ব করে শেষ।
সেই কর্ত্তপক্ষ আবশ্যক পক্ষ
(ইথে) নাহিক সন্দেহ লেশ।
(খ) বাদীর প্রধান সরিক প্লীহা ও যকৃৎ
কালা জ্বর বাত ব্যাধি,
তাদের ছাড়িয়া হইবে বিচার
এ কেমন হয় বিধি।
আশি লক্ষ জন্ম করি অসাধ্য সাধন
অমূল্য মানব জন্ম পেয়েছি এখন।
অমূল্য জীবন দারাপুত্র পরিজন।
এর দাবী ক্ষুদ্র শক্তি নিম্ন আদালতে।
বিচারের অধিকার নাহি কোন মতে॥
মৌরসীর স্বস্ত বাদী কেমনে পাইল,
কেবা উর্দ্ধতন রাজা কেমনে বা দিল,
বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমূলাধার,
মানবাদি সর্ব্বজীব প্রজা হয় তাঁর।
দুষ্টের দমন হেতু সমান রাজায়,
দেছেন পত্তনি স্বস্ত যথায় তথায়।
শমনের আজ্ঞা বহ ভৃত্যমাত্র তুমি।
বিনা অধিকারে বাদী কেন হ'লে তুমি॥
(কিন্তু) জগদম্বে মোর রাজা
আমি খাস তালুকের প্রজা।
আমাতে বাদীর নাহি কোন অধিকার।
সুপ্রসিদ্ধ চিত্রগুপ্ত অতি বিচক্ষণ
অভ্রান্ত হিসাব যার না হয় খণ্ডন।
যাহার যা বাকী আছে পাবে সব তার কাছে
জমা ওয়াশীল বাকী করচা হিসাবে
আমার নামের বাকী কিছু নাহি পাবে॥

সৰ্ব্ব-জ্বর-হর মা'র এলাকা ভিতরে,
করি বাস মুক্ত ত্রাস সানন্দ অন্তরে।
আমার জীবন ধন দারা পুত্র পরিজন
সঞ্চিত সকল মম সহ কর্ম্মফল।
মাতৃ-পদে সমর্পণ করেছি সকল ॥
যুগ যুগান্তর হতে মাতৃ রাজ্য মাঝে,
সাবেক যা বাকী ছিল, সে অঙ্ক মা শূন্য দিল
করুণাময়ী মায়ের এতই করুণা
বাকী খাজনার দাবি আদৌ চলে না ॥
সমন শঙ্কিত সদা মায়ের শাসনে
শমন কিঙ্কর তুমি ভয় নাহি মনে।
আমারে ধরিতে চাও যাও পলাইয়া যাও
উঠলে মায়ের কানে হ'বে অপমান
সময় থাকিতে তুমি হও সাবধান ॥
বটে আমি দিন দাস, পেষ উপবাস
এ দুর্ব্বল দেহে আমি করি বসবাস।
বিশ্বমাতা বিশ্বপিতা হন মোর মাতাপিতা
ভক্তির কাঙ্গাল বটী নহি হীন বল।
হরিনাম মহামন্ত্র আমার সম্বল ॥
তুমি ম্যালেরিয়া সিংহ সাঙ্গোপাঙ্গলয়ে
বল কি করিতে পার মোব বাদী হয়ে।
সিংহবাহিনীমার শুনিলে রে হুঙ্কার
সমন পলায় দূরে, তুমি কোন ছার।
আমার এ দেহ মা'র পূর্ণ অধিকার ॥
স্বভাবতঃ মন তুমি লোভাকৃষ্ট চিত্ত,
লয়ে দাবি উঠাইয়া যাও দূরে পলাইয়া
দয়াময়ী মার মোর আছে অনুমতি,
খরচের দায় হতে দিনু অব্যাহতি।
হউন প্রসন্ন কালী কালীপদ ভণে,
চূড়ান্ত বিচার হবে মায়ের সদনে।
আর্জী জবাবের কথা অমৃত সমান,
দ্বিজ কালীপদ কহে শুনে পুণ্যবান।

খেয়া।

('অকূল ভব সাগর বারি পার হবি কে আয়রে আয়' সুরে)

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

ভাঙ্গা নায়ে গঙ্গাবারি পার হবি কে আয়রে আয়।
কাণায় কাণায় বামাই নিয়ে ক্ষুদ্র তরী ভেসে যায় ॥

সর্ব্ব জীবে সমান দয়া,
উচ্চে তুচ্ছে প্রভেদ নাই ॥
ঘোড়া মহিষ মানুষ গরু,
পার হবি সব এক খেয়ায়।
বিনা কষ্টে বেয়ারিং পোষ্টে,
সজ্ঞানে কে গঙ্গা যায় ?
ভবের লীলা সাঙ্গ হবে,
এড়াবি সব যন্ত্রনায় ॥
দেব দ্বিজে ভক্তি রাখ তাই,
জয় কৃষ্ণ বল রসনায়।
দিব্য চক্ষে যুগল মূর্ত্তি,
দেখবি পারের কি নারাদ ॥
রাত্রিকালে পাপী যাত্রী,
পারে যেতে বৃথা চায়।
মিছামিছি চেঁচাচেঁচি,
করে শেষে ফিরে যায়' ॥

খবরদার ! মা !

(সুরব উদ্ধারের—'আপন বুঝে চল এই বেলা' সুরে)
১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যা

সাবধান হ'য়ে আসিস্ মা তারা।
লক্ষ্মী-ছাড়ার দেশে এবার গো
আস্তে হবে লক্ষ্মী ছাড়া।
কয়েক বছর হয়নি দেশে ধান,
অন্নাভাবে বুঝি লোকের
থাকে না আর প্রাণ—
মা লক্ষ্মীরে হাতে পেলে গো
কর্‌বে সব বুঝা পাড়া।
বাণীরে মা আনিস্ না মোটে,
পাশ করার দল পেলে তারে
কাট্‌বে এক চোটে—
তার বিদ্যেতে চাকরী হয় না আর
তাই 'ড্যামেটসুট' কর্‌বে তারা।
সিদ্ধিদাতা শ্রীগণপতি,
দেশের লোকে মোটেই খুসি
নহে তার প্রতি—
কোন কাজে দেয় না সিদ্ধি আর
শুধু দেখবে কি তার শুঁড় নাড়া।

কার্ত্তিক যদি সঙ্গে তোর থাকে,
সেজে যেন আসেন তিনি
খদ্দর পোশাকে—
নইলে ননকো—দলের টিট্‌কিরিতে গো
হ'তে হবে দেশ ছাড়া।
নিজেও এসো হ'য়ে হুসিয়ার,
বিনা পাশে এনোনা মা
অত হাতিয়ার
জানিস্‌ তো মা মোদের দেশে গো
'আর্মস্‌ এক্ট' ভারী কড়া।
অসুরটার আর কাজ নাই যা এসে
তারে আন্‌লে পড়বি মাগো
'এক্সটর্সন কেসে'
নিতে এসে পূজা দশভূজা মা
পরবি দশ হাতে পাঁচ হাতকড়া।

একাদশী রিহার্সাল।

(কীর্ত্তন।)

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

বৃদ্ধ—বুড়ো কহে আসি,
দেখনা প্রেয়সী,
এনেছি কেমন মালা।
তরুণী—ভোগ বিলাসে
রুচি নাহি আসে,
দিও নাকো মোরে জ্বালা॥
বৃ—যা' আছে আমার,
সকলি তোমার,
বাড়ী ঘর জমিদারী।
ত—সুখী হ'তাম আমি,
যদি হতো স্বামী,
কাঙ্গাল দীন ভিখারী।
বৃ—মা বাপ তোমার
নিয়েছে আমার
হাজার টাকার থ'লে।
ত—মরি সেই ক্ষোভে
তুচ্ছ অর্থ লোভে,
কন্যারে ফেলেছে জলে।

বু—দশ খান গাঁয় ;
খুঁজে দেখ নাই
কেহ রায় বাহাদুর।

ত—শুধু নহে তাই,
কম দেখা যায়,
হেন বুড়ো কামাতুর।

বু—কলপ লা'গায়ে,
দাঁত বাঁধাইয়ে,
যুবা হনু একদম।

ত—(যদি) আমি অভাগিনী
যুবা বলে মানি,
মানিবে কি তাতে যম ?

বু—দুই দিন ধ'রে,
আছ অনাহারে,
কেনবা মাখনি তেল ?

ত—বৈধব্য ভাবিয়া,
রাখিতেছি দিয়া,
একাদশী রিহার্সেল।

ইলেকসনে বিপরীত রীত।

১৩৩১ সাল ১১শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা

দ্বিজ নন্দন চন্দন পুষ্প করে,
অতি হীন জনে ধরি তুষ্ট করে।
কত বিপ্র কুলোদ্ভব বর্ণ গুরু
এক ভোট তরে ধরে শূদ্র উরু।
ধরি বিপ্র পদে নত শূদ্র কহে,
ছি ছি কী কর ঠাকুর কী কর হে
নতজানু হয়ে মম জানু ধরি
তব সূত্র-শিখা অপমান করি,
ইহকাল তরে পরকাল দিলে,
প্রভু হীরক ফেলি ছি কাচ নিলে !
কত অট্টালিকাবাসী পাট্টাধারী।
চলে বিদ্বান উদ্যান-পাল বাড়ী।
কত শিক্ষাভিমানীরা ভিক্ষা করে,
চলে লক্ষপতি দীনে লক্ষ্য করে'।
ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দে যে ত্যানা কহে,
বলে তেনু কাকা বাড়ীতে আছ হে ?

যিনি তস্কর দলপতি দৈত্য গুরু,
তিনি বাক্য দানে আজি কল্পতরু,
ঠেলি নন্দমাকন্দমে অর্দ্ধ রাতে,
কত মন্দ জনে ফিরে ফন্দ হাতে।

ক্যানভাসার।

('আমার মন যদি যায় ভুলে'—সুরে।)

১৩৩৩ সাল ১৩শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

আমি পরের 'ক্যানভাসার'।
পরের জন্য পরের কাছে করি কান্না সার।
পরে দুধে চুমুক দিবে বাটী যোগাই তার।
আমি পরের জন্যে চিনি বহি, ঘাস আমার আহার।
মানুষ বলে যে মানুষকে করিনি 'কেয়ার'।
আজ নিরেস লোককে সরেস করা ব্যবসা আমার।
পরার্থ-পর আমার মত কজন আছে আর।
পরে দিতে পদ ধরি পর পদ পর মোর সারাৎসার॥
ঘৃণা, লজ্জা, কুল, মান করিয়াছি পরিহার।
আমি অক্রোধ পরমানন্দ বিনয়ের অবতার।
কার্যটি হাসিল হয়ে গেলে তখন কেবা কার।
দিব্য চক্ষে স্বরূপ আমার দেখবে পরিষ্কার॥
কবি বলে, দালাল তুমি, তোমায় চেনা ভার,
তোমার পেটের জন্য ব্যবসাদারী,
পেট মহাভাণ্ডার॥

নূতনের ইন্দ্রজাল।

(অকাল বৃদ্ধস্য)

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

ওরে নূতন যা' কিছু তারই পিছু পিছু
জগত ছুটিয়া মরে,
কাঁচা বয়সের তরল চাহনী
মরি রে কি গুণ ধরে।

ওরে যার লাগি—
অশীতি বরষে খুলিয়া হরষে
জীবনের হালখাতা,
বৃদ্ধ ন্যুব্জ কোঁকড়া-কুব্জ
তারও যে দোকান পাতা।

দেখ   নব পঞ্জিকা আর কাঁচা আম
নতুন শ্বশুর-বাড়ী,
আবার   নবীন অধরে গোঁফের রেখাটি
নধর টিকন দাড়ী।
এই   অকাল-বৃদ্ধ আমাদের কাছে
নতুন সবই রে মিঠে ;
গিন্নীর হাতে মনে কর প্রাতে
প্রথম আহাহা—পিঠে !
স্মর   প্রথম জ্বরের কাঁপুনীর সুখ
প্রথম কন্যাদায়,
আপিস-ফেরতা নতুন জুতোর
প্রথম ফোস্‌কা পায়।
আহা   আষাঢ়ের দিনে প্রথম বরষা
পৌষেতে লেপ-মুড়ি,
মরি   বনময় কুহু মনময় উহু
ফাগুনে আশার ঘুড়ি।
সেই   গ্রীষ্মে প্রথম ভুঁড়ি বেয়ে ঘাম
প্রথম বিরহ-জ্বালা,
আর   বোসেদের ওই কানাচের আড়ে
সিক্তবসনা বালা !
ওরে   নতুন যদি না হ'তো পুরাতন
রহিত রে নিতি নব,
র'তো   শ্যালিকার ফটো রাতুল চরণে,
নিত্য নূপুর-রব ;
আহা   গিন্নীটি যদি হ'তো নিরবধি
চেলি ঢাকা নববধূ,
আর   পাশের বাড়ীর মেয়েরা থাকিত
ঘোলায় থম্‌কে শুধু।
কভু   নিবিত না হৃদি-হুঁকোয় আগুন
জ্বলিত প্রেমের টিকে,
নতুন নতুন বৌ মিলে, মানে
নতুন নতুন নিকে।
যদি   বয়স পঁচিশ না হ'তো রে ত্রিশ
প্রাণে র'তো তানানানা,
হ'তো   তা হ'লে চরম কি মজা গরম
জীবন খুন্ডানিদানা।

নারী স্বাধীনতায় সাফল্যের নমুনা।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

কত দরবার চলে আসছে
কত কাল ধরি—।
কিসে মিল্‌বে স্ত্রী-স্বাধীনতা
পর্দা যাবে সরি॥
গৌরবিল, প্যাটেলবিল,
আটালবিল কত।
কেউ সধবা, কেউ বিধবা
অসবর্ণ সম্মত॥
মাথা খুঁড়ে চীৎকার ক'রে
চাইচে আইন পাশ।
আইনের পূর্ব্বেই বাছাদের কিন্তু
পোড়চে গলে ফাঁস॥
নমুনা কিছু দেখে যান—
স্ত্রী-স্বাধীনতা কামী।
এর উপরেও কত আছে—
জানেন অন্তর্য্যামী॥
স্নান সেরে দিন দুপুরে
ফিরছিনু গঙ্গা হ'তে।
নারী করে ক্ষৌর কার্য্য
বসে রাজপথে—॥
চোখ চাইতেই অবাক হ'নু
মাথা গেল ঘুরি।
বেশ ভূষাতেও সন্দ হ'লো,
পুরুষ কিম্বা নারী॥
ব'সে নারী গামছা পরি—
অন্য গামছা বুকে—।
অসঙ্কোচে রাজপথেতে,
ক্ষৌরি হচ্ছেন সুখে॥
বাঁ হাতখানি দে'ছেন ধনী,
উর্দ্ধ শীর্ষ করি—
(যেন) আশীষ ও অভয় দিচ্ছেন
নাপিতের শিরোপরি॥
তেল মালিশেরও হুকুম হবে কিনা
নারিনু বলিতে।
দাসত্বের টান বাধ্য কর্‌লে
আমাকে চলিতে॥
থাকতেন যদি কালিদাস,
দেখতেন নারীর এ কাণ্ড।

লিখতেন নিশ্চয় রসকাব্য,—
হাসাতেন ব্রহ্মাণ্ড ॥
বিশ্বনাথ হ'য়েছেন পাথর—
এদেরই ব্যাভারে—
দারুমূর্তি জগন্নাথ
সামাল দিতে নারে ॥
গণেশ ঠাকুর দাঁত ভেঙ্গেছেন,
রাগে কামড়ায়ে গা।
কার্তিক ঠাকুর ব'লেন আইবুড়ো
এঁটে উঠবেন না ॥
আধুনিক বাবুদের দশাও
দেখছি সাপ্তাহিকে।
সাত পাকের ছেড়ে পতি,
অন্যে ব'য়েছেন সুখে ॥
এখনও বাবু অনেক বাকী
সবুর দাও কিছুকাল।
প্রেম সমুদ্রে চুবুনি খেয়ে,
হওনি তো নাকাল ॥
রান্না করবে, বাসন মাজ্‌বে,
বুদস করবে সু—।
ধোপার পালাও নিতে হবে
তখন বুঝবে হু ॥
সাফ লিখতেছে পত্রিকায়
পতি পিতা কেউ নয়।
শাস্ত্রশাসন, পক্ষপাত, খোদ
খোদাহই বিবেক কয় ॥
বিয়ে করি, নিকে করি
করি স্বেচ্ছা বিহার।
কারুর কিছু বলবার নেই
উপরে মো সবার ॥
কর্মফলে জন্ম পেয়েছি,
অংশী নাই কেউ তাতে।
পিতামাতা দেহের স্রষ্টা
বলে বেকুবেতে ॥
"যেই পালে সেই পতি"
পিতামাতা কেউ নয়।
পঞ্চভূতে জগৎ সৃষ্ট,
শাস্ত্র ডেকে কয় ॥
"বেপরোয়া চল্‌বো এখন"
লুটবো ভবের মজা !

শরীর ধারণ সার্থক কোরবো,
ধ'রে প্রেমের ধ্বজা ॥
চলে নদী স্বাধীন ভাবে
বাধা না মানে কিছু।
চলে বৃক্ষ উর্দ্ধে বেড়ে
যায় না স্বভাবে নীচু ॥
চলে পক্ষী স্বাধীনভাবে
অনন্ত আকাশে।
আমরা কেন থাকবো বাঁধা,
পুরুষদের নাগপাশে ॥
থাকে থাকুক পুরুষগুলো
মোদের প্রেমে বাঁধা।
স্বেচ্ছামত খাটিয়ে নেবো,
যেমন ধোপার গাধা ॥
অফিস করবো, স্কুল করবো,
চড়বো গাড়ী ঘোড়া।
পুরুষরা সইতে নারে তো,
রাস্তায় না বেরোক ওরা ॥
কোন্ আক্কেলে আপত্তি তোলে,
আমরা কি ওদের সৃষ্ট।
(বরং) প্রকৃতিই সৃষ্টিকর্ত্রী,
শাস্ত্র বলে স্পষ্ট ॥
সে হিসেবেও তো মোদের আদেশ,
বাধ্য ওরা মানতে।
না মানে, চুপ থেকে যাক,—
কে বলে নাকি-সুরে কানতে ॥
নববিদ্যার নব্যালোকে,
কি দেখছো নবীন জ্ঞানী।
শ্রীমুখখানি শুক্নো কেন ?
তালাক দেছেন কি রাণী ॥
এখনও বাছা, সময় আছে,
সেঁটে ধর হাল।
নদী ছেড়ে সমুদ্রে গেলে
হইবে নাকাল ॥
শাসনে রাখিতে নীর—
পিঞ্জরে সিংহিনী।
গহন বনের মালিক হ'লে
কি হবে না জানি ॥
মরণ যদি সার কোরে থাক,
ছেড়ে দাও কান্তারে।
অন্যথা রাখিহ বেঁধে
নইলে ভাসিবে পাথারে ॥

কাবুলী মেওয়া।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

কাবুলীর পিরীতির
নমুনা দেখ—
ঠেকিয়া শিখোনা
দেখিয়া শেখ।
প্রথমে মিঠি মিঠি
বাৎ ভারী ঠাণ্ডা,
শেষে ভাগ্যে
লম্বা ডাণ্ডা।
এরা বোধ হয়
জ্যোতিষ জানে।
জলে ডুবিলেও
ধরিয়া আনে॥
যদি কেহ বা
মরে অনাহারে।
তার চেয়ে মৃত্যু
ইহাদের ধারে॥

সেদিনের কতদিন বাকি আছে আর।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাতে
ভারতবর্ষ ভাণ্ডটা।
মুক্ত হ'তে যুক্তি ক'রে
করছে কেমন কাণ্ডটা॥
ভাঁড়ের তলায় জ্বলছে আগুন
অসহযোগ আন্দোলন।
হিংসাপূর্ণ অহিংস সব
ভাবছে সবাই মন্দ নন॥
কেহ বলে পূর্ণ কর
অনুন্নতের আবেদন।
শ্রমিকের আকাঙ্ক্ষা পুরাও
মনের মত পাবে ধন॥
কেহ বলে উদ্ধারিতে
দেশের মত পতিতায়।
ধর্মপত্নী কর তাদের
বল কিবা ক্ষতি তায়?

কেহ কেহ আঁকড়ে ধরে
অস্পৃশ্যতা বর্জনে।
সভায় লাগায় বক্তৃতা জোর
গগনভেদী গর্জনে॥
কারো লক্ষ্য কেবলমাত্র
হিন্দু-মোশ্লেম একতায়।
'এক্সপেরিমেণ্ট' ক'রে বোঝ
কত মূল্য এ কথায়॥
কেহ বলে—মুক্তি আছে
নেমাজ রোজা আহ্নিকে।
বল্‌তে পার দেশের রক্ত
এক চুমুকও খাননি কে?
বাহিরেতে স্বদেশ-ভক্ত
ভিতরে সে গোয়েন্দা।
কঙ্গরসের রেস্ত মেরে
তৈয়ের করেন 'এজেণ্ডা'॥
পোনে পাঁচে জিনিস কিনে,
দর ফেলে পাঁচ টাকাতে।
বল দেখি তফাৎ কত
এঁতে আর ডাকাতে?
জাগিয়ে দিতে হবেই হবে,
অধীন দেশের সুপ্ত-নর।
প্রকাশ্যেতে দেশের নেতা
অন্তরালে গুপ্ত-চর॥
কেউ টানিছে জেলে ঘানি,
কেউ তুলিছে তিন-তলা।
কারো ভাগ্যে ফিষ্টি 'ডিনার'
কারো কঠিন দিন চলা॥
"স্বরাজ" না হয় "শবরাজ" এসে
ফেল্‌বে ভেঙ্গে ভাণ্ডটা।
বেঁচে থাকতে পার যদি
দেখতে পাবে কাণ্ডটা॥

রায়-বাহাদুর-রঙ্গ।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

যে যেখানে ছিল ছুটিয়াছে সব
রাজপথে দলে দলে,—
বৃদ্ধা ঘোটকী ডিম পাড়িয়াছে
রাজার আস্তাবলে।

সহিসের দল ছুটিয়া চলিল
রাজার আদেশ নিয়ে,
রাখিয়া আসিল অশ্বডিম্বে
গাধার গোয়ালে গিয়ে!
গর্দ্দভ-দলে তা দিয়া তা দিয়া
বাহির করিল ছানা,—
শ্রবণ থাকিতে বধির সে যেন
চোখ থাকিতেও কাণা।
মানুষের মত কতক আকার,
দুটি পা ও দুটি হাত
ল্যাজ নাড়ে আর বসে' বসে' চাটে
অপরের এঁটো পাত।
জানোয়ারী মাসে রটি গেল সব
সদর অন্তঃপুর—
রাজার আদেশ—এ জানোয়ারের নাম
"রায়-বাহাদুর।"
চোখের দৃষ্টি ফুটিল না তাই
যত রাজ-পারিষদে
চ্যাং-দোলা করে' রায় বাহাদুরে
স্থাপিলা রাজার পদে।
এ হেন রাজার পাদুকা প্রণত
রায়-বাহাদুর প্রতি,
মৎলব-ভরা ভালোবাসা তাঁর
দিনে দিনে বাড়ে অতি।
রাজা আপনার চশমা খুলিয়া
পরাইল তার নাকে,—
রাজার চোখের দৃষ্টি ফুটিল
রায় বাহাদুর-আঁখে।
কারো 'পরে যদি রাজ-রোষ পড়ে
তার চেপে যায় গোঁ,
রাজা যদি কভু বাজায় সানাই
অমনি সে ধরে পোঁ।
রাজার স্বার্থ-দৃষ্টি ঘুরিছে
মহকুমা হ'তে জিলা,
হেরিবারে এই গোঁ-ধরা পোঁ ধরা
রায়-বাহাদুর-লীলা।

রাজ-কাছারীর গোমস্তা আর
কোতোয়াল-পা'ক-দলে,—
রায়-বাহাদুরে পথে নিয়া ঘুরে
বকলস্ আঁটি গলে।

রায়-বাহাদুর বলে জনে জনে
"শোনো, আমি বলি যা যা—
মোর নাচ হবে রাজ-কাছারীতে
নিজে নাচাইবে রাজা।
তালিম নিয়েছি এ নাচ নাচিতে
রাজার গানের তালে,
নিজ হাতে নিজ ল্যাজ মোচ্‌ড়ায়ে
চলিব চোরের চালে।
নিজে হব পুন পাহাড়াওয়ালা
দেখাবো কের্‌দানীটে,
চড়িব কভু বা সঙ্গী আমার
রামছাগলের পিঠে।"
সকলে বলিল—"ও-নাচ তোমার
আর না দেখিতে চাই,
সে-বারের নাচে যে কামড় দিলে
এখনও তা ভুলি নাই।"
সব কথা শুনি রায়-বাহাদুরে
ক্রুদ্ধ নৃপতি কহে—
ও-নাচ না বলি, কেন বলিলে না—
এবারে সে নাচ নহে ?
হয়-তো তোদের ছেলেদের গায়ে
তোমার দাঁতের দাগ
এখনো দিতেছে সদাই জানায়ে
সবার মনের রাগ।
এতটুকু তব বুদ্ধি কি নাই,
মগজে গোবর পোরা,
মাটী করে' দিলে সব মৎলব,
পচা-পুকুরের ঢোঁড়া !
তুমি বোকা, তুমি বাঁদর,
তুমি যে গর্দভ টিক্‌টিকী।"
"যে এঁজ্ঞে প্রভু, যে এঁজ্ঞে প্রভু,
যে এঁজ্ঞে প্রভু, ঠিকই।"
"মোর কথা শুন, বল গিয়া পুন
জ্ঞানের কদলী-গাছ '
কামড়ের নাচ নহে গো এবার,—
এবারে পুতুল নাচ।

রাজা গেল চলি। রায়-বাহাদুর
একাকী ক্ষুণ্ণ চিতে ;
পার্শ্বে পড়িয়া রাজ-পাদুকার
পরিত্যক্ত ফিতে।

হজম করিয়া গালাগালি সব
ভিতরে করিয়া মিঠো,
রায় বাহাদুরো উঠিল রাজার
কথায় মারিয়া ditto.
পুন গেল গ্রামে,—চেহারা দেখেই
ছোঁড়ারা উঠিব ক্ষেপে,
একজোট হয়ে রায়-বাহাদুরে
সকলে ধরিল চেপে।
ঘ্যাঁচ করে' তার ল্যাজ কাটি দিল
রাস্তার সবে ছেড়ে,
তার জানোয়ারী নিশানা ঘুচিল,
হঠাৎ হইল বেঁড়ে।
আশে পাশে "বেড়ে রায়-বাহাদুর"
শুনিয়া সে চটে কাঁই—
কি নাচ নাচাবে রাজা আর তারে—
নাচাইছে ছোঁড়ারাই!

"দেবী দরশনোত্তরম্।'

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

দুয়ারে দাঁড়ায়ে বালা
ক্রোড়ে শিশু হাতে ছাগী।
চমকি থমকি দেখি
হিয়া তার অনুরাগী।
শ্যামসুত কাণে কাণে
অমনি কহিয়া গেল—
দেখিছ কি ওরে মূঢ়,
সময় বহিয়া গেল।
আশে পাশে চেয়ে দেখি
পথে জন কেহ নাই।
আকুল হিয়ার বেগে
ছুটে গেনু দ্রুত পায়।
কখন ছুটিল নেশা,
কি যে হ'ল মনে নাই।
পিঠেতে বেদনা বড়
উঠিতে শকতি নাই।
বুঝেছি লাঠির ঘায়ে
চেতনা হ'য়েছে মোর
দেবী দরশনে আসি
সেজেছি ছাগল চোর।

কস্যচিৎ অর্বাচিনস্য।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

উড়তে শিখান।

লজ্জা ছিল সজ্জা যাহার
পর্দা মাঝে ঠাঁই।
হায় অসভ্য হিঁদুর মেয়ে,
ফ্যাসান শিখ নাই।
সাহেবী ভাবেতে ভাবুক,
নকল নবীশ বরে,
বিয়ে দিলেন পিতামাতা
টাকা খরচ ক'রে।
ওয়াইফকে শিখাতে চান
নব্য 'এটিকেট'।
ঘোমটা খলে মুখ দেখাতে
লাজে মাথা হেঁট।
আগুলফ-লম্বিত-কেশ
কাঁচি দিয়ে কেটে,
'বব্ড্ হেয়ার' কর্‌লো বাবু
নূতন 'এটিকেটে'।
চুলগুলোকে ঠুঁটো দেখে
বল্‌ছে বাবু—'গ্র্যাণ্ড'।
'ফ্রেণ্ড' এলে শিখিয়ে দিল
কর্‌বারে 'সেক-হ্যাণ্ড'।
পাণি-গ্রহণ ক'রে, ছোঁয়ায়
বহু লোকের পাণি
ক্রমে ক্রমে ফুটলো শেষে
বোবার মুখে বাণী।

উড়োন শিখেছে।

বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না
স্বভাব ছিল আগে।
এখন কথায় ফুট্‌ছে খৈ,
তুবড়ী কোথা লাগে?
অবাধে আজ সবার সনে
কর্‌ছে মেশামেশি,
(এখন) কর্তার 'ফ্রেণ্ড্' গোটাকত
গিন্নীরই 'ফ্রেণ্ড্' বেশী।
বাধে না আর পুরুষ সনে
এক টেবিলে খাওয়া,
'ফ্রেণ্ড্' সনে এক মোটরে
হাওয়া খেতে যাওয়া।

আজকে 'ডিনার', কাল 'টিপার্টি'
পরশু প্রীতিভোজ।
থিয়েটার ও বায়স্কোপে
'এন্‌গেজ্‌মেণ্ট' রোজ।
স্বামী যদি সঙ্গে চলে
'অব্‌জেক্‌সন্‌' তাতে।
বলে—বাসায় কে থাক্‌বে?
আস্‌বো না আজ রাতে।
কি গো বাবু! ফ্যাসানের আর
আছে কিছু বাকি?
পোস মানে কি নিজের হাতে
শিকলী-কাটা পাখী!

স্বদেশী নেতা।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

স্বদেশের নেতা হইয়াছি মোরা
শিখেছি স্বদেশী চাল।
খদ্দর মোরা পরি বা না পরি
ইংরেজে দিই গাল॥
সাহেবের দয়া লাগিয়া মোদের
জিভ লিক্‌লিক্‌ করে।
দয়া করি যদি কোনো কথা কয়,
হৃদয় যায় যে ভ'রে॥
সিংহের মত করি গর্জন
বাক্যে আগুন ছুটে।
বর্জন সভা আহ্বান করি
বাহবা লই যে লুটে॥
সভার অন্তে সাহেব চরণে
পুনঃ হই সমাবেশ।
বাহিরে আমরা বড় তেজীয়ান
ভিতরে আমরা মেষ॥
সাবধানে চলি, জান ত হে ভায়া
কঠিন এ দেশ কাল।
স্বদেশের নেতা হইয়াছি তাই
শিখেছি স্বদেশী চাল॥
লাহোরের জেলে মরিছে যতীন
লোকে করে "হায় হায়"।
সহরে সহরে বেদনা জানায়ে
যেদিন দুঃখ গায়॥

আমরা সেদিন সাহেবে তুষিতে
খাড়া করি pic-nic.
হাতা বেড়ী নিয়ে ছুটে যায় ভায়া
করে দিই সব ঠিক ॥

আমাদের তেজ দেখেছ ত সবে
ভীষণ ননকো কালে।
চমকাও কেন ? এ নূতন রূপ
হোয়েছে মোদের হালে ॥

জীবনে যদিও জানিনা কখনো
সঙ্গীত বলে কারে।
কণ্ঠে কোকিল জাগিল,—
সাহেব বলিল যে বারে বারে ॥

সুভাষ কহিছে "রবিবারে সভা কর"
একি জঞ্জাল !
pic-nic মাটি হইবে যে ভায়া
দেখালে স্বদেশী চাল !

সাথে আমরাও যদি
ব'সে করি উপবাস।
স্বরাজ তা'হলে কেমনে হইবে ?
হইবে সর্বনাশ ॥

তাই ত আমরা হোতেছি জোয়ান
মন খুলে গান করি।
পোলাও মাংস মৎস্য মিঠাই
কণ্ঠ অবধি ভরি ॥

সুভাষের কথা শুনিয়া লাভ
সাহেব যদি গো ডাকে।
বাহিরে স্বদেশী, মন তবু সদা
কোনখানে পড়ে থাকে ?

ইউনিয়ন বা লোকাল বোর্ডের
আসিলে ইলেক্‌সন্‌।
কংগ্রেসী মোরা বলিয়া কেমন
বেড়াই যে ঘন ঘন।

সকলের মন ভুলাইয়া দিই,
দিওনাক তাই গাল।
স্বদেশের নেতা হইয়াছি মোরা
শিখেছি স্বদেশী চাল ॥

ম্যানচেষ্টারের লেটার বক্স।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

আও বাঙ্গালী পাপী,
আচ্ছা মিহিন খাপি,
ধোলাই আউর কোরা,
লে যাও বহুৎ থোরা,
বড়ি তোফা আদ্ধি থান,
বানালেও চোগা চাপকান,
ধোতি পাছা সাড়ী,
বহুৎ রকমারী,
লে আয়া হুঁ তেরা বাস্তে,
চুপ চাপ আউর আস্তে আস্তে।
কুছ্ নগদা কুছ্ উধার
ছোড় দেউঙ্গী দেদার।
যো লোগ সব হ্যায় ভদ্দর
কাহে কিনোগী খদ্দর।
খদ্দর বড়ি মোটী,
বহরমে ভি ছোটী।
উস্‌মে বড়ি গলদী
ময়লা হোষায় জলদী।
বেলায়তী মাল সাফা,
শাঁকড়া রূপেয়া নাফা,
স্বদেশীকা জুলুম।
কোন্ পায়েগা মালুম।
শুন মেরা বাৎ।
আঁন্ধিয়ারা রাৎ।
চুপসে চলি আও,
কাপড়া ভি লে যায়।
খদ্দর দোঠো কিনো,
মিটিংমে উ পিহ্নো।
কেত্তা গাঁট আউর পেটী,
ভর গিয়া হ্যায় জেঠি,
ওত্তা কাপড়া কোন্ পিহ্নেগী,
হামারা জরু বেটী ?
বেচ ভালোঙ্গী তুম্‌হারা পাশ,
বিকানীরসে ঘোড়াকী ঘাস
কাট্‌নে ক্যা কালকাত্তা আয়া ?
আট দশ মোকাম বানায়া।
ঝুন্ট্রা লাল ফক্কর রাম
হামারা গদ্দিকা নাম।

লাগ গিয়া পূজাকী বাজার
রূপেয়া হোগা হাজ্জার হাজ্জার,
একদম সমুন্দর পার,
ভেজ দেউঙ্গী ম্যানচেষ্টার,
রূপেয়া লেগা মিলওয়ালা,
হামতো উনকা চোনেবালা।
নাফা থোরা রাখদে হাম,
জানো বাবু রাম রাম।

আফিসাভিমুখে।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

আলুভাতে ভাত দুটো
তাও ভারী তপ্ত।
হাতে মুখে ক'রে ছুটি
আমি অভিশপ্ত॥
ছেলেটার জ্বর ভারী
আসে নাই ডাক্তার।
বোধ হয় যম রাজা
পাঠায়েছে ডাক তার॥
গৃহিণী কাঁদিয়া বলে—
আজ নয় যেওনা।
উত্তর দিনু তারে—
পেটে সব খেও না॥
দেখিলাম আজ তার
শব্দহীন কান্না।
ছেলেটা কাহিল তবু
করে দিল রান্না॥
বুকটাও ফেটে যায়
বিগড়ায় মনটা।
ওই বুঝি শোনা যায়
আফিসের ঘণ্টা॥
এতটুকু দেরী হলে
বড় বাবু চেঁচাবে।
সাহেবের কাণে গেলে
সেও দাঁত খেঁচাবে॥
কি দুঃখে দিন কাটি
জানে জগদম্বা।
সাধে কি চলেছি ভাই
ঠ্যাং করি লম্বা॥

দুঃখ ঘুচাব বলে
কর্ম্মি রোজ দুঃখ।
ওপর ওয়ালাদের
বিচার কি সূক্ষ্ম!
নিজেরা দেরীতে আসে
তার কোন কথা নাই।
কেরাণীর দেরী হ'লে
বেচারীর মাথা খায়॥

কমলী ছোড়্‌তা নেহি।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা

বড় দাদা ধ'রে
মারিয়াছে মোরে,
রাগ হ'ল বড় মনে।
ফৌজদারী কোর্টে
মামলা করিনু
যুঝিতে দাদার সনে॥

ধান্য বেচিয়া
টাকা নিয়ে গিয়া
লাগাইনু মোক্তার।
আমা চেয়ে দেখি
দাদার উপরে
বড় বেশী রোখ তার।

গ্রামবাসী মিলে
মিটাইয়ে দিলে,
ক্ষমিনু দাদার দোষ।
মামলার দিনে
মোক্তারে কহিনু
মামলা হলো আপোষ।

শুনি বাবু মোরে
বলিলেন রাগি
করিলি কি বেটা পাজি।
মামলা কখন
মিটে কিরে বেটা
আমারে না করে রাজি।

ভাই চেয়ে বাড়া
ভাড়া করা ভাই
সদা করে দেহি দেহি।

হাম্‌তো কম্‌লী
ছোড় দিয়া লেকেন্‌
কম্‌লী ছোড়্‌তা নেহি।

আহার মাধুরী।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা

মাসী-পিসী-খুড়ী-মায়ের রান্না খাইয়া যদুর পুষ্ট দেহ,
সে যদু যখন সহরে আসিয়া ঢুকিল সটান অফিস-গেহ,
সঙ্গে আসিল নব পরিণীতা ভার্য্যা তাহার কণকলতা,
তদবধি তিনি হ'লেন যদুর বাসার সুপার-ভীষণ-রতা।
উড়িয়া গোঁসাই জুড়িয়া বসিল করিবারে ঘরে গিন্নিপনা,
হাট ও বাজার রন্ধনশালে সে আজ যদুর আপন-জনা!
যে কোন রূপেতে বাটিয়ায় পুরি উপার্জনের টাকাগুলি,
রন্ধনে কোন বন্ধন নাই অবাধে চালায় বালি ও ধূলি।
যদু একদিন খেতে বসে' দেখে ভাতের ভিতরে কাঁকর-মাটী,
কোনরূপে করে গলাধকরণ বেগুণ, আলু ও মূলোর ঘাঁটী।
একদা সজ্‌নে ডাঁটা চিবাইতে চিবাইল যদু দাঁতন-আধা,
ঘীয়ের বদলে কী যে ভাসেরে ডালের উপরে বর্ণ শাদা!
ফেনে ভাতে আজ শুকায়ে হয়েছে মরি মরি কিবা পোক্তা গাঁথা,
পালং শাকের ভিতর হইতে বাহির হইল দোক্তা পাতা!
সিন্নী-পিয়াসী পীরের মতন গিন্নী বসিয়া গদীর 'পরে,
মধুর ভাবেতে যদুর নিত্য এবম্প্রকারে উদর ভরে!

সভ্যের সহধর্ম্মিনী।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা

সাজ পোষাকে সাজেন বাবু,
মাখেন এসেন্স গন্ধরে।
পত্নী তাঁহার তাঁহাকেও জিতে
বিবি সেজে থাকে অন্দরে।
উড়িয়া ঠাকুর ডাল ভাত রাঁধে.
মাংস পাকায় বাবুর্চি।
বিবি সাহেবের খিজমত তরে
গোটা তিন চাই বাবুর ঝি।
গিন্নি মাখেন তিন বেলা সোপ
তবুও ফোটে না বর্ণ তার
অলংকারের মাপ লইবারে
রোজই আসে ঘরে স্বর্ণকার।

নেকলেস ভেঙ্গে হেলে হার হয়,
চুড়ি ভেঙ্গে হয় অনন্ত,
নিত্য নূতন ফ্যাসান উঠে
হয়না কিছুই পছন্দ।
বিলাসী বাবুর বিলাসিনী প্রিয়া,
ধনী শ্বশুরের নন্দিনী,
সুখের অংশ ষোল আনা নেন
দুখের কেহ নন তিনি।
অভাব যখন স্কন্ধে চাপে
বিপদ তখন হয় ফ্যাসান,
প্রিয়ার প্রীতি জন্মাইতে
হারাতে হয় ভদ্রাসন।

শরতে বঙ্গভূমি।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা

আজি কি তোমার বিধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে ;
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি' গেছে খানা ডোবাতে !

পারে না বহিতে লোকে জ্বরভার,
পেটে পেটে পিলে ধরে নাক আর,
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী সভাতে।
একপাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

জননী, তোমার ভিক্ষার খাতা
পাঠা'য়ে দিয়েছ ভুবনে।
রোগে বন্যায়,—'ভাণ্ডে ভবানী'
তোমার ভবনে ভবনে।

অবসর আর নাহিক তোমার,
দলে দলে ছুটে 'ভলাণ্টিয়ার',
লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত,
পান্ত আনিতে লবণে।
জননী, তোমার চিরচাঁদাখাতা
খুলিয়া রেখেছ ভুবনে।

গলি কাদাপাঁক ক'রেছ বেবাক্
জলাশয় ঘোলাবরণী ;

পচাইয়া পাতা করিয়াছ স্যাঁতা
বন-জঙ্গলা ধরণী।

ঘরে দ্বারে আর ঝোপে ঝাড়ে বনে,
বাঁশী বাজে যেন সকরুণ স্বনে,
উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢোকে মুখে নাকে
মশক-মশকঘরণী।
জলাশয়গুলা করিয়াছ ঘোলা
বন-জঙ্গলা ধরণী।

খুলিছে আবার যমের দুয়ার
ভবযন্ত্রণা জুড়ায়ে
কুটীরে কুটীরে নব নব ব্যাধি
নবীন জীবন উড়ায়ে।

দিকে দিকে মাতা উঠে ক্রন্দন,
ঘরে-ঘরে টুটে ভববন্ধন ;
যমদূতচয় মুঠা মুঠা লয়
প'ড়ে পাওয়া প্রাণ কুড়ায়ে।
চ'লেছে শমন দু'ধারে তাহার
ভবযন্ত্রণা জুড়ায়ে।

আয় আয় আয় আছ যে যেথায়
কাঙালী ও রোগী উঠিয়া,
ভিক্ষার ক্ষুদ বাঁটিছে জননী,
বার্লি যেতেছে ফুটিয়া।

ওঘর হইতে আয় হামা দিয়ে
ওবাড়ী হইতে আয় খোঁড়াইয়ে
কে কাঁদি ক্ষুধায়, মায়েরে কাঁদায়,
ক্ষুদ কুঁড়া খায় খুঁটিয়া !
ভিক্ষা-অন্ন বাঁটিছে জননী
আয় তোরা সবে জুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে কণ্টকমালা,
ব্যথায় কাঁদিছে ডুকরি ;
'তালিমারা' মেঘে আকাশ-আঁচল
ছিন্ন যেন সে ধুকড়ি।

কেড়েছে কিরীট নিঠুর পীড়নে,
কত না ছলনা হরিতে হিরণে,
কঠিন-শিকল-বিকল চরণে
জননী কাঁদিছে ফুকরি।
রোগে বন্ধনে তাপে ক্রন্দনে
নিখিল উঠিছে মুখরি'।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা

বৃদ্ধ বয়সে
করেছে বিবাহ
কেবল চতুর্থ পক্ষে,
গৃহিণী আজিকে
গ্রহণী হয়েছে
এর হাতে পেতে রক্ষে।
বয়োগতে কিং
বণিতা বিলাস
বুঝেছেন হাড়ে হাড়ে,
প্রাণ পাত করে
কত দ্রব্য দেয়
তুষ্ট করিতে তারে।
শঙ্কিত পদে
কম্পিত বুকে
লইয়া চলিল মালা,
মালা দেখে বলে
আফিং খাইয়া
জুড়াব যতেক জ্বালা।

খোসামোদীর পরিণাম।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা

ধনীর সঙ্গে
চিরদিন কাটে
নিত্য জোগায়ে মনটা,
আশায় আশায়
পেছনে ঘুরিল
তিনি দেখালেন ঘণ্টা।
অভাবের চোটে
চক্ষু ছানাবড়া
মাথাটী হইল হেঁট,
মোসাহেব নাম
কিনিলাম শুধু
ভরিল না পোড়া পেট।

পশু-চিকিৎসকের ব্যবস্থা।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা

ঘোড়া গরু-কুকুর-গাধা-ব্যাঙ-চিকিৎসক !
চাবুক, পাঁচন, মুগুর, গুঁতো তোমার আবশ্যক।
দানা দিয়ে পুষেছিলাম গাধা একটী জোড়া।
গাধা দুটো পিটন খেয়ে কালে হলো ঘোড়া।
দাবার ঘোড়া আড়াই পদে চলে দাবার ছকে।
এক ঘোড়া দেড় পদে চলে কদমে ছাড়তকে।
আর এক ঘোড়া স্বাধীন চালে দেখায় নূতন টাট্।
পাল্লা ধরে ফূর্তি করে বাপকে মারে চাট্।
দুটো ঘোড়াই বাগ মানেনা—এই দুটোকে যুড়ে।
এক লাগামে বেঁধে দেখি বেড়াও ঘুরে ঘুরে।
চাবুক মেরে ভাবুকটাকে পিঠে কর 'জকি'।
জুতিয়ে বাজি জিতিয়ে চলো যায় না যেন ঠকি।
ঠেলার চোটে ভূত ঠাণ্ডা কর ভূতের ওঝা।
ভূত ভোজন করিয়ে কেন বইছ ভূতের বোঝা ?
ঘুঘু সরষে জব্দ করা রাখ এখন হাতে।
লোকের ভিটেয় কি চরাবে, কি বুনিবে তাতে ?
শাদা মাতাল গুঁতোয় জব্দ, হয় কি ধ'রে 'পেগ'।
রক্ষা-মন্ত্র বক্ষে ধারণ সেই মাতালের 'লেগ'।
ঘোড়া গরুর দাওয়াই জান—ব্যাঘ্র-সিংহ বাদ !
ফেউটা বুঝি মিষ্টি লাগে, মিষ্টি সিংহনাদ ?
চোর গুণ্ডা জেলে জব্দ যদি পড়ে বাঁধা।
টাকা ভেঙ্গে খালাস, দিয়ে দাওয়াইখানায় চাঁদা।
বেনাম জমি ডেঁড়ে খায় যে সোদর ভাইকে ভেঁড়ে,
বকেয়া তারিখ ঢেকে ফেলে, হালের পাট্টি মেরে।
এর দাওয়াইটা দিবে কি গো ওহে গুণবান ?
ধাতে ধাতে মিলছে বুঝি পড়ছে আঁতে টান ?

বিরহ-বাসর।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা

বঁধু হে !
তোমার বিরহে
মনপ্রাণ দহে
কেমনে বাঁধিব হিয়া।

তোমার পিরীতি,
ভজনের রীতি,

রেখেছে বাঁধন দিয়া।
(এ বাঁধন কি ছেঁড়া যায় গো)
(এযে অষ্টে পৃষ্ঠে শক্ত বাঁধন)

নদীর কিনারে,
পুকুরের পারে,
যেখানে ডেকেছ তুমি।

ফেলি শত কাজ,
ভুলে কুলরাজ,
গিয়াছি চরণ চুমি।
(লাজ মান সব ভুলেছি গো)
(যা' করা'লে তাই করেছি)

ছিল মনে আশা—
মিটাবে পিপাসা,
আকাঙ্ক্ষা রবে না কিছু।

যখনি চেয়েছ
তখনি পেয়েছ
ছুটিয়াছি পিছু পিছু।
(প্রভুভক্ত জীবের মত)
(ডাক শুনে স্থির রইনি কভু)

ক্ষুদ্র হ'লে যান,
পাইনি তাতে স্থান,
রহিয়াছি সেজে গুজে।

লই নাই ত্রুটি,
ফের গেছি ছুটি,
শ্রীচরণে মাথা গুঁজে।
(পাখী হ'লে যেতাম উড়ে)
(নিঠুর বিধি দেয়নি পাখা)

চলি যাবে বঁধু,
ফাঁকি দিয়ে শুধু—
মিঠে বাৎ পরিপাটী।

শিশুর খেলানা
তাও যে দিলে না,
ঝুমঝুমি চুষিকাটী।
(কি নিয়ে থাকিব মোরা)
(তোমার স্মৃতি থাক্‌বে কিসে ?)

সমাজ সংস্কার।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা

ঢোলের মত বোল ফুটেচে কার।
করতে সমাজ সংস্কার।
রাখবে না আর উঁচু নীচু,
প্রভেদ আড়াল আগে পিছু,
চণ্ডালেরে দেখে পথে বামুন করবে নমস্কার।
এবার জল উঁচু পানে,
চলবে সমাজ 'রিফরম' টানে,
কলকে এবার সভ্য সভায় চলবে
ঘুরবে বৃত্তাকার।
মুনি ঋষি কি যে পেয়ে,
গেল সবার মাথা খেয়ে,
উঠতে বসতে শাস্ত্র যেন
কোন গতি নাহিক আর।
শাস্ত্র কথা লক্ষ্য করে,
দেখছে সবাই যাচ্ছে ম'রে,
শাস্ত্রও তায় টিকি ধ'রে
পুড়িয়ে কর ছারখার।
পেয়ে কলা আতপ চাল,
লিখে দেশের করলে কাল,
শাস্ত্র ছাড়া করলে এদেশ
আজই হবে লোকোদ্ধার।
হয় নয় কাল উঠতে হ'বে,
পরশু নয়ত মরতে হ'বে,
নট রাগেতে গান বেঁধে নাও,
মৃদঙ্গে নাও তাল ধামার।
হ'য়েছে ত, এখন বলি,
যদিও এটা বিষম কলি'
ভয় ভাবনা নাইক পিছে
আছেন বিষ্ণু অবতার।
যেটা আছে চিরদিনই,
রবে সেটা চিরদিনই
চিরদিনই সেটা ভালোর ;
মন্দ গন্ধ নাইক তার।
কর্তা ভেবে যদি কর,
ধর্ম সমাজে আরো বড়
যেটা আছে সেটাই র'বে
সার মাত্র শ্রম তোমার।

ধূলো যেমন ওড়ে ঝড়ে,
পাহাড় যেমন ধূলায় পড়ে,
তোমার গড়া সমাজ তেমন
করবে ধূলায় হাহাকার।

বরের আবাহন।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা

ওগো বর— তুমি এস !
মোর প্রাণপ্রিয় তুমি এস !
আমার শত জনমের সাধনার ধন
লুকান রতন এস !

এস, আঁধার হৃদয়ের জ্যোতি গো !
অভাগী অবলার পতি গো !
মোর, জীবনের সাথী বেদনার ব্যথী
রমণীর পতি এস !

এস গা—র টোপর শিরসে—
ঘড়ি বাঁধা কর পরশে—
সার্থক কর এ নারী জনম উদ্ধারকারী দেশ !

এস আমারই বাপের খরচে,
ভোজে উৎসবে গানে নাচে,
বরযাত্রীর চোটপাট সহ—
লজ্জার নাহি লেশ।

ঘড়ি চেন হাতে আংটী,
নহে নিজের ঘরের কোনটী,
পর পয়সার কেনা বাবুগিরি
পরের খরিদা বেশ !

এস স্কুল কলেজে পড়া,
বি, এ, এম, এ, পাশ করা,
বিয়ের হাটেতে বড় চূড়ামণি বিদ্বান্ বিশেষ।

এস দূরদৃষ্টিহারা,
সখের চশ্মা পরা,
পামসু গায়ে পাঞ্জাবী গায়ে
উজান টেরী কেশ।

এস উচ্চ উপাধি মণ্ডিত,
পুঁথি গিলে খাওয়া পণ্ডিত,
জনক জননীর খুঁজে পাওয়া চীজ
অপরূপ অশেষ।

আমি তব পথ চেয়ে আজি গো!
মরিতে না পেরে বাঁচি গো!
পেটে নাহি ক্ষুধা চোখে নাহি নিদ্
চিন্তার নাই শেষ।

পরিচয় ওহে গেছে জানা
এবেলা জোটেত ওবেলা কিছু না—
তবু দাম নিলে ষোল আনা,
যদিও অন্নবস্ত্রের ক্লেশ!

আমি যে হিন্দুর মেয়ে,
মা বাপের মুখ চেয়ে,
আবাহন করি স্বাগত ওহে! গোবর গণেশ!

কালে কালে দেখব কত বল আর।

১৩৩৭ সাল ১৬শ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা

কালে কালে দেখ্‌বে কত বল আর!
গেলাম, অবাক ব'নে দেখে শুনে
কালের ব্যবহার কদাচার।

হায় মরে যায় একি কাণ্ড
লোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম হ'ল পণ্ড
হবে, বিয়ে করে কারাদণ্ড,
চণ্ডনীতি চমৎকার।

ছিল আট বছরে গৌরীদান,
উঠে গেল সে বিধির বিধান,
জলে ফেলে দাও ভারত পুরাণ,
সে সকল অতি অসার,—

এখন, গত হয়ে গেলে চৌদ্দ
তারপরে বিয়ের বরাদ্দ,
নৈলে, হবে ক'নের বাপের আদ্যশ্রাদ্ধ
সদ্য সদ্য কারাগার!

বিয়ের আইন হইল পাস,
নিয়ম শুনে লাগে ত্রাস,
মেয়ের বাপের সর্ব্বনাশ,
বাহবা কলির বেশ বিচার,—
যার, ক্রমান্বয়ে পাঁচটী মেয়ে
তার, আইন মেনে দিতে বিয়ে,
উঠ্‌বে সব যুবতী হয়ে,
ঘট্‌বে কত ব্যাভিচার।

এমন, হাত ধুয়ে কেউ নেই ক' বসে
যে চৌদ্দ বছর তিন দিবসে
অমনি পাত্র জুটবে এসে,
গলায় দেবে ফুলের হার,—
আবার দৈবে কুড়ি পারিয়ে গেলে
নেবে নাক' বুড়ি বলে,
তখন, শান্তি নেবে কেরাসিন তেলে,
কিম্বা হবে পগাড় পার!
মেয়ের মায়ের মন্দ নয়,
বিদায় করতে পারলে হয়,
পালিয়ে আসবার থাকবে না ভয়,
রবে না ভয় গঞ্জনার,—
কিন্তু, বরের মায়ের ঘটবে ল্যাঠা
হ'তে হবে ঝাঁটা পেটা,
বৌ, এগিয়ে দিয়ে বুকের পাটা,
বলবে ঘর সংসার আমার!
কেহ কেহ বলেন স্পষ্ট
এতে উপকার হবে যথেষ্ট,
নইলে হচ্ছে স্বাস্থ্য নষ্ট,
তুলে দাও এ দেশাচার,—
কিন্তু, একথা ভাবেন না তাঁরা
মানুষ কিসে হচ্ছে অর্দ্ধমরা
খাদ্যাভাবে জীর্ণ-জরা,
ভাবেন কি কেউ একটী বার?
ছিল, অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যু,
বাল্যকালে বিয়ের জন্য,
হয়নি ক' তার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ,
বরেণ্য বীর অবতার,—
ছিল, দশরথের পুত্রগণ,
তাদের, বারো বছর বয়স যখন,
হয়েছিল বিবাহ মিলন,
পুরাণ শাস্ত্রে এই প্রচার।
এখন, হেল্‌থ অফিসার হচ্ছে যত
ভেজাল জিনিস বাড়ছে তত,
চলছে নকল অবিরত,
আসল খুঁজে মেলা ভার,—
ভাবে, সর্ব্বজনে এই দেশে
বাহবা আইন হ'ল দেশে,
আরও কত হবে শেষে.
বলতে প্যারে সাধ্য কার!

লবণ সংগ্রাম।

১৩৩৭ সাল ১৬শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা

এ লবণ কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।
যতই ফোটাবে জল তত যাবে বেড়ে॥
ভারত জুড়িয়া পড়ে লবণের সাড়া।
অহিংসক নরনারী অঙ্গে দেয় ঝাড়া॥
ফাটে হাঁড়ি, ফাটে কড়া, ফাটে কাঁচা মাথা।
সত্যাগ্রহে কি নিগ্রহ—কাঁদে দেশ-মাতা॥
জগৎ-বরেণ নেতা লবণের তরে।
আসমুদ্র হিমাচল তোলপাড় করে॥
জলে নুন, স্থলে নুন—নিমকের দেশে।
আসিছে বিদেশী নুন জাহাজেতে ভেসে॥
লিভারপুলের নুনে বৃদ্ধি লিভারের।
শুল্কের তাড়শে প্রাণ যায় ভারতের॥
সবরমতীর ঋষি মহাত্মার বাণী।
পালিতেছে নর-নারী বেদবাক্য মানি॥
স্তব্ধ নেত্রে চেয়ে আছে সমগ্র জগৎ।
হয় কি না হয় জয়ী অহিংসার পথ॥

রমানাথের রোমান্স।

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

দ্বাদশ বরষে পড়ি, রমানাথ বাবু
বঙ্কিমের উপন্যাস করিলেন শেষ
খেলাধুলা ছাড়ি দিয়া, পেচকের মত
বটতলার গ্রন্থরাজি করিল নিঃশেষ।
সব কথা পারিত না বুঝিতে সে হায়,
তা'তে কিন্তু নিরাশার হেতু কিবা আছে?
নায়ক-নায়িকা মাঝে যত প্রেম কথা,
সরল, জলের মত ছিল তার কাছে।
বার বার পড়িত সে সেই অংশটুকু
পোড়া মনে তৃপ্তি তবু হ'ত নাকো তার;
অরসিকে কি বুঝিবে তাহার আস্বাদ,
সে যে এক অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার
ভাবিত সে আপনারে বিষম নায়ক
ঘৃণা হত তাই সঙ্গী সাথেতে মিশিতে;
এত বড় নায়ক সে বল কিবা তারে
মালকোঁচা বাঁধি, হীন হা-ডু-ডু খেলিতে।

বছর চারেক গেল কেটে এইরূপে,
রমানাথ এখনও বিভোর ভাবেতে ;
কিন্তু পাঠে তার নাহি আশ মিটে
বাস্তব নায়ক সাধ চাহে পূরাইতে।
শুধু কল্পনায় চিত্ত তৃপ্ত নহে তার
বিদ্রোহী অন্তর তার মানা নাহি মানে ;
তাই এবে রমানাথ লাগিল খুঁজিতে
যথার্থ নায়িকা তার আছে কোন্‌খানে।
পড়েছিল দু একটী নব্য উপন্যাসে
প্রতিবেশিনীর সাথে প্রেম সংঘটন ;
কিম্বা শৈশবের এক সহচরী সাথে
কোন এক শুভক্ষণে, অপূর্ব মিলন।
রমানাথ ভাবিল যে এই সোজা কথা,
এতদিনে মনে আহা পড়ে নাই তার !
বুঁদ হ'য়ে কল্পনার রঙ্গীন্ নেশায়
পরিচয় দিয়াছে সে একি মূর্খতার !
অচিরে নায়িকা তার মিলিল খুঁজিয়া
সে যে আর কেহ নহে, তাহাদেরি পুঁটী,
ধন্য উপন্যাস ! ধন্য মাহাত্ম্য তোমার !
বেদের তত্ত্বের চেয়ে উপন্যাস খাঁটী !
নহে তবে মিথ্যা ইহা, অলীক কল্পনা
বরং নিছক সত্য দেখে যে ইহারে ;
বর্ণে বর্ণে, ছত্রে ছত্রে, গেছে মিলে এবে,
এর চেয়ে বড় সাক্ষী মানিবে কাহারে ?
পুঁটী তার প্রতিবেশী মুখুয্যের মেয়ে.
আবার খেলার সাথী ছিল আগেকার ;
যথার্থ নায়িকা যদি থাকে কেউ ভবে
সোনায় সোহাগা এই পুঁটী তবে তার।
কিন্তু দুঃখ রাখিবারে নাহি তার ঠাঁই
বেরসিক পিতা তার সাধিয়াছে বাদ,
মিথ্যা হ'ল হা হুতাশ ! অন্ধ পিতা হায়
বোঝে না'ক অর্থ তার—একি পরমাদ !
এদিকেতে বৈদ্যপুরে চাটুজ্জের বাড়ী
পুঁটীর বিয়ের কথা হ'ল পাকাপাকি ;
কুব্জ দেহ রমানাথ আরো পড়ে নুয়ে,
পুঁটী বুঝি চলে যায়, দিয়ে তারে ফাঁকি।
শেষে এক গোধূলিতে মুখুয্যের বাড়ী
ঘন ঘন শুভশঙ্খ উঠিল বাজিয়া ;
নিমন্ত্রিত রমানাথ, গৃহকোণে বসি
পত্নীহারা মত শোকে, উঠে ফুকারিয়া।

তবে কিগো মিথ্যা সব উপন্যাস বাণী ?
ভালবাসা পিরামিডে পড়িল কি বাজ ?
কল্পনার নায়িকারে মূর্তি দিয়ে পুঁটী
সত্যই কি শেষে হায় চলে যাবে আজ ?
না, না, এ যে অসম্ভব ; যতক্ষণ দেহে
থাকিবেক শ্বাস হায়, ততক্ষণ আশ ;
ঠিক্ বটে ভাল ভাল উপন্যাসে বলে
এ বিরহ মিলনের শুধু পূর্বাভাষ।
এখন ত বিবাহের হয় নাই শেষ,
পণ লয়ে দ্বন্দ্ব আছে এখনও বাকী ;
প্রতিবেশী তারে, পারে এখনও ডাকিতে—
'দোপড়া' পুঁটীর হাতে বেঁধে দিতে রাখী।
কিন্তু হায়! এত আশা করি ধূলিসাৎ
উলু, উলু, ধ্বনি মাঝে বিয়ে হ'ল শেষ ;
প্রতীক্ষায় অবসন্ন রমানাথ ক্ষোভে,
উৎপাটিতে আরম্ভিল গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ।
এত উপন্যাস পড়ি, কে জানিত হায়
প্রথম প্রেমের তার এই পরিণাম ;
কল্পনীড়ে, তিলে, তিলে সাড়া স্বপ্ন তার
ভেঙ্গে দিলে বাস্তবের কঠিন আহ্বান।
অট্টহাসি রমানাথ গৃহকোণ হ'তে
উঠানে আনিল বহি' উপন্যাস রাশি ;
আগুন ধরায়ে দিয়ে, পুকুরেতে নামি,
মুক্তিস্নান করি গৃহে পশিল সে আসি।

শ্রীমান যুবক-বৃদ্ধ।

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

দিব্য দৃষ্টিহীন অবোধ যে জন,
বিবেক যাহারে করেছে বর্জন,
আমারে স্থবির বলিবে সে জন,
নাহি তার জ্ঞান লেশ।

ভাগ্যদোষে মোরে বিধি প্রতিকূল,
পড়িয়াছে দাঁত পাকিয়াছে চুল,
তবু দেহে ধরি ক্ষমতা অতুল,
পায়ে হাঁটি সারা দেশ॥

যদিও বয়েস দুই কুড়ি দশ,
এখনো হৃদয়ে অতুল সাহস,
লাঠি ধরি যদি শত্রু হয় বশ,
শমন এগোতে নারে।

কমনীয় দেহ নহে ত আমার,
কুলিশ কঠোর অঙ্গের আকার,
মোটা চাল আটা দৈনিক আহার,
হাঁকি ডাকে দফা সারে ॥

ম্যালেরিয়া দেশে লভিয়া জনম,
ম্যালেরিয়া বিষ ক'রেছি হজম,
অম্বলের রোগ জীবনে প্রথম
হয়েছিল একদিন।

তবু মোরে লোকে বুড়ো ব'লে ডাকে,
হায় মন দুঃখ জানাইব কাকে,
সময় না হতে চুল গেল পেকে,
বিধি কি দায়িত্বহীন ॥

কলম চালাতে বিধির উপরে
পারি, শুধু তাহা করি না খাতিরে,
কলপেতে চুল মিশ কালো করে
যুবক সাজিতে পারি।

কুন্দ দন্ত পাঁতি (যদিও কৃত্রিম),
হেরি শোভা তার অতুল অসীম,
বিস্ময়ে বিধির হবে হাড় হিম,
ভেঙ্গে যাবে জুরিজারি ॥

জোর করে যদি ধরি দুই হাতে,
যুবা ত তোমরা, পার কি ছাড়াতে?
হেসে কুটি কুটি আমার কথাতে,
বিশ্বাস হল না মনে?

ভাবিতেছ বুঝি বুড়োটা পাগল,
বকিতেছে তাই আবোল-তাবোল,
মোরা দেহে ধরি শত হস্তী বল,
তুলনা মোদের সনে?

বিংশতি বৎসর বয়স না হতে,
বিনা চসমায় পাওনা দেখিতে,
যুবক বলিয়া পরিচয় দিতে
তোমাদের নাহি লাজ?

গজ ভুক্ত ফল কপিত্থ যেমন,
তোমাদের দেহ অসার তেমন,
আলস্য জড়তা অঙ্গের ভূষণ,
হাতে নাহি কোন কাজ ॥

বামুন পণ্ডিত কটাই।

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

আমরা বামুন পণ্ডিত কটাই,
যত যজমান্‌গুলো পটাই,
তাই কি করি নাচার শাস্ত্র-আচার
দামামা বাজিয়ে রটাই।

আমরা হিন্দু সমাজে কসাই,
লোকে ভক্তিতে কয় গোঁসাই,
জেনো টাকা-সিকে নিতে দ্বিপদ পাঁঠার
গলা ঘেঁসে ছুরী বসাই।

আমরা ধর্ম্মের ধ্বজাধারী,
আর পরপার-কাণ্ডারী,
তোফা মুখ সাপটেতে পাই সদা খেতে
লুচি-চিনি-তরকারী।

আমরা রাখিনা কাহারো খাতির,
কেবল ধার ধারি কুল-জাতির,
কিন্তু চরণ লেহন করিতে ছাড়ি না
ধনী চামারের নাতির।

মোদের গোঁড়ামি ভাড়ামি রীতি,
ভুলে ঘাঁটি না তন্ত্র-স্মৃতি,
শুধু এ জগতে এসে উদরের পূজা
করাটাই হ'ল নীতি।

মোরা করি বড় টিকির আদর,
পরি মিলের ধুতি ও চাদর,
চাঁদ ছুঁচিবাই-রূপ ছাগলের কাঁধে
চেপে থাকি রূপী বাঁদর।

আছে ফলার দক্ষিণা বিদায়
মারি গামছা কাপড় গাদায়
করি বছরের শেষে বাড়ী বাড়ী এসে
Religious tax আদায়।

সেই অন্নপ্রাশন থেকে—
ঠিক গাঁটকাটা যাই রেখে,
যদি ম'রে যায় তবু জিজিয়ার তরে
শ্রাদ্ধেতে বসি বেঁকে।

আমরা শাস্ত্র ভাঙ্গি ও গড়ি,
যদি পাই কিছু টাকা-কড়ি ;
এবে মুখের অগ্নি পেটেতে জ্বলিছে,
তাই এত লড়ালড়ি।

মোরা নারী শিক্ষাটা না চাই,
নচেৎ দায় হবে মোদের বাঁচাই,
চাচা প্রণামীটা হ'তে ফাঁকি পড়ি পাছে
স্থান দিচ্ছি তাই খাঁচাই।

শুধু হাঁড়ী হান্‌শাল নিয়ে,
রবে বিলকুল মায়ে-ঝিয়ে,
আর কোল জোড়া করি বুক জুড়াইবে
বংশলোচনে দিয়ে।

বাল বিধবা বিবাহ নামে,
মোদের রাগে সারা দেহ ঘামে,
ভাবি ম্লেচ্ছগুলোকে পিঠমোড়া দিয়ে
পাঠাই নরক-ধামে।

কিন্তু দেবো—দেবো আল্‌বাৎ,
মোরা পঞ্চম পক্ষ সাথ—
দুধে খুকীদের বিয়ে ঘটা ক'রে তাতে
জমে বেড়ে মৌতাৎ।

মোদের কার্য্যে ক'রো না স'ন্দ,
আছে টিকি পৈতেরো ছন্দ ;
ভুলে নীতির দ্বন্দ্ব, পড় এই পায়ে—
কপাল হবে না মন্দ !

এস।

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

(১)

এস মা আনন্দময়ী
নিরানন্দ বঙ্গের মাঝারে,
সমগ্র বাঙ্গালী আজি
আছে তব আশাপথ ধরে।
নব ধানদূর্বা লয়ে,
প্রকৃতি সজ্জিতা হয়ে,
ধীরে ধীরে আসিতেছে
ভক্তি-অর্ঘ্যডালা লয়ে করে,
এস মাগো দয়াময়ী
দীন হীন বাঙ্গালী-দুয়ারে।

(২)

পত্র পুষ্প তরুলতা,
ধরিয়াছে মনোরম সাজ,

তব আগমন-কথা
জানাতেছে সমীরণ আজ।
তোমার পরশে পুণ্য,
বঙ্গবাসী হবে ধন্য,
কত স্বরগের গীতি
ধ্বনিয়া উঠিবে হৃদিমাঝ,
দাও মা শকতি প্রাণে
পূজিতে ও শ্রীচরণ আজ।

(৩)

হে মাতঃ কল্যাণময়ি,
শুভাশীষ দাও গো মাথায়,
অযুত তনয় তব
স্নেহধারা আজি যেন পায়।
পূর্ণ এক বর্ষ পরে
পাইয়া তোমারে ঘরে
সভক্তি হৃদয়ে আজ
পুষ্পাঞ্জলি দিব গো তোমায়,
তুমি না লইলে অর্ঘ্য
যাবে মাগো সকলি বৃথায়।

(৪)

ধরায় ফুটাতে হাসি
নাশিতে এ মর্ত্তের আঁধার,
এস নামি' হে কল্যাণি,
তুমি যে মা সম্বল সবার।
শোক দুঃখ মলিনতা,
ঘুচাও বেদনা-ব্যথা,
প্রাণে দাও নব আলো,
পুলকিত কর চারিধার,
হাসুক ধরণী পুনঃ
পেয়ে আজি পরশ তোমার।

কালের ক্যালেণ্ডার।

(১৯৩১)

[শ্রী শরৎচ্চন্দ্র পণ্ডিত।]

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

"বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের"—সুর।
এক নিশ্বাসে ব'লবো শোন, নতুন বছর।
নতুন বছর নতুন বছর নতুন বছর নতুন বছর ॥

উনিশ শ' ত্রিশ তুল্লো পটোল, একত্রিশ এল জেনো।
একত্রিশ লিখ্তে ত্রিশ লিখে সব জিভ্ কেটো না যেন ॥
জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মার্চ এপ্রিল মে
মাসগুলো সব ঠিক আসিবে যারপর আসে যে ॥
Thirty days hath September যে দিন-গণনার rule
এ বছরও ঠিকই আছে উল্টোনি এক চুল ॥
Sunday, Monday, Tuesday ইত্যাদি যত বার,
যারপর যা ঠিক আসিবে হয়নিকো alter.
New year's day ঠিকই আছে ১লা জানুয়ারী।
এইটুকু ভুল নাইক এতে বাজি ধরতে পারি ॥
চৌঠা জানুয়ারী তারিখ হবে সবেরাৎ।
ইসলামীয় পর্ব নিয়ে প্রথম করি সাৎ ॥
জানুয়ারীর তেইশ তারিখ সরস্বতী পূজা।
জানোয়ারীর মধ্যে এবার আসিবে শ্বেতভুজা ॥
(Fifteenth) ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রি পূজবে ত্রিশূল-পাণি।
(বিশে) ফেব্রুয়ারী ঈদের নমাজ ও কোরবাণি ॥
চৌঠা মার্চে কৃষ্ণ ঠাকুর উঠ্বে এবার দোলে।
তেরই এপ্রিল চড়ক পূজা জানবে ঢাকের বোলে ॥
একটি কথা মনে রেখো কোরোনাক ভুল।
পয়লা এপ্রিল ঠকো যদি হবে এপ্রিল ফুল ॥
তেস্রা এপ্রিল গুড ফ্রাইডে শুক্রবারেই হবে।
ছয়ই এপ্রিল ঈষ্টার মান্ডে জেনে রেখো সবে ॥
একুশে এপ্রিল হবে অক্ষয় তৃতীয়া।
(উন) ত্রিশে এপ্রিল ইদোজ্জোহা ইয়াদ্ রেখো মিয়া ॥
তেইশা মে শনিবার বাংলা নয়ই জোষ্টি।
Ready থেকো জামাই-বাবু সেদিন জামাইষষ্ঠী ॥
নতুন জামাই যাদের এবার তাদের বিষম ঠ্যালা।
কত মেয়ের বাবার ফল্বে শনিবারের বারবেলা ॥
ছাব্বিশে মে দশহারা গঙ্গাস্নানের যোগে।
এক ডুবুতে খালাস পাপী লক্ষ পাপের ভোগে ॥
উনত্রিশ মে মহরম, জেনো মিয়া খাঁটি।
মার্শিয়া গাহিতে হবে, হবে মঞ্জিল মাটী ॥
একত্রিশে মে স্নানযাত্রা, নাইবে জগন্নাথ।
টঙ্কা তরে পাণ্ডা করবে উৎকলে উৎপাত ॥
তেস্রা জুনে দেখি গুণে রাজার জন্মদিন।
His Majesty করবে সৃষ্টি উপাধি নবীন ॥
(আখেরী) চাহারসুম্বা বারই জুলাই ইস্লামেরি মতে।
সতরই জুলাই জগন্নাথ দেব উঠবেন এবার রথে ॥
পুনর্যাত্রা ২৫শে জুলাই উল্টো রথে টান।
আটাশে জুলাই হবে এবার ফতেদোহাজ দান ॥

তেইশে আগষ্ট কৃষ্ণ উঠিবে ঝুলনে।
রাধারাণী টানেন্ যদি যাব বৃন্দাবনে॥
ব্রজের রজে থেকে কদিন ৪ঠা সেপটেম্বর।
পীতাম্বর জন্মিবেন সেদিন হ'য়ে দিগম্বর॥
(১৮ই) অক্টোবর সিংহী চড়ে আস্‌বে মহামায়া।
এই তারিখটী মনে হ'লে চম্‌কে উঠি ভায়া॥
আসিবেন আনন্দময়ী শুনি সবার মুখে।
আমি জানি যে আনন্দ আমার মধ্যে ঢুকে॥
যে আনন্দ দেন গৃহিণী ফর্দ ক'রে লম্বা,
আমি জানি, গিন্নী জানেন, জানেন জগদম্বা॥
জামাতা দশম গ্রহ তস্য প্রসবিনী।
তত্ত্বজ্ঞানে মূর্ত্তি ধরেন মহিষমর্দ্দিনী॥
মুখেতে আনন্দ বলে, আনন্দ নাই পেটে।
আনন্দ কি এমনি আসে Pennyless পকেটে॥
(২৫শে) অক্টোবরে কোজাগরে আসিবেন মা লক্ষ্মী।
(এ) লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে দেখা দেন্‌না প্যাঁচা পক্ষী॥
(৯ই) নভেম্বরে দিগম্বরে আসিবেন কালিকা।
নিয়ে তুবড়ী পট্‌কা লাগায় খট্‌কা বালক আর বালিকা॥
(সেদিন) Emergency Ward খোলা থাকবে সারা রাত,
কেউ বাঁচিবে কেঁদে কেটে, কেউ বা কুপোকাৎ॥
(১১ই) নভেম্বরে ভাইকে ফোঁটা দিবে ভগ্নীগণ।
(১৬ই) নভেম্বর ময়ূর চড়ে' আস্‌বে ষড়ানন॥
জগদ্ধাত্রী পূজা হবে ১৮ই নভেম্বর।
২৪শে তারিখ রাস-কেলি করবে নটবর॥
২৫শে ডিসেম্বরেতে হবে খৃষ্ট-মাস।
কালের ক্যালেণ্ডারে সবই করিনু প্রকাশ॥
বহু ছেলে পাস্ হবে, আর বহু ছেলে ফেল্।
চাক্‌রী-তরে দিবে লোকে পরের পায়ে তেল॥
ব্যাটা ছেলের যত বিয়ে, মেয়ে ছেলের তত।
Divorce আর তালাক হবে আগেকারই মত॥
কত লোকের গিন্নী যাবে শাঁখা সিঁদুর নিয়ে।
পাকা খুঁটি কাচবে আবার ক'রে নতুন বিয়ে॥
বহু হিন্দু কাশী যাবেন, বহু ইস্‌লাম মক্কা।
Mail Service খুব চল্‌বে, চল্‌বে টরে-টক্কা॥
যাদের আয়ু ফুরিয়ে গেছে মরবে এবার তারা।
পরমায়ু থাক্‌তে কেহ যাবে নাকো মারা॥
Calculation করলাম আমি কালের ক্যালেণ্ডার।
(আমি) 'যে পান্নালাল সেই পান্নালাল' present, past, future

"দীপালী"

গত ৩রা জানুয়ারী বেতার-আসরে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার কর্তৃক গীত।

Modern রাধা।

(শ্রী শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।)

[সংকীর্তন]

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥
(কারে rely করি) (এমন reliable বল কে আছে)
Attend কোরো যত সখি, আমার death bad-এ,
K,R,I,S,H,N,A লিখিয়ো force-head-এ॥
(Never forget it) (যেন spelling-mistake কোরনা)
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিয়ো কানে।
(Confidentially) (privately and secretly)
(যেন outsider না শোনে) (টিক্‌টিকির report এর মতো)
Easily প্রাণ ত্যজি যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥
(যেন না linger করি) (এই finger দেখিয়ে চ'লে যাই)
না পোড়ায়ো রাধা-অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে॥
(যেন preserve কোরো) (তমাল-ডাল এক reserve ক'রে)
দেখিয়ো সে গাছে যেন কেহ নাহি উঠে।
Record নাহি করে পুলিশ inquest-report-এ॥
(যেন তুলিস নে সই) (পুলিশ-ফুলিসের নজর দিতে)
স্বর্গে যেতে চাইনে আমি কালারে তেয়াগি।
(আমায়) Morgue এ যেন নিয়ে না যায় post-mortem লাগি॥
(ফ'লে যে যাবে) (ননদীর অভিশাপ তবে)
(সে সদাই ব'লতো—'মর্‌গে যা')
(objection কোরো) repeatedly petition এ)
(বেটনে পিটন দিলেও)
পুলিস যদি শুধায়—দেহ গাছে কেন রহে?
বলিবি—এ তোমাদের jurisdiction নহে॥
(তমাল বমাল নহে)
(আমরা চোরামাল দিইনি সামাল তমাল তরু বমাল নহে)
(যেন ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না) (এর পাশ দিয়ে গেলে tresspass হবে)
এই preserve করা reserved দেহ ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না
এই দেহ preserve করায় motive কিছু আছে—
এ positively পাবে প্রাণ কালার single touch-এ।
(কালার পরশ পাবে) (আমরা তাইতে তমাল গাছে রেখেছি)
Modern বিদ্যাপতির নিদারুণ ভাষা।
Orthodox কৃষ্ণভক্তের পুরাইতে আশা॥

(যারা অর্থ চাহে) (কৃষ্ণভক্তির বিনিময়ে)
Excuse me kindly genuine ভক্তবৃন্দ!
Take no offence Mrs. রাধা, Mr. শ্রীগোবিন্দ।
(অপরাধ ক'রেছি) (কীর্তনে বিকৃত ক'রে)
(আর কোরবো না হে) (পেট ভ'রে যদি খেতে দাও)
(যেন পায়ে রেখো) (এই উপায়হীনে)
(সদ্‌পায়ে দ্‌'পাই পাই যেন, দ্‌ পায়ে রেখো)
(এই culprit এ দ্‌'পায়ে রেখো)
(কালপীড়নে পীড়িত এই culprit এ দ্‌'পায়ে রেখো)
কীর্তনে বিকৃতকারী আমারে বলিয়া,
যেন দফা রফা করো প্রভু চরণে দলিয়া ॥

একাধিক-পক্ষ।

কৈফিয়ৎ-তত্ত্ব

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

(১)

কলেজেতে পড়্‌তাম যখন,
করেছিলাম ভীষণ পণ,
দেশের কাজে কর্ব আমার
সর্বশক্তি সমর্পণ,
কর্ব না'ক বিয়ে কভু
থাক্‌ব মুক্ত বাতাস প্রায়,
সে সব কথা মনে হ'লে
চোখ্‌টা জলে ভরে যায়!
বি'য়ের সময় সবাই দেখি
পিতৃ-মাতৃ ভক্ত হয়,
সবার মত কাজেই আমার
হ'য়ে গেল পরিণয়।
বছর দেড়েক পরে যখন
গিন্নীর ধর্‌ল যক্ষ্মাকাশ,
ধরার কারবার তুলে দিয়ে
কর্তে গেলেন স্বর্গবাস!
ভাবলাম মনে ভালই হ'ল,
হ'লাম সর্ব বন্ধন মুক্ত;
দেশ ভক্তিতে কাজ নাই—
র'ব সকল তাতেই অনাসক্ত!

(২)

অশৌচান্ত মাসে দেখি
ঘটকীর শুভ আগমন,
বুঝলাম মনে হচ্ছে আবার
আমার বিয়ের আয়োজন।
বল্‌লাম মায়ে—"বেশ ত আছি
এই সব তোমাদেরি নিয়ে,
সুখে দুঃখে দিন কাটাব
দরকার নাই আর করে বিয়ে,"—
মা বল্লেন—"আমার বাছা
থাক্‌ব কি আর চিরকাল,
আমরা গেলে বল দেখি
কি হ'বে বা তোমার হাল,"
ছেলে পিলে হয়নি তোমার
বংশটা কি লোপই পাবে ?
কোনও কথা শুন্‌ব না'ক,—
বিয়ে তোমায় কর্তেই হবে"
এক কথাতেই স্বীকার হ'লাম—
মনটা বোধ হয় রাজিই ছিল,
বিয়েটা যে দিল্লীর লাড্ডু—
ভাল করেই বুঝা গেল।

(৩)

কালো কোলা ধেড়ে মোটা
এলেন আমার "দিগম্বরী,"
৫/৬ বছর অনায়াসে
কেটে গেল কেমন করি,—
এরই মধ্যে স্বর্গে গেলেন
দেবী-রূপা মাতা মোর,
(হচ্চে) বছর বছর পুত্র কন্যা
গিন্নীর আমার কপাল জোর !
একটা কাঁকে একটা কোলে,
হাতটা ধরে কেউ বা চলে,
"ষষ্ঠী ঠাকুরুণ" বলে আমি
ডেকেই ফেলি মনের ভুলে,
স্বর্গ থেকে দেখ মাগো
তোমার অধম তনয় পানে,
পুত্র কন্যার সাধ মিটেছে—
এবার বুঝি মরি প্রাণে !
তৃতীয় কন্যা প্রসব পরে
কি যে ব্যাধি ধর্‌ল তার,

কিছুতেই আর সারল না'ক—
যমে নিলেন উপহার !

(৪)

৪/৫টি বাচ্চা নিয়ে ভাবছি
কি যে হবে তাই—
দেখলাম আমার শুভাদৃষ্টে
হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব নাই !
সবাই এসে বলে আমায়
"কি ছাই বসে ভাবছ বল,
বেটা ছেলে তুমি এমন—
নূতন বিয়ে করে ফেল।
তা' না হ'লে "মানুষ" তোমার
কর্বে কে বা ছেলে পিলে,
তাদের কিবা গতি হবে
তুমি আফিস চলে গেলে।
দায়ে পড়ে করে নিলাম
তাদের কথাই শিরোধার্য্য—
"নিয়ম ভঙ্গের" পরের দিনই
ফেললাম সেরে শুভ কার্য্য !
বন্ধ্যা স্ত্রী মরলে
ছেলের দোহাই দিতে হয়,
পুত্র কন্যা থাক্‌লে পরে
তাদের তরেই পরিণয়।

প্রথম ও শেষ।

১৩৩৮ সাল ১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

আর ভাল লাগে না
আমার পাড়াগাঁয়ের ঘরবাড়ি !
নাইক পাখা ইলেকটিকের
নাইক সার্সী খড়খড়ি ॥
সকালবেলায় ছোঁচ বুলুতে
পারব নাগো পারব না।
বিয়ের মতন উঠান আমি
ঝাড়বনাক ঝাড়ব না ॥
সকাল হ'লে চা এর বাটী
নিত্য আমার সামনে চাই।
যে দিনগুলো থাকব হেথায়
চ'লবে নিয়ম এমনিটাই ॥

এঁদো ডোবার গন্ধ জলে
বাসন মাজা শক্ত যে
ঘুঁটের ছাই-এ দাঁতন করা,
প'ড়বে দাঁতে রক্ত যে ॥
ন্যাস্‌টী তেলে চুল বাঁধিতে
হবেই নাকি সত্যি গো।
শ্বশুর বাড়ীর সাধ মিটেছে
সুখ নাই একরত্তি গো ॥
খাবার ছেড়ে মুড়ি টেনে
শুকিয়ে বল ম'রবে কে।
গোয়াল ঘরে গোবর ঠেলা
এ কাজ বল ক'রবে কে ॥
নাই বাঁধান গা ঘসা ঘাট
আল্‌দে কাদা চটচটে।
পিছলে প'ড়ে আছাড় খেলুম
লাজে মাথা যায় ফেটে ॥
পথে উড়ে বেজায় ধুলো
ভেস্তিওলা নাই কি হায়।
মিউনিসিপাল করলে পার
কিবা এমন খরচ তায় ॥
বুকে স'য়ে দারুণ জ্বালা
এমন ঘরে থাকবে কে।
মিটমিটিনী প্রদীপ জ্বলে
এ দুঃখ চেপে রাখবে কে ॥
পাড়াগাঁয়ে শুধুই আছে
কুমড়ো ঘাটা তরকারী।
কড়াইয়ের দাল টসটসানি
টকে শুধু দেয় বড়ি ॥
পাকা মাছের ঝোল রাঁধে না
নাইক মুড়োঘণ্ট যে।
তেঁতপুটির কি তরকারী
ভর্তি যে ভরা কণ্টকে ॥
পটল আলুর ভল্‌ভলে নাই
শুধুই দেখি ছেচরা যে।
পাথর চালের ভাত খেতে হয়
মরি আমি হায় লাজে ॥
ফাটা পায়ে তেল বুলান
যদিই সেটা ধর্ম্ম হয়।
এমন ক'রে দিন কাটান
আমার যেন কর্ম্ম নয় ॥

শাশুড়ী হ'ক, হ'ক্‌না গরু
একাজ করার সাধ্য নাই।
শুন্‌লে কথা পতির সেবা
করব শুধু বলচি তাই॥
শুধুই দেশে গলি ঘুচি
লতার ঝোপে আছে ভ'রে।
দেখিনাক একটী ভাল
থাকবে কিসে আস্থা রে॥
এমনি দেশে জন্ম তোমার
নাই বায়স্কোপ থেটারই।
রিক্‌স কিম্বা না হয় থাকুক
ট্যাক্‌সি কিম্বা ট্রামগাড়ি॥
সত্যি ক'রে বলচি আমার
এইত প্রথম এইত শেষ।
খেদ মিটেছে আমার দেখার
তোমার ভাল এমনি দেশ॥
ভালবাসা রাখতে অটুট
চাও যদি গো সত্যি প্রাণ।
আজব সহর ছাড়লে পরে
চ'ল্‌বে নাক যাক্‌-না জান্‌॥

"অবতার"

"আমার বাংলা ভাষা!'
(শ্রী শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত)

১৩৩৮ সাল ১৮শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

"আমরি বাংলা ভাষা,
মোদের গরব্‌ মোদের আশা
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা!"

Illiterate cultivator,
Paddy-cutting song-এ বেটার
Bloody বাউল savage মাঝির
গানে কি মিটে পিপাসা!

সে Century গেছে চলে'
Education হয় না টোলে
এ যুগে দিয়েছি খুলে
স্কুল কলেজ মক্তব মাদ্রাসা॥

ক'রতে ভাষার decoration,
Addition ও alteration
Improvement trust present nation
Sanitation করছে খাসা ॥

নয়তো মোদের এ জ্ঞান যে সে
গঙ্গা ডুবিল গ্যানজেস-এ,
ইনডাস এল সিন্ধুদেশে
ভিয়াস হ'য়েছে বিপাশা ॥

নতুন মালা দিয়ে গলে
বাংলা এনেছি বেঙ্গল-এ,
কলিকাতায় কাল কাটিয়ে
ক্যালকাটায় বেঁধেছি বাসা ॥

বাজিয়ে বীণা নতুন তানে
বর্দ্ধমান আজ "বার্ডোয়ানে,"
চুঁচুড়ার অদৃষ্টে ছিল
"চিনসুরা"র সুরাতে ভাসা ॥

ভেবেছিলে কেউ কি কবে
মেদিনীপুর "মিডনাপো" হবে,
কাঁথির মাথায় লাথি মেরে
"কণ্টাই"-এ ক'রবে কোণঠাসা।

"চিটাগঙ্" এই মিঠা নামে,
নাম দিয়েছি চট্টগ্রামে,
শ্রীহট্ট "সিলহেট্" আসামে
হবার কি ছিল দুরাশা।

"টিপেরা" আজ ত্রিপুরাতে,
"আউধ" এল অযোধ্যাতে,
রামচন্দ্র থাকিলে তাতে
"র‍্যাম" বনে' দেখতো তামাসা ॥

তোমার মাটি, তোমার বাটি,
আজি যে public property
নিষেধ নাই আজ সকল party
করে অবাধ যাওয়া আসা ॥

ক'রে জনাব ছাহেব জবর দোস্তী
দিলে জবর ছওগাৎ জবরদস্তি,
পোলাও কাবাব প্যাঁজ রশুনে
কুঁচকে না আর তোমার নাসা ॥

Newly born সব তোমার child
আন্‌লে "জোলা", "ব্যাল্‌জ্যাক্‌," "অস্কার-য়াইল্‌ড,"
দিলে Dinner table palatable,
"রেনল্‌ড" আর "গি দে মোপাসা।"

বাৎসায়নের বৎসগণে
আন্‌লে শুভ আমন্ত্রণে
ফ্রয়েড্‌ হ্যাভ্‌লক্‌ এলিস, করে, relish
কতই কাঁচা আজকে ডাঁশা॥

এই ভাষাতেই প্রথম মজি,
লিখনু মধুর sexology
এখন দন্তবিহীন অন্তকালে
বেদান্তে মিটাই তিয়াসা॥

মহৎ আশ্রয়ম্‌।

১৩৩৯ সাল ১৯শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা

ধনীর সঙ্গে
চিরদিন কাটে
নিত্য যোগায়ে মনটা,
আশায় আশায়
পেছনে ধরিল
তিনি দেখালেন ঘণ্টা।
পূজোর সময়
চক্ষু ছানাবড়া
মাথাটি হইল হেট,
মোসাহেব নাম
কিনিলাম শুধু
ভরিল না পোড়া পেট।

খাদ্য।

১৩৩৯ সাল ১৯শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা

ঘোড়ার মাংস খায় ফরাসী,
পিপীলিকা ব্রেজিলবাসী,
পঙ্গপাল গ্রীসিয়ান যত
সাঁওতাল, ইঁদুর শত শত
ভেকের বংশ করিছে ধ্বংস
যত চীন অধিবাসী।
আমরা বাঙ্গালী পিঠে খায়
আর দন্ত বিকাশি হাসি।

গ্রহণী।

১৩৩৯ সাল ১৯শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা

বৃদ্ধ বয়সে
করেছে বিবাহ
    কেবল চতুর্থ পক্ষে।
গৃহিণী আজিকে
গ্রহণী হয়েছে
    এর হাতে পেতে রক্ষে।
'বয়োগতে কিং
বণিতা বিলাস'
    বুঝেছেন হাড়ে হাড়ে,
প্রাণ পাত করে
কত দ্রব্য দেয়
    তুষ্ট করিতে তারে।
শঙ্কিত পদে
কম্পিত বুকে
    লইয়া চলিল মালা,
মালা দেখে বলে
আফিং খাইয়া
    জুড়াব যতেক জ্বালা।

পুজার আনন্দ।

১৩৪৪ সাল ২৪শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা

মরিবার কালে
পিতৃদেব বহু
    টাকা দিয়া গেছে পুত্রে,
পূরব জনম
সুকৃতির ফলে
    ধনী সে দখলি সূত্রে।
লাভের বিষয়
রেখে গেছে বাবা
    রোজ আসে টাকা কড়ি।
মনের মতন
করেছে বিবাহ
    ডানাকাটা এক পরী।
যেমন নাচিতে
তেমনি গাইতে
    তেমনি বাজায় বাদ্য,

হারমনিয়ামে
হার মানি বাবু
দিবানিশি তার বাধ্য॥
রকম রকম,
স্ফূর্তি চলে রোজ,
বার মাস মহাপূজা
নূতন আনন্দ
কি করিবে আর
আগমনে দশভূজা॥

আগমনী।

১৩৪৫ সাল ২৫শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা

কি খেতে আর আস্‌বি মাগো,
এবার ধরায় আসিস্‌ না।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে
মা হ'য়ে আর মারিস্‌ না॥
ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে
রেখেছিলি কাবু ক'রে,
সাবু খেয়ে ত ছিলাম ভাল,
ইচ্ছে হ'লেই খেতাম ভাত।
তাও মা আজ ঘুচিয়ে দিলি,
কর্‌লি বানে কুপোকাত।

পাত্রী।

১৩৪৭ সাল ২৭শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা

(৺ডি, এল, রায়ের "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে"—সুরে।)

হে পতি-তারিণী পাত্রী!
শ্যাম-চিকুর-ঘন-শির-সঞ্চালিনি! সেমিজ-বডীজ-গাত্রী!
কত শিশি আল্‌তা শেষ হইল তব চুম্বি চরণ-যুগ সজনী,
কত শত শাড়ী সঙ্গ লভিল তব অঙ্গ পরশি দিন-রজনী,
বহিছ রমণি, ও সুন্দর দেহে স্বর্ণ-বিমণ্ডিত গালা,
খাদ বিমিশ্রিত মাকুড়ি ইহুদী অনন্ত-বালা-ধাত্রী।
সখিগণ-ফক্কুড়ি-মুখরিত-বাসর-বিগলিত-বচনে ক্ষরিয়া
আড়-নয়ন মরি ঘাড় বক্র করি পতি-কর- টিপিয়া ধরিয়া,
অম্বর ভিতরে চাহনি ঘন ঘন অবগুণ্ঠন উপরে,
নামি নিমেষে পতি-হৃদি-পুলিনে হইলে তদধিষ্ঠাত্রী।

পরিহরি আফিস-duty যখন সে শায়িত নিশীথ-শয়নে,
বরিষ শ্রবণে দোঁহি দোঁহি রব ;—লুপ্ত সুপ্ত পতি নয়নে,-
বরিষ শান্তি ঐ তটস্থ প্রাণে হয় যদি তব অনুযাত্রী,
ওগো পতি-হৃদ্রোগ-বিনাশিনি, সকল রকম সুখদাত্রী !

বোতল সাধন।

১৩৫০ সাল ৩০শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

ভূতলে বোতলে
যা আছে আরাম
এমন কিছুতে নাই।

এ বোতল সেবা
করে নাই যেবা
কি করিল দুনিয়ায়।

বোতল বাসিনী, সন্তাপ নাশিনী,
দেব আরাধিতা দেবী।

এক বাক্যে ইহা
করিবে স্বীকার
যতেক বোতল সেবী।

এই ধরাধামে
বোতলের নামে
প্রাণটা যাহার নাচে।

জুরি ঘোড়া গাড়ী
বাড়ী জমিদারী
তুচ্ছ তাহার কাছে।

খেলে দুই ঢোক
যায় পুত্রশোক,
সব দুঃখ যায় মুছি।

চণ্ডালে ব্রাহ্মণে
বিষ্ঠা ও চন্দনে
সমভাবে হয় রুচি।

মদিরা সাধন
বোতলারাধন,
ক'জন করিতে পারে ?

পারে যেই জন
সেই মহাজন
ধন্য ধন্য এ সংসারে।

সাধন প্রণালী
শুনে সব বলি
প্রথমে গোপনে খাবে,

সাধনের বাধা
বাবা খুড়ো দাদা,
ক্রমে সবে মারা যাবে।

পিতৃ-বন্ধু যারা
বিঘ্ন বটে তারা
সর্বদা রহেনা কাছে,

কারণ করিয়া
থাকিবে সরিয়া,
টের পায় তারা পাছে।

সহধর্মিণী
সাধনে বাদিনী
বাধা দিয়ে কত কবে

রুক্ষ বাক্যে তারে
অথবা প্রহারে
দুরস্ত করিতে হবে।

বন্ধু বান্ধবে
মানা করি সবে
সাধন করিবে রোধ।

বলিও সবায়,
খেয়ে দেখ ভাই,
হইবে আরাম বোধ।

দু'একটী ডোজ,
খেতে দিও রোজ,
তাহারা হইবে চেলা।

সে সব পাজিরা
বাড়ীতে হাজিরা,
দিবে রোজ দুই বেলা।

মাংস চপ আদি
কাট্‌লেট রাঁধি
করিয়া তাহাতে চাট্‌।

পাঁচ দোস্ত মিলে
হইবে খাইলে
প্রাণটা গড়ের মাঠ।

এর সঙ্গে চায়,
খেমটা কিম্বা বাই,
তাহ'লে ক'দিন বাদ।

ঘুচে যাবে সব
বিষয় বিভব
লোকনিন্দা অপবাদ।

পুত্র কন্যাগণে
রবে অনশনে
'কেয়ার' ক'রোনা তাতে।

স্ত্রীর আঁখিজলে,
মন যদি টলে,
বিঘ্ন হবে মৌতাতে।

পত্নীরে মারিয়া
লইবে কাড়িয়া
যত তার অলঙ্কার।

তোমার বলিতে
এ ঘোর কলিতে
রাখিও না কিছু আর।

লজ্জা তোমারে
ছাড়িয়া চলিবে
সজ্জা রবে না কিছু।

চারিদিক হ'তে
দেখিবে তোমার
বোতল ছুটিছে পিছু।

চারিদিকে দেখো
সুনাম তোমার,
লোক মুখে যাবে রটি।

মরিবার কালে
রাখিয়া যাইবে
খালিয়া বোতল ক'টি।

প্রবন্ধ
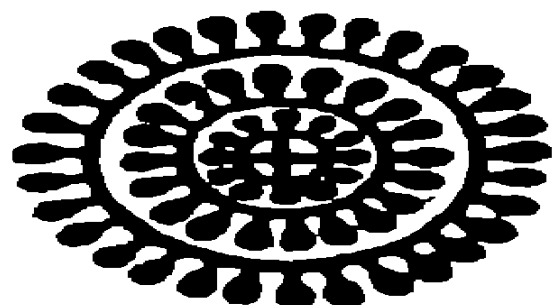
বাবু

১৩২২ সাল ১৫ই আষাঢ় ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা
ইং ১৯১৫ ৩০শে জুন।

আমরা বাঙ্গালী প্রায় দুইশত বৎসরের উর্দ্ধাধিক কাল হইতে বাবু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বাবু শব্দটী সংস্কৃত নয়, বাংলা নয়, ইংরাজী নয়, খুব সম্ভব পারসীক ভাষা হইতে মুসলমান রাজগণের সময় এই বাবু শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এই শব্দের এবং তথাকথিত জীবের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বর্তমান ঐতিহাসিকগণ এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। পূর্বকালের ও বর্তমান বিংশ শতাব্দীর বাবুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় বা লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বে বাবু বলিলে দেশের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণকেই বুঝাইত। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতালোক আমাদের সে ভ্রমান্ধকার ঘুচাইয়া দিয়াছে, কারণ বৃটিশ রাজত্বে কাহার কোন কাজ Monopoly অর্থাৎ একচেটিয়া করিবার অধিকার নাই সুতরাং বাবু গিরিটা শুধু কয়েক শ্রেণীর লোকের নিজস্ব করিয়া রাখিবার অধিকার নাই। কাজে কাজেই এখন রামা, শ্যামা, মেদো, মধো সবাই বাবু। দেশে বাবুর বাজার বসিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে পদ ও বংশ মর্যাদা বাবুর বাবুত্বের পরিচয় দিত। আর এখন পোষাক ও অঙ্গ পারিপাট্য বাবুর বাবুত্বের পরিচয় দেয়। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুচিরও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন একজন উচ্চবংশীয় বিদ্বান, চরিত্রবান ও সদ্গুণশালী ভদ্রলোক পোষাকের পারিপাট্য না থাকিলে সাধারণের নিকট বাবু বলিয়া গৃহীত হইবেন না, পক্ষান্তরে একজন নীচবংশীয়, মূর্খ, চরিত্রহীন ব্যক্তি মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হইয়া আসিলে সাধারণে তাহাকে সাদরে বাবু বলিয়া গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না। আজকাল রেল ষ্টেশনে ইহার বেশ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কুলী ও ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানগণ ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে প্রথমেই চকচকে পোষাক-ধারী চশমা আটা লোকের নিকট আগে দৌড়িয়া যায় আর বলে বাবু ঘোড়া গাড়ী চাই কুলী চাই ইত্যাদি। এদিকে হয়ত বাবু বহুকষ্টে রেলভাড়া দিয়া আসিয়াছেন সঙ্গে খোরাকী পর্য্যন্ত নাই। যে দিন আনে দিন খায়, সেও পেটে না খাইয়া সাজ সজ্জায় মন দিয়াছে কারণ সেও বাবু হইতে চায়। একটা কথায় বলে "ঘরে ছুঁচোর কীর্তন বাহিরে কেঁচোর পত্তন" আমাদের ঠিক তাই হইয়াছে। ধন্য কাল মাহাত্ম!

অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্বকালের বাবুরা সত্যবাদিতা, পরার্থপরতা, ধর্মভীরুতা, বিনয় প্রভৃতি নানা সদগুণে ভূষিত ছিলেন, আর বর্তমানের বাবুরা (অধিকাংশই) মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ধর্মহীনতা প্রভৃতি দোষগুলি অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইয়াছেন, এক কথায় পূর্বকার বাবুদের নিকট যে গুলি বর্জনীয় ছিল এখনকার বাবুদের সেইগুলিই গ্রহণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা কাঞ্চন ছাড়িয়া কাঁচে অভিলাষী

হইয়াছি। আসল হারাইয়া নকলে গা ঢালিয়া দিয়াছি। প্রকৃত ছাড়িয়া অপ্রকৃতের দাস হইয়াছি।

আজকাল যেমন ভেজাল ছাড়া কোন অকৃত্রিম দ্রব্য পাওয়া কঠিন হইয়াছে তেমনি আমাদের বাংলায় বাবুর বাজারেও ভেজালের বড়ই বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছে, এ বাজারে আসল নকল বাছিয়া লওয়া বড় কঠিন। দুগ্ধাদি তরল পদার্থের কৃত্রিমতা ধরিবার জন্য আজকাল একপ্রকার যন্ত্র বাহির হওয়ায় লোকের অনেক সুবিধা হইয়াছে কিন্তু এই বাবুর দলের কৃত্রিমতা ধরিবার কোন উপায় নাই, Bengal Chemical & Pharmacutical Works এর সহৃদয় member গণ যদি এই বাবু পরীক্ষা করিবার একটা যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারেন তবে দেশের লোকের একটা প্রকৃত অভাব দূর হয় আর বিজ্ঞান জগতে একটা মস্ত নাম আসিয়া যায় কেমিক্যাল বাবুদেরও স্পর্দ্ধা কমে।

সভ্যতা।

১৩২২ সাল ১৫ই ভাদ্র ২য় বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

ইং ১লা সেপ্টম্বর ১৯১৫।

সভ্যতা শব্দের ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক না, আমরা মোটামুটী কতকগুলি সামাজিক আচার ব্যবহার, আদব কায়দা ও নিয়মের সমষ্টিকেই সভ্যতা বলিয়া বোধ করি, এই সভ্যতা মানবের বড় আদর ও গৌরবের বস্তু। যে জাতি এই সভ্যতালোকে বঞ্চিত অন্যান্য সভ্য জাতিগণ তাহাদের প্রতি অসভ্য, বর্ব্বর প্রভৃতি কতিপয় বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

পরিবর্তনশীল কালের অপ্রতিহত গতিতে সংসারের যাবতীয় বস্তুরই সময়োচিত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, প্রত্যেক বস্তুই যেন তাহার পুরাতনত্ব ছাড়িয়া নূতনত্ব পাইবার আশায় ব্যস্ত হইয়া কালের অনন্ত স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চায়। তাই আমরাও আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কিছু নূতনত্ব দিবার আশায় পাশ্চত্য সভ্যতার শরণ লইয়াছি। অনেক সমাজতত্ত্ববিদের মতে আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছি সন্দেহ নাই। টড, হুয়েনসাং, মিগাস্থিনিস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় সভ্যতাকে তৎকালীন সভ্যজগতে অতি উচ্চাসনই দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতবাসীর ন্যায় সরল, ধার্ম্মিক, বিদ্বান, সাহসী, বিশ্বাসী, সদালাপী, পরার্থপর ও সংযমী জাতি পৃথিবীতে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসী আর সেই সভ্যতাকে সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। আমরা এখন পুরাতনের স্থলে নূতনকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে, আমরা আসল নকল বাছাই করিতে পারি নাই, তাই গুণ অপেক্ষা অগুণের ভাগ অধিক লইয়াছি, তাই বিদ্যা উপার্জন করিতে আসিয়া অবিদ্যার ঝুড়ি মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছি। কপটতার সূক্ষ্মাবরণে আপনাকে আচ্ছাদিত রাখিয়া জনসমাজে আপনার প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে শিখিয়াছি।

প্রাচীন সভ্যতা আমাদিগকে ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্বধর্মে অনুরাগ, দেব দ্বিজে ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেয় কিন্তু আর আমরা পুরাতনের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। আমরা নূতন সভ্যতালোক প্রাপ্ত নব্য ভারতবাসী উপরোক্ত গুণরাশিকে কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, নূতন সভ্যতা আমাদের মনের দুর্বলতা দূর করিয়া দিয়াছে। আমরা এখন পরনিন্দায় তৎপর হইয়াছি, সামান্য দুই টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া একজনের দুইশত টাকার ক্ষতি করিতে আর অধর্মের ভয়ে আমাদিগকে ইতঃস্ততঃ করিতে হয় না, হলপ করিয়া মিথ্যা মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ভগবান মন্দ করিবেন এই তুচ্ছ ভয়ে আর আমরা ভীত হইনা, আমরা দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে আমোদ অনুভব করিয়া থাকি। আমরা নির্গুণ ধনবানের কৃপা-কণা পাইবার জন্য মিথ্যা তোষামোদ করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আমরা না করিতে পারি এমন কাজ নাই, ধন্য আধুনিক সভ্যতা! তোমার গুণের কথা লোক সমাজে প্রচার করিবার শক্তি আমার নাই। তোমার অলৌকিক শক্তিতে ভারতবাসী অভিভূত হইয়াছে, যে ভারতবাসী প্রাচীনকালে দান, ধর্ম, ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত সেই ভারতবাসী আজ তোমার প্রভাবে স্বার্থের দাস হইয়াছে, অনেকে বলেন তোমার এখনও সম্পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ ঘটে নাই। সে দিনে না জানি আরও কত দেখিব!

দাদা ঠাকুরের পত্র।

১৩২২ সাল ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

প্রিয় সম্পাদক ভায়া,

সহৃদয় ভারত গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি কর্মের ভার দেশবাসীগণের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। যেমন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি। সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার ভারও তোমাদিগের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। দেশেও দশের হিতের জন্য স্বার্থত্যাগী পুরুষের অভাব নাই। তোমরা ইচ্ছামত সেই সকল মহাপুরুষগণের মধ্যে উপযুক্ত লোক বাছাই করিবার জন্য স্ব স্ব মত (ভোট) দিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমরা সত্য কথা বল দেখি তোমাদের এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছ কি? না এই মত প্রকাশের সময় বাকী খাজনা, জমি উচ্ছেদ, বন্ধু-বিচ্ছেদ ও ব্রহ্মশাপের ভয় করিয়া ভোট দিয়া থাক? আমার বোধ হয় তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ ভোটদাতাগণই উপরোক্ত ভয়ে ভীত হইয়া ভোট প্রদান করিয়া থাকে।

যদি প্রদত্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম না হও, তবে সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট, সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট করিয়া অত হাঁপাও কেন? তোমরা যা চাও তা পাইলেও রাখিতে পারনা;—দোষ কার? তোমাদের না সরকার বাহাদুরের?

এ বৎসর মেম্বর ও কমিশনের নিয়োগ পাইয়া দেশময় সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে, পালে পালে অবৈতনিক পদপ্রার্থীগণ, নিজেরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। আত্মীয় স্বজনকে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘর্মাক্ত কলেবরে গ্রামে গ্রামে

পল্লীতে পল্লীতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভোট সংগ্রহের নিমিত্ত ঘুরিতে বাধ্য করিতেছে। কেহ কেহ আবার বেতন দিয়া ক্যানভাসারও নিযুক্ত করিয়াছে, কেহ কেহ আবার স্বজাতি ভোটারগণের সহিত স্বীয় অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের কুটুম্বিতার কথা স্বরণ করাইয়া দিয়া পরম আত্মীয় সাজিতেছে। কোন কোন ভোটভিখারী হয়ত ভোটারের শ্বশুরের, মামার, ভগ্নীপতির, সম্বন্ধীর বা জামায়ের কেলাস ফ্রেণ্ড সাজিয়া ভোটের দাবী করিতেছে। কেহ বা কোনও জমিদারের নিকট স্বীয় মহৎ উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রজাগণের ভোট প্রাপ্তির আশায় "দেহি পদ পল্লবমুদারম্" বলিয়া জয়দেবী শ্লোকের আবৃত্তি করিতেছে। কেহ কেহ বা ভোটারের উত্তমর্ণের দ্বারা তাহাকে অনুরোধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কেহ বা এই ভোট সংগ্রামের রণক্ষেত্রে সোডা, লিমনেড, পান, সিগারেট ও মিষ্টান্নের ভাণ্ডার খুলিবার ও জয়লাভ করিলে ভোটারদিগকে পাঁঠা পোলাও খাওয়াইবার প্রলোভন দিতেছে। এইরূপে ভোটভিখারীগণ নানাপ্রকারে ভোটদাতাগণের ভোট পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় যে ভোটার স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন তিনিই মানুষ। আর যিনি স্বাধীন মত প্রকাশে অক্ষম হইবেন আমি তাহাকে মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিনা।

ভোট সংগ্রহ মানে কি জান? আমাকে উপযুক্ত বল, আমাকে উপযুক্ত বল বলিয়া সাধারণকে অনুরোধ করা মাত্র। আরে ভাই, যার যোগ্যতা থাকে সে কি এইরূপ যোগ্য হইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরে? লোকে যোগ্য লোককে আপনা হইতেই যোগ্য বলিয়া স্বীকার করে।

আর ভোটপ্রার্থী ভায়ারা,

তোমরাও আমার উপর চটিও না। আর চটিবেই বা কেন? যাহারা দেশের জন্য স্বীয় কর্মের ক্ষতি সহ্য করিতে পারে, তাহারা একজনের দুটো কথা সহ্য করিতে পারে না কি? যদি কথাই সহ্য করিতে না পার ভোট ভিক্ষা করিবার সময় লাঞ্ছনা সইবে কি করিয়া?

যখন শ্রীকৃষ্ণ একদিন গোচারণের সময় শ্রীদামের নিকট পুরীতে (জগন্নাথ ক্ষেত্রে) জগন্নাথ হইয়া অবস্থানের কথা জ্ঞাপন করেন তখন শ্রীদাম বলিয়া ছিলেন—

সয়না ক রোদ সোনার নীলকমল।
বল কেমনে সইবে নোনা জল॥

আমার কথায় ভোট ভিক্ষা ছাড়িবে না জানি. তবুও গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের মত একটু সর্দ্দারি করিতেছি। যদি দেশের কাজে স্বার্থ ত্যাগের ইচ্ছাই থাকে তবে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কি বোর্ডের মেম্বর হওয়া ভিন্ন আর কোনও পন্থা নাই? এই যে দেশের লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে, অন্ততঃ আধসের চাউলের স্বার্থত্যাগ করিয়া কাহারও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার প্রবৃত্তি কোনও দিন তোমার হইয়াছে কি? শত শত নিরাশ্রয় রোগী শুশ্রূষা অভাবে প্রাণ হারাইতেছে; কাহারও মুখের কাছে এক গ্লাস জল আগাইয়া দিয়া তাহার কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করিয়াছ কি? পাড়াপ্রতিবেশীর মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার সময় গামছা ঘাড়ে করিয়া কখনও অগ্রগামী হইয়াছ কি? বোধ হয় অনেকেরই এই সকল প্রবৃত্তি হয় না, কেন হয় না? বোধ হয় এই সমস্ত কর্মে স্বার্থত্যাগ করিলে গেজেটে নাম প্রকাশ হইবে না বলিয়া?

তবে বলিতে হইবে তোমরা স্বার্থের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে রাজি। আর মেম্বর পদে নিযুক্ত হইলে শুনি T. A. বিল দ্বারা অর্থ আগম হইবার আশাও আছে। সম্মান লাভও হয় দুই পয়সা আমদানীও হয়। তবে তোমরা আহারের লোভে অনাহারী নাম গ্রহণ কর। অনেক লোক লুচি খাইয়া একাদশী করে তোমরাও ঠিক তাহাদেরই মত। তোমাদের স্বার্থপূর্ণ স্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তি যত দিন থাকিবে তত দিন সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল নাই। একজন কর্মক্ষম উপযুক্ত পণ্ডিত লোক ভোট অভাবে বিফল মনোরথ হইবে। আর একজন নিরক্ষর বৃদ্ধ মূর্খ অসদুপায়ে ভোট সংগ্রহ করিয়া সফল কাম হইয়া হাসিমুখে বাটী ফিরিবে। ঘরে বসিয়া T. A. বিল পাশ করতঃ দশের অর্থ লইয়া স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে। বলিহারী দেশ! বলিহারী দশ! বলিহারী স্বার্থত্যাগ!

শ্বাশুরী-বৌ!

১৩২২ সাল ২৬শে জৈষ্ঠ ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী একমাত্র পুত্র কালীকুমারকে লইয়া বিধবা হইয়াছেন। বৃদ্ধা ত্রিপুরা সুন্দরীর একটু শুচিবায় ছিল। দুর্গাপুরের শিবরাম গোস্বামী মহাশয় বেশ শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ বলিয়া ত্রিপুরা তাহার কন্যা হৈমবতীর সহিত স্বীয় পুত্র কালীকুমারের বিবাহ দিলেন। ত্রিপুরার ধারণা ছিল যে গোঁসাই বাড়ীর মেয়ে বেশ শুদ্ধাচারিণী হইবে। কিন্তু পুত্রের বিবাহের পর দেখিলেন হৈমবতী সেরূপ হইলেন না। সাধারণ বালিকাদিগের যেমন আচার ব্যবহার হৈমবতীরও ঠিক তাই!

ছোঁয়া নাড়া লইয়া ত্রিপুরার সহিত হৈমবতীর মাঝে মাঝে দুই এক পাল্লা ঝগড়া হইয়া গেল। ফলে শ্বাশরী বৌ উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হইল। কালীকুমার মাকে বাঘের মত ভয় করিতঃ কলির ছেলে বৌকেও কোন কথা বলিবার সাহস পাইত না। কাজেই শ্বাশুরী ও পুত্রবধুর বিবাদের মীমাংসা হইল না বিবাদ ক্রমশঃ তুমুল হইতে লাগিল।

প্রায় তিনমাস কাল উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ আছে। এমন সময় হঠাৎ ত্রিপুরা সুন্দরী খুব কাহিল হইয়া পড়িলেন। এবার কিন্তু হৈমবতীর শুশ্রূষা ভিন্ন ত্রিপুরার উপায়ন্তর রহিল না। কালীকুমারের অনুরোধে হৈমবতী শ্বাশরীর সেবা করিতে লাগিল বটে কিন্তু কথাবার্তা বন্ধই রহিল। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হৈমবতী প্রত্যক্ষভাবে "মা ঔষধ খান" এইরূপ পরোক্ষভাবে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল।

ত্রিপুরাও জল খাইবার দরকার হইলে "বৌমা জল দাও" এইরূপ ভাষা ব্যবহার না করিয়া বলিত "একটু জল পেলে খেতাম", জেদ বালিকা হৈমবতীরও যেমন শয্যাগত বৃদ্ধা ত্রিপুরারও তেমনি, মরণকালেও ত্রিপুরা তেজ বজায় রাখিতে ত্রুটি করিতেছে না।

হৈমবতী ও ত্রিপুরার এই মনোমালিন্য ঘুচাইবার জন্য একদিন কতকগুলি প্রতিবেশিনী কালীকুমারের সমবেত হইয়া হৈমকে বলিল দেখ বউ, ঠাকুরণের একমাত্র পুত্রবধু তুমি; বুড়ো মানুষ যদি কখনও কোন রূঢ় কথা

হইত যেন কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া গঙ্গাস্নানার্থী নিরাশ্রয় যাত্রীবৃন্দের কষ্টমোচনের জন্যই এই তুলসীবিহার বাগীচাবাটী নির্মাণ করিয়াছেন। তখন এখানে একা আমি কেন, কত শত লোক রান্না করিত, উনোন খুঁড়িত, কেহ ত কই কখন 'নিকাল যাও' কথা বলে নাই ?

বাগীচাবাটী তখন সত্য সত্যই বাগীচা বাটীই ছিল। এখন কিন্তু তালগাছ নাই, কেবল তাল-পুকুর নামই আছে। মা ভাগীরথী ইহার সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করিয়াছেন। পূর্বদিকের ঘরগুলি সমভূমি হইয়াছে, আর সিংহদ্বার নাই, নহবৎখানা নাই। বাড়ীটির অধিকাংশ স্থানই শৃগাল ও কুক্কুর-বিষ্ঠায় পূর্ণ। বাটীর মধ্যস্থলের সৌধ মন্দিরটীতে দুষ্ট কপোতগণ মলত্যাগ করিয়াছে। আমি স্নানের পর একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া সেই স্থানে রান্না করিবার মতলব করিতেছি ; এমন সময়ে একজন মুসলমান বরকন্দাজ একগাছি বংশদণ্ড হস্তে রন্ধনাভিলাষী যাত্রীগণের নিকট আসিয়া বলিল "নিকালো"। ভাবিলাম—এ আবার কোন্ আইন রে বাবা! তারপরই জ্ঞান হইল যে, ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে বোধ হয় উচ্ছিষ্টাদি পড়িয়া থাকে বলিয়া সেবাইতগণ এই নিয়ম করিয়াছেন। অগত্যা দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়া বহির্গমনে উদ্যত হইলাম। বাহিরে আসিবার সময় আম কিনিব বলিয়া এক ঘরে এক মুসলমান আম বিক্রেতার নিকট গেলাম। দেখিলাম সেও রান্না করিতেছে, তাহাকে রাঁধিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'ভাই সাহেব, তোমরা যে এই ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে পেঁয়াজ রাঁধ কেউ কিছু বলে না ?" ভাই সাহেব বলিল "ঠাকুর মশাই আমরা আগে নজর দিয়া বাবুদের নজর বন্ধ করিয়াছি, তা ছাড়া প্রতিদিন তোলা ত দিয়াই থাকি ; সে তোলা নামেই তোলা, কিন্তু কার্য্যে জবরদস্তি বলিলেও হয়।"

তখন আমার মাঘী পূর্ণিমার গঙ্গাস্নানের কথা মনে হইল, সেই সময়ে দেখিয়াছি জন কয়েক কাবুলী সওদাগর দক্ষিণ পশ্চিম দিকের একটি কুঠুরীতে রান্না করিতেছিল। এখন শুনিলাম নাকি সেই ঘরের অতি নিকটে বৃন্দাবনবিহারীর ভোগ পাক হয়।

মুসলমানদিগের এইরূপ অচিন্তনীয় সুবিধা (পয়সা দিয়া কেনা সুবিধা) ধর্মপ্রাণ গঙ্গাস্নানার্থী হিন্দু যাত্রীগণের এইরূপ অকথনীয় লাঞ্ছনা দেখিয়া আমার গোলকধাঁধা লাগিল। মাথা ঘুলাইয়া গেল। এ রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা এ বৃদ্ধের পুরাতন মস্তিষ্কের কর্ম নয় বলিয়া তোমাকে জানাইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি তুমি প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জনের চেষ্টা করিবে।

আশীর্বাদক
তোমার দাদাঠাকুর।
P. G.

দাদা ঠাকুরের পত্রের প্রতিবাদ।

১৩২২ সাল ১৫ই আষাঢ় ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা

ইং ৩০শে জুন ১৯১৫।

দাদাঠাকুর গঙ্গাপূজায় গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আসিয়া ঁতুলসী বিহার বাটীতে পাকের স্থান পান নাই যেহেতু জনৈক মুসলমান পেয়াদা তাহাকে "নিকাল যাও" বলিয়াছিল তাহাতে তিনি যে পত্র লিখেন উক্ত পত্র লিখায় ঘটনা তদন্ত জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত হই। তদন্তে যাহা জানিলাম তাহা দাদাঠাকুরের অবগতির জন্য লিখা উচিত বিবেচনায় লিখিলাম। দাদাঠাকুর মহাশয় যদি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া জানিতে চান তবে তাহা জানাইতেও পারি।

দাদাঠাকুরের বয়স হইয়াছে, বৃদ্ধ হইলে রাগ হয় তাহাতে তিনি কিছু আফিং সেবন করেন তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। গঙ্গাস্নান জন্য নেশা চটিয়া গিয়াছিল। বাটীতে রান্না ভাত পাওয়ার পরিবর্তে নিজে রান্না করিতে হইয়াছিল গতিকেই দাদাঠাকুরের রাগের মাত্রাটা একটু বেশী হওয়ায় তাহা পত্র খানিতেই প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তাঁহার লিখা মধ্যে ২/১টি সত্যও আছে তাহা দেখিলাম, অপরগুলির সত্যতা সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ঁতুলসীবিহার বাটীটির পূর্বদিকটা ইতিপূর্বে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঁকৃত্তি দত্তের কৃত্তি; কৃত্তিনাশিনী মা নষ্ট করিয়াছেন। সে সময় দাদাঠাকুর উপস্থিত থাকিলে বাটীটীর শোভা থাকিবার সম্ভব ছিল কারণ জহ্নু মুনির বংশ গঙ্গা বোধহয় ভয়ে বাটীটী ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারিতেন।

কালে কিছুই স্থায়ী হয় না। বহুদিনের জরাজীর্ণ বাটী ক্রমে পড়িতে আরম্ভ করিয়া যাহা ছিল তাহাও অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। চাউলের দরে আজকাল সকলকেই বিব্রত হইতে হইয়াছে। আর জমিদারগণের অবস্থাও সচ্ছল নয়, গতিকে সময় মত বাগিচার মালিকগণ মেরামত করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তাহাতে সরিকান সম্পত্তি এক পক্ষ মত করিলে অন্য পক্ষের মত হয় না। দাদাঠাকুর বোধহয় জানেন যে, "ভাগের মা গঙ্গা পায় না"। বাগিচাটীর তদ্রূপ অবস্থা সত্ত্বেও পরে বড় তরফের কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় বাটীটী মেরামত করা প্রয়োজন বোধে নূতন করিয়া পত্তন করিয়া প্রায় অর্দ্ধেক অংশ নূতন করার পর সরিকদের অমত জন্য সম্পূর্ণ হতে পারে নাই। দরজা খোলা থাকিলে কুকুর শৃগালের বিষ্ঠার অভাব হয় না সুতরাং তাহা আছে। কার্ণিশ থাকিলে পায়রা স্বভাবতই তাহাতে বসিয়া থাকে। বিষ্ঠাত্যাগ তাহারা স্থানান্তরে গিয়া করে না। কাজেই পায়রা বিষ্ঠা সময়মত পরিষ্কার করা ব্যতীত সকল সময় পরিষ্কার অসম্ভব।

এক্ষণে "নিকাল যাও" ও "পাক না করিতে দেওয়ার কথা"। মুসলমান পিয়াদার কৈফিয়তে জানা গেল যে সে আদৌ "নিকাল যাও" বলে নাই তবে "ভিতরে পাক করিবেন না বাহিরে পাক করিবেন" এই কথা বলিয়াছিল। বহু গঙ্গা স্নানার্থী যাত্রী উক্ত বাটীতে পাক করিয়াছে তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। এখনও পোড়া ও ভাঙ্গা হাঁড়ি বাটীর মধ্যে পড়িয়া আছে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। আর তিনিও আমওয়ালাদিগকে পাক করিতে দেখিয়াছেন, কাবুলীদিগকে পার্শ্বের কুঠরীতে পাক করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা নজর দিয়া নজর বন্ধ

করিয়াছে তাহা তাঁহাকে বলিয়াছে কিন্তু তাহার মূলে সত্যতা নাই। কারণ তাহাদিগকে বিনা ভাড়ায় ও বিনা নজরে আম্র বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়। তবে আম্রের তোলা যা কিছু লওয়া হয় তাহার জুলুম নাই। তোলা দেওয়া বিক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, পচা আম্রটী দিয়া বিদায় করিতে পারিলে ভালটি তাহারা দেয় না। আর তাহারা না হয় নজর, তোলা দিয়া নজর বন্ধ করিল। আর কাবুলীগণ কি নজর তোলা দিয়াছিল সেটা তো দাদাঠাকুর উল্লেখ করেন নাই। তবে তাহারা পার্শ্বের কুঠরীতে পাক করিতে পাইল কেন? ইহার দাদাঠাকুর কি মীমাংসা করিলেন? কাবুলীরা পাক করিতে পাইল, অন্য বহুতর যাত্রী পাক করিল আর দাদাঠাকুর তথায় একটু পাকের স্থান পাইলেন না। তাহার সঙ্গে কি পিয়াদার কোন জাত ক্রোধ ছিল? তাহাও অসম্ভব কারণ তিনি এখানকার অধিবাসী নয়। তবে ইহা আর কিছুই নয় কেবল নেশা ছুটিয়া যাওয়াই রাগের মাত্রা বেশী হওয়া। এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণ! ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করুন যে কি ঘটনা। আর এক কথা সম্পাদক মহাশয় এ বাটীর মালিকদিগের অবস্থা ও বাটীর অবস্থা সকলেই জানেন তবে তিনি মোটা পেটের কথা লিখিলে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু নাম আছে কাজ নাই কারণ চাউলের দর যে আট সের কি খাইয়া পেট মোটা হইবে তাহা কি সম্পাদক মহাশয় খবর রাখেন না? সম্পাদক মহাশয় লিখিয়া কাগজ পূর্ণ করিলেন এক্ষণে দাদাঠাকুর উপস্থিত হইবেন কি? তাহলে ভাল করিয়া তদন্ত করিয়া এ তোলা দিতে পারিলে এ গরীব ব্রাহ্মণের কিছ উন্নতি হয়।

তদন্তকারী কর্মচারী।
S. Chatterjee.

আফিংখোর দাদাঠাকুরের খেয়াল।

১৩২২ সাল ৫ই শ্রাবণ ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা
ইং ২১শে জুলাই ১৯১৫

প্রিয় সম্পাদক ভায়া,

তোমার খবরের কাগজ বাহির হওয়া অবধি মনে করিয়া আসিতেছি যে একটা কিছু লিখিয়া নামটা জাহির করিয়া লই কারণ নাম জাহির করিবার পক্ষে খবরের কাগজের ন্যায় উপযুক্ত জিনিষ আর দ্বিতীয় নাই। সাবেক কালের সেই জয়ঢাক ইহার কাছে সম্পূর্ণরূপে হার মানিয়া একেবারে সাগরপারে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু ভায়া আমরা সে কালের ধরণের লোক ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া হঠাৎ কোন কাজ করিতে সাহস করি না। আজকাল দেশের যে রকম আবহাওয়া তাতে আমার মনে হয় যে এই খবরের কাগজ বাহির করিতে যাওয়া তোমার একটা মস্ত কুবুদ্ধি। আর সেই কাগজে লিখিয়া নাম জাহির করিবার আশা করা আমারও দুর্বুদ্ধি কারণ তুমি হয়ত উচিত কথা লিখিতে যাইয়া কোনদিন defamation এর মোকদ্দমায় পড়িয়া শ্রীঘর বাস করিবে আর আফিং প্রসাদাৎ article লেখার যে একটা উচ্চ দুরাশা সর্বদাই আমাকে গরম রাখিয়াছে সেই গরমটুকু হারাইয়া হিতোপদেশের

বিষ্ণু শর্মার সেই মূষিকের ন্যায় আমিও স্বজাতি সমতাং গতম্ হইব, তোমার কি মনে হয় জানিনা আমার কিন্তু মনে হয় ধনাধিক্যের গরম ও উচ্চ আশার গরমটা একই রকমের কারণ অর্থহীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না আর যদি যায় তবে সে গরীবের ঘোড়া রোগের মত, ঘোড়াও হয় না রোগও সারে না। তুমি ও তোমার পাঠকগণ হয়ত মনে করিতেছে যে এ লোকটার moral courage নাই, তা মনে করিও না, তবে মৌতাতের মাত্রাটা আজ একটু কম হওয়ায় মেজাজটা খিট মিটে বোধ হইতেছে, বুড়া বয়সে তোমাদের ন্যায় ছেলে ছোকরাদের মত moral courage দেখাইতে যাইয়া গুতো খাওয়ারও তত ইচ্ছা নাই, তবে যদি তুমি সাহস দেও তবে বারান্তরে দেখা যাইবে।

আশীর্বাদক

তোমাদের দাদাঠাকুর।

"মন, হারালি কাজের গোড়া।"

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ২২শ সংখ্যা

আজ দেশের উন্নতি বিধানার্থ চতুর্দিকে নানা আন্দোলন হইতেছে। বহির্দৃশ্য দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন এতদিন পরে এই সুষুপ্তি-গত জাতিটার মোহ ভঙ্গ হইতেছে, এতদিনে যেন সে তাহার আলস্য-শয্যা ত্যাগ করিয়া উত্থাপনের পথে ছুটিতেছে, এতদিনে যেন সে অজ্ঞানতার তামস-গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া আলোক রাজ্যে পেঁছিবার জন্য পদপ্রসারণ করিয়াছে। এই দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনে বিদেশ-জাত পণ্য দ্রব্য বর্জন জন্য টাউন হলে বক্তৃতার বন্যা প্রবাহিত হইতেছে, কংগ্রেস-মণ্ডপে স্বায়ত্তশাসনের অশ্বডিম্বে তা' দেওয়া হইতেছে ; ব্রাহ্মণ তাঁহার লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হইয়া বিক্রমপুর হইতে বীরভূম, বীরভূম হইতে বহরমপুরে ছুটাছুটী করিতেছেন ; কায়স্থ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইয়াছেন ; বৈদ্য "দাশ (?)-শর্মা", "সেন-শর্মা"র পালক পরিয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ নানা আন্দোলন দদ্রুর ন্যায় দেশ-মাতৃকার সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ত আজ বহু বর্ষ অতীত হইল, কিন্তু এইরূপ বিবিধ আন্দোলনের পরিণাম কোন পথে ছুটিতেছে? দেশের এক শ্রেণীর যুবক স্বদেশ-ভক্তির ধুয়া ধরিয়া দস্যুতা আরম্ভ করিল, আদর্শ রাজভক্ত বলিয়া যে জাতি আখ্যাত হইয়া আসিতেছিল, তাহার বর বপু রাজদ্রোহিতার কলঙ্ক-লেপে সংলিপ্ত হইল ; রাজভক্তি তোষা-মোদীতে পরিণত হইল। ইতঃপূর্বে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, যে সময় বহরমপুরে জাতির অঙ্গ পুষ্ট করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সভার প্রণবঝঙ্কারে ও বক্তৃতাহুঙ্কারে সভামণ্ডপ মুখরিত এবং বক্তৃবৃন্দ করতালি ও বাহোবা'য় প্রশংসিত, ঠিক সেই সময় আদর্শ দেশভক্ত মুসলমান মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন জনৈক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ সন্তানের সাহায্য জন্য কলিকাতার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিপন্ন ব্রাহ্মণের কাতর ক্রন্দনে মুসলমান মৌলবীর প্রাণ কাঁদিয়াছিল, কিন্তু স্বজাতি-উন্নতি-পরায়ণ দেবতা সঙ্ঘের—ব্রাহ্মণসভার—কর্ণপটহে একটিও আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়া তাহাদের চারিটি শ্রেণী একত্র করিবার উদ্যোগ করিল,

সমগ্র ভারতের কায়স্থকে এক সূত্রে বন্ধন করিতে প্রয়াসী হইল। কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। প্রতি শ্রেণীই উপবীতী ও অনুপবীতীতে দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া পড়িল। সমগ্র ভারতের কায়স্থকে একীভূত করা ত দূরের কথা;—ছিল চারিটি শ্রেণী, পরিণত হইল আটটিতে। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইল। বৈদ্য দেখিল বেগতিক। বৈদ্যকে কায়স্থের উপরে থাকিতেই হইবে। কিন্তু কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে বৈদ্যের ব্রাহ্মণ না হইলে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে কি করিয়া? অগত্যা দাসের "স"এর লোপ হইল, 'শ' কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া উহার হীনত্ব ঘুচাইল। ফলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যে একটা বিদ্বেষের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

এই যে আমরা প্রতিকার্য্যে বিফল-মনোরথ হইতেছি, ইহার মূল কারণ অবশ্যই আছে। সে দিকে আমাদের কাহারও দৃক্‌পাত নাই। আমরা মূল খোয়াইয়া বসিয়া আছি, ভিতরের শাঁসটুকু ফেলিয়া দিয়া কেবল "খোসা লইয়া মারামারি" করিতেছি। সেই মূল-চরিত্র এই চরিত্রের প্রতি টানের মত টান কয়জন নেতার আছে? এই চরিত্র-সৃষ্টির জন্য কয়টি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? আজ বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, দেশে বহুতর নেতা জন্মগ্রহণ করিতেছে, বৎসর বৎসর বি. এ, এম্. এ, তে সংবাদ-পত্রের কলেবর পূর্ণ হইতেছে; কিন্তু মানুষের সৃষ্টি হইতেছে না। এই যে সমস্ত সদনুষ্ঠান পণ্ড হইয়া যাইতেছে, মানুষের অভাবই তাহার মূল কারণ নহে কি? দেশে নেতৃত্ব শক্তির অভাব নাই, মনীষার অভাব নাই, মৌলিকতা-সৃষ্টির অভাব নাই;—অভাব মনুষ্যত্বের।

যদি তোমাদের লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাও, যদি সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে চাও, তাহা হইলে আগে চরিত্র-সৃষ্টির পন্থা আবিষ্কার কর। জাতির প্রাণ ঐখানেই রহিয়াছে। আগে ভিত্তি সুদৃঢ় কর; নতুবা অট্টালিকার ভার ধারণ করিবে কে?

আমাদের খোকারা "ভবিষ্যৎ পিতা"র সম্মানরক্ষাকল্পে বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ করে। এই খোকাদিগকে তোমরা "খোকাবাবু" করিবার বাসনাটুকু বর্জন করিবার জন্য একটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে পার কি? "লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই" ভুলিতে পার কি? দেখ, ভাব—বেশ চিন্তা করিয়া বোঝ।—তোমরা কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসিতেছ? তোমাদের ভালবাসার পরিণাম সর্বনাশ, তোমাদের অপত্যস্নেহের পরিণাম অকাল মৃত্যু।—ইহা বুঝিয়াছ কি? বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপরেই জীবনের উন্নতি অবনতি অনেকটা নির্ভর করে। আবেদন-নিবেদনের ঝুলি স্কন্ধে বেড়ানো ত তোমাদের সহজাত সংস্কার। যাহাতে বিদ্যালয়ে চরিত্র-সৃষ্টির সমধিক আলোচনা হয়, তাহার জন্য সকলে সমবেত হইয়া একটি নিবেদন কর না কেন? গলা ত ভাঙ্গিতেছই, না হয় আরও একটু ভাঙ্গিল? "বোঝার উপর শাকের আঁটি"টা বই ত নয়?

তাই আবার বলি—যদি দেশের উন্নতি করিতে চাও, যদি তোমাদের সকল আন্দোলনকে সুফলপ্রসূ করিতে চাও, তাহা হইলে চরিত্র সৃষ্টি কর,—মানুষ তৈয়ারী কর। ইহাই কাজ। কাজের গোড়া হারাইয়াছে, গোড়া খুঁজিয়া বাহির কর;—তাহাকে শক্ত কর। দেখিবে মহাপ্রলয়ে দুনিয়া ধ্বংস হইলেও তুমি অচল অটল হইয়া উন্নত শিরে নিত্য অবস্থান করিবে।

আশার ইঙ্গিত।

১৩২৪ সাল ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

মানুষ যখন বিপদ-বারিধি-বক্ষে পতিত হইয়া উদ্ধার কর্তার জন্য উন্মুখ আগ্রহে ব্যস্ত সমস্ত হয়, যখন সে তাহার শেষ নিশ্বাসের প্রতীক্ষায় শিথিল অঙ্গে হতাশ প্রাণে স্রোতের মুখে গা ভাসাইয়া দেয়, তখন যদি কাহারও কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পায়, তাহাই তাহার কাছে দেববাণী বলিয়া অনুমিত হয়। মনে হয় সে বাণী যেন অমরার মধুমাখা অমৃতবাণী ; যেন সেই জ্ঞান-প্রাণ-শক্তি-সঞ্চারিণী বাণী তাহাকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দেবতার নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছে। কোনও কিছু চরম সীমায় নীত হইলে তাহার পরিবর্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দুঃখ যখন সর্বশেষ সীমায় পেঁছায়, তাহার পরক্ষণই সুখের প্রারম্ভ মুহূর্ত।

আজ আমরা ভীষণ বিলাসিতার বিপুল বারিধি-বক্ষে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া নিজের মরণ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছি। এই বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সিন্ধু-পথে আমাদিগের জীর্ণ তরীখানি বাহিতে গিয়া আজ অকূল পাথারে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। এই জীবন-সংশয় দুরবস্থায় পতিত হইয়া যেন কাহার সুমধুর কণ্ঠস্বর আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে ; বুঝি বা দেবতা এতদিনে সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। আমরা বিলাতী সভ্যতার মোহে আমাদিগের সকল সত্তা বিসর্জন দিতে বসিয়াছি। তাহাদিগের "ক্ষীরটুকু" বাদ দিয়া "নীরটুকু" গ্রহণ করিতে বসিয়া আজ "স্বখাদ সলিলে" ডুবিয়া মরিতেছি। আজ আমাদিগের মহামান্য গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে মহাশয় এই দারুণ দুর্দিনে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, এই ভীষণ তামসী নিশায় আশার আলোক-বর্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন, মুমূর্ষুকে রক্ষা করিবার জন্য সঞ্জীবন মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণর মহোদয় সে দিন "ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে" আমাদিগের ভবিষ্যতের ভরসা, আমাদের কাঙালের দুলাল ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা আমরা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমাদিগের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তাহা অত্যুজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

তিনি ছাত্রবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"You should not neglect Western Science, Arts, and Literature, but you must not at the same time cut yourselves adrift from the spiritual instincts which are your immortal birth-right."

অর্থাৎ "পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যকে উপেক্ষা করা তোমাদিগের উচিত নহে। কিন্তু যে আধ্যাত্মিকতা তোমরা পুরুষানুক্রমে লাভ করিয়াছ, যাহা তোমাদিগের জন্মগত অধিকার এবং সংস্কার তাহা যেন হেলায় হারাইয়ো না।"

আমাদিগের গবর্ণর মহোদয় বিবিধ উদাহরণ দিয়া ছাত্রবৃন্দকে তাহাদিগের কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন...."সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়া তত্রত্য সুধী মণ্ডলীর সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তজ্জন্য কি তিনি তাঁহার মাতৃভূমি কিম্বা মাতৃভাষাকে বিস্মৃত হইয়াছেন ? তাঁহার লেখার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে কি বাঙ্গালা দেশের হৃদয়ের ভাব প্রকাশিত নহে ? এতদ্ব্যতীত তোমাদের সাহিত্য

সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কি এই 'সুজলা সুফলা' বঙ্গভূমির চিত্র অঙ্কিত করেন নাই ? " তৎপরে পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে জ্ঞানার্জন পূর্বক আত্মোন্নয়ন সম্বন্ধে সার জগদীশচন্দ্র বসু ও রাজা রামমোহন রায় মহোদয়দ্বয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য উভয় শিক্ষায় সামঞ্জস্য করিয়া তোমরা তোমাদিগের নিজের আদর্শে গঠিত হইয়া উঠ।

আজ আমরা আমাদিগের সেই পুরাতন আদর্শ বিস্মৃত হইয়া এই মৃত্যুর মুখে পতিত হইয়াছি। যে কোনও উপায়ে জ্ঞান সঞ্চয় কর, কিন্তু আদর্শ হারাইও না। জ্ঞানানুশীলনে হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, খ্রীষ্টান নাই, জ্ঞান সকলের নিকট হইতেই আহরণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। প্রাচীন মনীষীগণ বলিয়াছেন—কুকুরের নিকট হইতেও প্রভুভক্তি শিক্ষালাভ কর কিন্তু তাই বলিয়া কি নিজেকে কুক্কুরে পরিণত করিতে হইবে ?

আর একটি কথা—সম্প্রতি আমাদিগের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা ছাত্রবৃন্দের ধূমপান নিবারণ সম্বন্ধে এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। কলেজের ত কথাই নাই, এই সংক্রামক ব্যাধি পল্লীগ্রামের পাঠশালায় পর্যন্ত অতিমাত্র সংক্রামিত হইয়াছে। ইউনিভার্সিটির কর্তাদের যে এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা পরম সুখের বিষয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদিগের প্রতিও একটি আদেশ দেওয়া উচিত ছিল যে, তাঁহারাও যেন বিদ্যালয়ে বা ছাত্রাবাসে ছাত্রবৃন্দকে ধূমপানের আদর্শ না দেখান। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে শিক্ষকদিগের তামাকু সেবন করিবার একটি আলাহিদা কক্ষ রহিয়াছে, অনেক শিক্ষকের নিকটেই সিগারেট ম্যাচ বাক্স থাকে। এখনও বহু শিক্ষক ছাত্রবৃন্দকে পড়াইতে পড়াইতে "ক্লাসে"র মধ্যেই সিগারেট ধরাইয়া ক্লান্তি দূর করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের পাঠশালার শিক্ষকগণের ত কথাই নাই ; যদিও সকল শিক্ষককে দোষী করা যায় না, তবুও অনেক পণ্ডিত মহাশয় তামাকু সাজিবার জন্য ছাত্রবৃন্দকে আদেশ দিয়া থাকেন। বয়স্ক ছাত্র হয় ত সুবিধা পাইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের চক্ষুর অন্তরালে দুই হাতে "কল্কী" ধরিয়া তামাকু সেবন পূর্বক পুনরায় যথাস্থানে কল্কী সন্নিবিষ্ট করিয়া কাশিতে কাশিতে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হাজির হইল। পণ্ডিত মহাশয় তখন হয়ত ইহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না ! অতএব ছাত্রবৃন্দের ধূমপান নিবারণ করিতে হইলে শিক্ষকগণের প্রতি ঐরূপ আদেশ দিতে হইবে। নতুবা এ ব্যাধি নিরাময় হইতে পারে না।

যাহা হউক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃমহোদয়গণ যে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষকগণও সংযত হইতে পারেন। নানা দিক দিয়া আমাদিগের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা সংশোধিত হইয়া আদর্শ মানুষে পরিণত হউক। ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক কামনা।

আমার মাথা উঁচু ক'রে দাওহে তোমার অসমাজের উপরে।

১৩২৪ সাল ৪র্থ বর্ষ ২১শ সংখ্যা

কবিবর রবীন্দ্রনাথের একটী গান আছে—
আমার মাথা নত ক'রে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে। ইত্যাদি।

গানটী অনেকেই গায়, কিন্তু গানের ভাবগ্রাহী লোক কয় জন আছে ? গান শুনিয়া অনেকেই আহা ! আহা ! করে, কিন্তু কয়জন নত হইতে চায় ? কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন কেহই নত বা ছোট হইতে রাজী নহে। সক্ষম হউক, আর নাই হউক, উঁচু হইবার সাধটী সবাই রাখেন।

হিতোপদেশে পড়িয়াছি "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" কিন্তু আজকাল কাল মাহাত্ম্যে দেখিতে পাইতেছি "বিদ্যা দদাতি ঔদ্ধত্যং"। বিদ্যা শিখিবার আগে যে বিনয়টুকু থাকে আজকাল তথাকথিত বিদ্যা শিক্ষা করিলে অর্থাৎ দুই একখানি পাশ করিলে সেটুকু একেবারে থাকে না। তখন শুধু ব্যবহারে নয় ভাষাতেও বিনয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। গলার সুরটি যেন একটু গম্ভীব ভাব ধারণ করে। পূর্বে যে সকল গুরুজনের আদেশ অবনত মস্তকে প্রতি-পালন করিয়াছে, সেই সকল মুরুব্বিরাও কোন কথা বলিলে অমনি লজিকের তর্ক আরম্ভ করে।

ক্রমে এইরূপ বিদ্বানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই তখন বিদ্বানের লড়াই আরম্ভ হয়। রাম বলে 'হাম বড়া' ; শ্যাম বলে 'হাম বড়া'। তারপর যখন ইঁহারা

"আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য।

* * *

মানুষ আমরা নহিত মেষ।"

বলিয়া দেশের নেতা সাজিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন তখন এই 'হাম বড়া' লইয়া ঠিক মেড়া লড়াই লাগে। এই বড় হইবার প্রবৃত্তি লইয়া ইঁহারা মাতৃ-সেবকের পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কথায় কথায় মানের গোড়ায় আঘাত লাগে। তাঁহাদের স্বার্থ ও মান উভয় বজায় রাখিয়া যদি দেশ মাতৃকার সেবা চলে চলুক—নচেৎ ইঁহারা প্রাণ গেলেও স্বার্থ ত্যাগ বা নত হইতে রাজী নহেন। ফলে আমাদের দেশের যাবতীয় বারোয়ারী বৈঠকেই এই স্বার্থ ও মানের পালার অভিনয় আরম্ভ হইয়া থাকে। আপন আপন জেদ বজায় রাখিতে গিয়া ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি করেন। সব সভাতেই দক্ষযজ্ঞ হইয়া থাকে। প্রত্যেক দলেই এক একজন কর্তা হইয়া পালের গোদা হন। আর বাচ্চা নেতাগুলি এক এক কর্তার দোহারী করেন। এই দলাদলি কলিকাতার বড় বড় সভা হইতে সামান্য পল্লীগ্রামের পঞ্চায়েতী বৈঠক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এই কর্তাহীন দেশে এই সকল মতলবী কর্তার আবির্ভাব দেখিয়া একজন প্রাচীন কবির কথা মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছেন :—

"যেমন ঢেঁকিশালে কুকুর কর্তা,
বনের কর্তা পশু।
শ্মশানেতে ভূত কর্তা,
চোরের কর্তা যাশু।
গোরোস্থানে মামদো কর্তা,
ভাগাড়ের কর্তা দানা।
ছাতিন তলায় পেত্নী কর্তা
সেওড়া তলায় গোনা।
মাঠে মাঠে রাখাল কর্তা

আঁতুড়ের কর্তা ধাই।
ভেড়ার দলে বাছুর কর্তা
এ সব কর্তাও তাই॥”

তাই বলি এ সময়ে কর্তা সাজিতে হইলে দেশের মুখ পানে চাহিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। মানের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চ হইবার প্রবৃত্তি দমন করিতে হইবে। নচেৎ মঙ্গল নাই। অশ্বত্থ বৃক্ষ ক্ষুদ্র বীজ হইতে জন্মিয়া আস্তে আস্তে বড় হয়, বহু বৎসরে উচ্চ হয়, সেই জন্য সে বহুদিন স্থায়ী হয়। আর বাঁশ তিন মাসের মধ্যে আসমানে উঠে কিন্তু তার স্থায়িত্ব মোটে ৪ বৎসর মাত্র।

সামাজিক সমস্যার সমাধান।

১৩২৫ সাল ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

আমাদের বাঙ্গালা দেশের সমাজে একটা বিষম সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে, কি করিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়। নিদান নির্ণয় কঠিন নহে—বাজারে অবিবাহিত কন্যার সংখ্যা অধিক, সুপাত্রের সংখ্যা অল্প। কাজেই বরের দর চড়িবে আশ্চর্য্য কি? আর একদিকে কিন্তু দেখা যাইতেছে বেশী বয়সে বিবাহ হওয়ায় উপন্যাস পাঠক বরের ঠিক পূর্ব রাগ না হউক. পাত্রী মনোনয়নের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। পূর্বে ঘটক এবং আত্মীয় স্বজনই কন্যা মনোনয়ন করিতেন। এখন বরের বন্ধুরাই বরের চক্ষু লইয়া কন্যা দেখেন, কোথাও বা বর স্বয়ং বরের বন্ধু নামে কন্যা দেখিয়া আসেন। অভাব পক্ষে বর মহাশয় কন্যার ফটো না দেখিলে কিছুতেই চলে না তাই আমি বলি কি. দেশে স্বয়ংবর প্রথাটা চালাইলে হয় না? হাসিও না দাদা, আমি যাহা বলি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ দেখি।

বিবাহ প্রথাটা পশু পক্ষী সকলের মধ্যেই আছে, কেবল এই গৃহপালিত পশুগুলি ছাড়া, হনুমানেরা বহু বিবাহ করে, পক্ষীরা এক বিবাহেই সন্তুষ্ট। সিংহ, ব্যাঘ্রের বিবাহ হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে পুরুষ সুন্দর, পুরুষ স্বীয় সুস্বরে বা রূপে স্ত্রীকে ভুলাইয়া বিবাহ করে কিন্তু মানুষের অসভ্য বা বর্বর অবস্থায় এই রীতি অনুসৃত হইলেও এখন সভ্যতা বা কৃত্রিমতার মধ্যে আসিয়া আমরা উল্টা পথে চলিয়াছি তাই এখন পুরুষ স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য বা দাড়িগোঁফ স্ত্রীলোকের মন ভুলায় না এখন কন্যার পিতাই টাকা দিয়া বরের মন ভুলায়। রূপটা বাইরের সৌন্দর্য বলিয়া এখন সকলে কন্যার রূপটা নামমাত্র দেখে। হাঁ একটা বলিতে ভুলিয়াছি—যেমন সিংহের কেশর, পক্ষীর সুস্বর ও রূপ স্ত্রীকে ভুলাইবার জন্য প্রকৃতি দিয়াছেন। পুরুষের দাড়ি গোঁফও তেমনি তাহার সৌন্দর্য্যের অংশ। কিন্তু দেশে কি আর দাড়ি গোঁফ আছে? চতুষ্পাটীর অধ্যাপকেরা বিদ্যার জোরে বিবাহ করিতেন তাই তাঁহারা দাড়ি গোঁফ রাখিতেন না। এখন আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষিতের দলও বিশ্ববিদ্যালয়ের সনন্দের জোরে বিবাহ করিতেছেন সুতরাং এখন লর্ড কুর্জনের দেখাদেখি সকলেই দাড়ি গোঁফ ফেলিতেছেন। এখন জীব বিদ্যায়

লেখে জীবের যে অঙ্গে প্রয়োজন থাকে না তাহা ক্রমে খসিয়া যায়। যেমন বানরের লেজ তাহার জ্ঞাতি মানুষে খসিয়া পড়িয়াছে। আমার ভয় হয় পাছে দাড়ি গোঁফের ব্যবহার উঠিয়া গেলে কিছুদিন পরে আমাদের পুংবংশীয়েরা নির্গোঁফ হইয়া না জন্মায়। তখন আমাদের দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই এক রকম মুখ হইবে, পার্থক্য রাখা কঠিন হইবে। এখনই ত নামে গোল উঠিতেছে। কামিনী মিত্র বলিলে পুরুষ কি স্ত্রীলোক চেনা দায়।

যা'ক আসল কথাটি পাড়ি। স্বয়ংবর কথাটা তুলিলাম কেন জান? বরের বাপ চায় টাকা, আর বর উপন্যাস পাঠ করিয়াছে সে চায় উপন্যাসের নায়িকা অর্থাৎ রূপ আর প্রেম। ইহার মধ্যে একজনকে গাঁথিতে পারিলে কার্য্যোদ্ধার। টাকা ত আর দেশের লোকের নাই। কাজেই ইয়ুরোপের মত আমাদের দেশে অবিবাহিত অথচ বিবাহ যোগ্য বরকন্যার অবাধ মেলামেশা হইলেই বর আপনিই কন্যার নিকট ধরা পড়িবে। কন্যার তেমন রূপ না থাকিলেও এসেন্স, পাউডার, খোঁপা, বডিস, জ্যাকেট আর তরল আলতা ও মনের গুণে রূপ আপনি ফুটিয়া উঠিবে। তাহাতেও যদি রূপ না ফুটে তবে তাহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ ইয়ুরোপে জাতিভেদ নাই আমাদের দেশে সেটা বেশ প্রবল মূর্তিতে বর্তমান। উপন্যাসে বাছিয়া বাছিয়া এমনই ঘটনা ঘটাইয়া দেয় যে ঠিক ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত ব্রাহ্মণ কন্যার বা কায়স্থের সহিত কায়স্থ কন্যার দেখা হয় পূর্বরাগ হয়—যাহাদের মধ্যে সামাজিক ভেদ নিবন্ধন বিবাহ হইতে পারে না উপন্যাস জগতে তাহাদের বিসদৃশ অস্তিত্বই নাই। বিষবৃক্ষে কোন কায়স্থ বিধবা ছাড়া কোন বিবাহ যোগ্যা ব্রাহ্মণ কন্যা সধবা বা বিধবা আছে কি? যেখানে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় উপন্যাসে সেরূপ থাকে সেখানে উপন্যাসটা নিতান্তই বিয়োগান্ত হইয়া উঠে। যা'ক আমাদের এই বাস্তব জগৎটা নিতান্ত উপন্যাস জগৎও নহে আর এটাকে আমরা একান্ত বিয়োগান্ত করিতে চাহি না তজ্জন্য আমাদের এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে এক জাতের বর কন্যার একস্থানে মেলামেশা ঘটে। দুই প্রকারে ইহা সম্ভব- এক গ্রামে যদি কেবল রাঢ়ীর শ্রেণী (অবশ্য যাহাদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি চলে) ব্রাহ্মণ কিংবা উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ বাস করে তবে মেলামেশাটা আপনিই চলিবে। কিন্তু অন্য জাত না হইলে গ্রাম চলে না। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার উপায়টাই খুলিয়া বলি—তোমাদের বাঙ্গালা দেশে এখন প্রায় সব জাতিরই সভা সমিতি আছে। ব্রাহ্মণ সভা, কায়স্থ সভা, তিলি সভা, মাহিষ্য সভা, বৈশ্যবারুজীবি সভা, কর্মকার সভা, সুবর্ণবণিক সভা ইত্যাদি। এই সকল সভায় যাহারা ভলান্টিয়ার হয় (যুদ্ধের নয় গো—সেবার) তাহারা প্রায়ই বর। সভার অধিবেশনে গোটা কয়েক করিয়া কন্যা আনিয়া শঙ্খ ঘণ্টা আনিয়া সুস্বরে গান জুড়িয়া দেবার ব্যবস্থা কর। "পণপ্রথা উঠাও" এই নীরস প্রস্তাব পাশ করিবার কোনই প্রয়োজন হইবে না। কাগজে কাগজে আর বিজ্ঞাপন দিতে হইবে না যে, আমার পাত্র পাত্রী দরকার। সভার শেষে একটা প্রস্তাব করা হউক "এই সভার সেবকবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদানের পরিবর্তে আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে কুমারীরা নিজের রাঁধা দ্রব্যাদি দিয়া স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইবে, সেখানে বিবাহিতের প্রবেশ নিষেধ।" বাস্ আর দেখিতে হইবে না। পণপ্রথা আপনি উঠিয়া যাইবে।

১৩২৫ সাল ৫ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

সমাজ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে সমাজ গঠনের প্রণালী লক্ষ্য করিয়া এইটুকু বুঝা যায়, মানব জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে একত্র বাসের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জগতের অন্যান্য জাতি কোথায় ছিল—তাহাদের এই বিশ্বগ্রাসী সভ্যতা তখন ছিল কিনা এবং আদৌ তাহাদের চিহ্নমাত্র ছিল কিনা সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বিশেষরূপে সন্দেহ করিয়া থাকেন। ভারতের সেই অনাদিকালে প্রতিষ্ঠিত সমাজ আজ বর্তমান সভ্যতার খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এই সঙ্গে ব্যক্তিত্ব, ব্যষ্ঠিত্ব, এবং জাতীয়ত্ব পর্যন্ত ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, এ কাহারও জ্ঞানোদ্ভাষিত চক্ষে পড়িতেছে না—ইহাই পরিতাপের বিষয়।

সমাজের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্যক্তিত্ব হারাইয়াছি। আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ; কেহ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি না। আহারে বিহারে, বেশে আমরা প্রত্যেকে এক একটী অদ্ভুত জীব। কতকগুলি বাঙ্গালী একত্র সম্মিলিত হইলে তাহাদের বেশ দেখিয়া, আহারের বৈচিত্র্যতা দেখিয়া, এমন কি কথার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সাধ্য কি নিরূপিত করে—ইহারা একই জাতি কিনা। কাহারও পরিধেয় পেণ্টুলন, কেহ আলখেল্লা, কেহ চাপকান, কাহারও বা ধুতি চাদর। এই যে ব্যক্তিত্বের বিনাশ ও ওই সমাজশক্তির অবনতির ফলে।

এই ব্যক্তি লইয়াই জাতি। এই বিভিন্ন প্রকৃতির মানবের সমষ্টি যে জাতি—সে জাতির প্রাণে একত্ব জন্মিতে পারে না। যতই বক্তৃতায় আমরা দিঙমণ্ডল কম্পিত করি, এই সমাজ ছাড়া, জাতীয়ত্ব হারা জীবের রুচির পরিবর্তন যতদিন না ঘটিতেছে ততদিন আমাদের মঙ্গলের ভরসা করা সুদূর পরাহত।

এই সমাজ ধ্বংসের প্রথম এবং প্রধান কারণ ইংরাজী কায়দায় নির্মিত সহর। সহরের বাতাসের কি গুণ! সহরবাসী হইলেই পল্লীবাসীকে ঘৃণা করিতে হয়। সহজ আহার বিহারে আর তৃপ্তি ঘটে না। উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া প্রাণের সরলতাটুকু নষ্ট করিয়া দেয়। এই সহর আমাদের প্রাচীন সমাজগুলির ধ্বংস সাধন করিয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ বিলাসিতা ; বিলাসিতার প্রবল আকর্ষণে আমরা আর প্রাচীন প্রথা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। প্রাচীন কালের ধুতি চাদর অসভ্যতার আবরণ বলিয়া মনে হয়। পুকুরের সুপরিস্কৃত জলে আর তৃষ্ণা মিটে না। প্রাণ বাঁধন ছিঁড়িয়া মুক্ত বাতাস সেবন করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়। তাই সমাজের শীতল ক্রোড় ছাড়িয়া সহরের দূষিত মুক্ত বাতাসে আমরা আসিয়া দাঁড়াই।

তৃতীয় কারণ আমাদের অর্থের পূজা! আমরা পৃথিবীর সব ছাড়িয়া টাকার চরণে ফুল ছড়াইতেছি। মানুষের পূজা ভুলিয়াছি, গুণীকে আদর করিতে শিখি নাই—শুধু শিখিয়াছি ধনবানের চরণে অঞ্জলি দিতে। ইহার ফলে আর আমাদের দেশে মানুষ জন্মিতেছে না। বালক বাল্যকাল হইতে অর্থ উপার্জনই সার বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাই প্রাপ্তির উপায় খুঁজিতেছে। টাকার

পূজার ফলে আমাদের মধ্যে আর চরিত্রবান লোক নাই। লোকের প্রাণে ধর্মভাব নাই— শুধু জড়ের সেবা সার হইয়াছে। এই অর্থের সেবাই আমাদের দরিদ্র সমাজকে ঘৃণা করিতে শিখাইতেছে।

এই তিন কারণে আমাদের সমাজ ধ্বংস হইতেছে। কিন্তু আমরা যাহার জন্য সমাজ ছাড়িয়াছি যে আশায় আর সমাজ শাসনের গণ্ডী মানি না সে আকাঙ্ক্ষা আর আমাদের মিটিতেছে না। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের জাতিও গিয়াছে পেটও ভরিতেছে না।

এখনও সমাজের কিছু চিহ্ন আছে আমাদের দেশে অসভ্য ভিল, সাঁওতালের মধ্যে সেখানকার শান্তির পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। শিক্ষিত ভ্রাতাদিগকে সে-গুলি লক্ষ্য করিতে বলি।

শেষ কথা ভাই তুমি সমাজ ছাড়িতে পার—সমাজের নিয়ম প্রথা পদ-দলিত করিতে পার বৈদেশিক আহার, বিহার, আচার্য প্রথা গ্রহণ করিতে পার ; কিন্তু মনে রাখিও তুমি যে বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালীই থাকিবে। বরং তোমার অবনতি ঘটিবে। মনুষ্যত্বের আদর্শে ওই হলকর্ষণকারী কৃষক, "তুমি যাহাকে চাষা বল" তোমার অপেক্ষা অনেক উচ্চে থাকিবে। কারণ তাহার একটা নিজস্ব ভাব আছে—একটা আদর্শ লক্ষ্য করিয়া সে চলে। আর "তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে।"

মা আসিতেছেন।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যা

যেদিন চণ্ডীমণ্ডপে ভাস্কর প্রতিমা নির্মাণের জন্য মৃত্তিকাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল তখনই বুঝিলাম মা আমার চিন্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূতা না হইলেও মৃণ্ময়ী মূর্তিতে দেখা দিবেন। তারপর যেদিন ভরা ভাদরে কাঙ্গালের ক্ষীণ ভরসাস্থল ভাদুই ধান্য অপক্ক অবস্থায় গঙ্গা লাভ করিল তখনই বুঝিলাম মা নিশ্চয়ই আসিবেন। যেদিন জমিদারের তশীলদার আশ্বিনের কিস্তির খাজনা আদায় করিবার জন্য দোবে, চোবে, তেওয়ারী মহাশয়গণকে বংশদণ্ড স্কন্ধে প্রজাগণকে সাদরে (সদরে ?) আহ্বান জন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন তখনই বুঝিলাম দীন-তাড়িনীর আগমনে আর বিলম্ব নাই। যখন বস্ত্র-ব্যবসায়ীগণ গাঁটে গাঁটে লাটুমার্কা, কাকাতুয়ামার্কা, গ্রেহামের ৮৪নং টেক্কামার্কা, মায়ের গণেশ জননী মূর্তি অঙ্কিত ৪৪৮ নং এবং দাদা কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর মার্কা ৫৫৬৩ ধুতি ও শাড়ী আমদানী করিয়া ঘর ভরিয়া ফেলিল এবং মহাত্মাজীর সম্মান জন্য জোড়াকত খদ্দরও ঘর ঘর বলিয়া আমদানী করিল ; তখনই জানিলাম মা আসেন আর কি। তারপর যখন বৈবাহিকা বাক্য-বাণ-ভীত স্নেহ-দুর্বল কন্যার পিতা জামাই বাড়ী তত্ত্ব পাঠাইবার জন্য শেষ সম্বল বাস্তু ভিটাখানিও রেহানাবদ্ধ রাখিয়া চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দিতে অঙ্গীকার করিয়া টাকা কর্জ করিবার জন্য কুসীদ ব্যবসায়ীগণের বাটী যাতায়াত আরম্ভ করিলেন তখনই বুঝিলাম মা আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। যেদিন উকীল মহোদয়গণ মক্কেলের জমা খরচ দিয়া মহুরীর সহিত ফিসের জন্য ফিস্ ফিস্ করিয়া হিসাব আরম্ভ করিলেন এবং আমলাবর্গ মামলাবাজের গৃহে মামুলি সাক্ষাৎ করিবার জন্য পদার্পণ করিতে লাগিলেন তখনই জানিলাম

মায়ের নৌকার মাস্তুল দেখা গিয়াছে। যেদিন আমাদের ছাপাখানার ভূতগুলি বেতনের তাগাদায় জ্বালাতন করিতে লাগিল তখন ঠিক বুঝিলাম করুণাময়ী আমাদের স্কন্ধেও করুণার চাপ দিতে কুণ্ঠিতা নহেন।

মা এবার অন্য যানে না আসিয়া নৌকাযোগে আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। চারিদিক বন্যার জলে ভরিয়া আছে, রাস্তাঘাট সমস্ত কর্দ্দমময় নৌকা ভিন্ন আসাও অসম্ভব।

এস মা আনন্দময়ী! তোমার চরণ কমলে আমাদের যাবতীয় আনন্দ উৎসর্গ করিয়া আমরা নিরানন্দটুকু উপভোগ করিতেছি। মা সর্বমঙ্গলে! আমাদের মঙ্গলের মাত্রা উপলব্ধি করিয়া তোমার নামের সার্থকতা নিরীক্ষণ করিয়া যাও। সত্য কথা বলিবে কি মা! তোর আগমনে বাল্যকালে আনন্দ উপভোগ করিয়াছি কিন্তু যতদিন হইল আমার 'দেহি দেহি' শুনিয়া তুমি আংশিক প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছ অর্থাৎ ধনং যশং ইত্যাদি না দিয়া কতগুলি পোষ্য জুটাইয়া দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রাচীর বেষ্টিত রাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ হলপ করিয়া বলিতে পারি তোর আগমনে আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দই উপভোগ্য হইয়াছে। একা আমি নই তোর অধিকাংশ ভক্তই আমাদের মত। ভক্তির মাত্রাও আমাদের যেমন তোমার স্নেহের পরিমাণও তদ্রূপ। ভক্ত রামপ্রসাদ সত্য কথাই বলিয়াছেন—

মা তোমারে ভালবাসি কই?
আমার লোক দেখান ভালবাসা
লোকের কাছে সাধু হই।

তোর রাজা জমিদার ভক্তগণের পূজাও দেখিয়াছি। পত্নী বা পুত্র বধূর জন্য বেনারসী আনিয়া তোর জন্য ৫ গজী নয়নশুক তাও আবার যত সম্ভব সস্তা তাই। পূজার অন্যান্য উপকরণও তদ্রূপ। 'যদন্নঃ পুরুষো রাজন তদন্ন পিতৃ দেবতা।' শাস্ত্রের বয়েদ আছে বটে কিন্তু তোর পূজার বেলায় সে প্রমাণ খুব কম ভক্তই খাটাইয়া থাকে।

আমরা ক্রমশঃ পাশ্চাত্য সভ্যতায় সভ্য হইতে চলিয়াছি সেইজন্য উক্ত বচন কতকাংশ খাটাইতে সমর্থ হইয়াছি। অস্পৃশ্য চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃত, অস্থি মিশ্রিত শর্করা বিদেশীয় উপকরণ আমরা যাহা অম্লান বদনে ব্যবহার করি তোর নামে সেই সকল অপবিত্র দ্রব্যাদি "ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি" বলিয়া নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হই না। এবারও তেমনি পূজা করিবার জন্য ভক্তগণ তোর চণ্ডীমণ্ডপে আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে একবার আসিয়া ভক্তের ভক্তির বহর অনুসারে 'দেহি দেহি' শুনিয়া যা'' আয়ু' আরোগ্য' দেওয়া না দেওয়া তোর বিবেচনাধীন।

কঃ পন্থা?

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা এ অবস্থায় স্বদেশ স্বদেশ করিয়া মরা, কিম্বা স্বদেশিকতার ধুয়া ধরিয়া নির্য্যাতন গঞ্জনা, সংসার ও পরিবারগর্গকে অনাহারে রাখিয়া নিজেও অনাহারী থাকার যে ব্যবস্থা ইহা কি শুধুমাত্র

সেণ্টিমেণ্ট! ভাবপ্রবণ জাতি সেণ্টিমেণ্টের ঝোঁকে অনেক রকম কাজই করিয়া থাকে—তাহার কোনটির পরিণাম যে ভাল হইবে আর কোনটির পরিণাম যে মন্দ হইবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অনেক ত্যাগ ও মহিমামণ্ডিত কার্য্যের পরিণাম ফল এ জীবনে শুধু দুর্ভোগ ভোগাতেই পরিসমাপ্ত হয়—পর জন্মে কি হইবে কে জানে। সেণ্টিমেণ্টের দোষ পরে অনেকেই গাহে বটে—কিন্তু ভাবের ঝোঁকে যখন কাজ করিতে হয়—সেই কাজের ফল যখন ব্যক্তিগত হিসাবে না থাকিয়া জাতিগত ও দেশগত হিসাবে ছড়াইয়া পড়ে—তখন তাহার ফল শুভও হইতে পারে অশুভও হইতে পারে। ভাগ্যগুণে সেণ্টিমেণ্টের লাঞ্ছনা হয়—আবার ভাগ্যগুণে সেণ্টিমেণ্ট জয়-যুক্তও হয়। ভাবপ্রবণতা জিনিসটা মূলে খারাপ নয়—তবে ভাগ্যগুণে তাহা খারাপ হইয়া দাঁড়ায় বটে।

যে সব কর্মীর দল ভারতের নব যুগের সূচনায় জীবনের অবলম্বন ভাত কাপড়ের সম্বল জীবিকার ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেশকর্মে নামিয়াছিলেন—ভাবপ্রবণতার উৎসাহের আবেগে যাঁহারা নিজ ক্লেশ অন্নবস্ত্রের অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত না দিয়া পরিবার পরিজনের, আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসীর গঞ্জনা উপহাসকে ভ্রূকুটি করিয়া ভাবপ্রবণতায় এক লক্ষ্যে কর্মের পথে চলিতেছিলেন—আজ ভাব-বিচ্যুত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা কি করিবেন। অবলম্বন হারাইবার জন্য অনুশোচনা—না লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আবার নূতন উৎসাহে কর্মে আত্মনিয়োগ।

দেশের অন্নাভাব বস্ত্রাভাব দিনের দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের সব সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যাই হইতেছে আজ দেশের লোকে কি করিয়া জীবন চালাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। লোকের আশা উৎসাহের পথ, কর্মের পথ সব দিক থেকে রুদ্ধ। দেশের লোকে যেদিকে যে কাজে হাত দিতে যায় সেই দিক হইতে প্রতিহত হয়—নিরাশাই মৃত্যু কামনাই তাদের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের এমন ভীষণ অবস্থা আর কতদিন থাকিবে তাহা বলা যায় না। না খাইতে পাইয়া—পরিবার পরিজন সংসার চালাইবার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া উচ্চ-শিক্ষিত অনেক ভদ্রলোক আত্মঘাতী হইতেছে। পিতা—অন্ন বস্ত্রের অভাবে সন্তানদের গলায় ছুরি মারিয়া নিজে আত্মহত্যা করিতেছে। মাতা প্রাণের চেয়ে প্রিয় সন্তানদের মৃত্যু কামনা করিতেছে। দেশের যুবকবৃন্দ পেটের দায়ে বিব্রত হইয়া পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। আত্মহত্যা অনেকে করিতেছে—আরও কতজনে আত্মহত্যার সঙ্কল্প যে করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই—এই দেশের একদিকের অবস্থা!

দেশের সকল রকম অনর্থের মূল এই যে অভাব জ্বালা ইহা আজ সর্বত্র তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। ইহাই মূল—আবার আনুসঙ্গিক উপসর্গ ইহার সঙ্গে যাহা জুটিতেছে সেগুলিও ক্রমে ভীষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশের উচ্চ শ্রেণীতে কন্যাদায় ক্রমেই ভীষণ হইতেছে, কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া বহু পরিবার বিব্রত! মেয়ের বিয়ের জ্বালায় অনেক পিতা, ভ্রাতা আত্মহত্যা করিতেছেন। আবার সমাজের নিম্নশ্রেণীতে কন্যা মেলা ভার। তাই অপ্রাপ্ত বয়স্কা, তিন চার বছরের মেয়েদের পর্য্যন্ত সে সব সমাজে পণ দিয়া বরপক্ষ কিনিয়া লয়। বিধবার সংখ্যা সে সব সমাজে খুব বেশী। দেশের নিম্ন শ্রেণী ক্রমেই অভাবে ও অনাচারে ধ্বংসের পথে যাইতেছে। সমাজ সব দিক দিয়াই রুগ্ন দুর্বল, মানসিক ও শারীরিক তেজ বীর্য্যে হীন হইয়া পড়িতেছে। দেশের

মানুষ যেন আর মানুষের মত নাই। মানুষের মুখে হাসি নাই, চিত্তে শান্তি নাই—সব ম্রিয়মাণ অবসন্ন।

শুধু মানুষেরই যে এ অবস্থা তা নয়। এ দেশের কুকুর বেড়াল অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীদের অবস্থা পর্য্যন্ত আর পূর্বের মত নাই। দেশের গরু আর তেমন দুধ দেয় না। কুকুর আর তেমন বাঘের মত হয় না—সব কঙ্কালসার জীর্ণ। কেন এমন হইল!

দেশ স্বাধীনতা চাহিতেছে, স্বরাজই একমাত্র কাম্য বলিয়া নির্দেশ করিতেছে—অথচ দেশ কি খাইয়া স্বরাজ সাধনা করিবে! দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নাই, হিন্দুতে হিন্দুতে মিল নাই, হিন্দু ও মুসলমানে মিল নাই—মুসলমানে মুসলমানে মিল নাই। সব ছত্রভঙ্গ। সব আত্মসর্বস্ব। এইভাবে দেশ আত্মবলি দিবার পথে আপনাদের মধ্যে সহস্র ভেদ বিবাদের রেখা টানিয়া ক্রমে মরণের মুখে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে।

পুরুষত্ব।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

বাংলা দেশে সম্প্রতি নারীর উপর অত্যাচারের যে ভীষণ ও বীভৎস্য সংবাদ আসিতেছে—তাহা পাঠ করিয়া আমরা লজ্জায় ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিতেছি। পরপদদলিত জাতি যাহার নিজের মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার কোন অবস্থা নাই—জীবনে যাহার কোন গৌরব নাই সে কেমন ভাবে দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারে তাহারই জ্বলন্ত অমানুষিক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। অরক্ষিতা অসহায়া নারীকে জোর করিয়া ঘরের বাহির করিয়া তাহার উপর বীভৎস অত্যাচার করিবার স্পৃহা এমন অমানুষ দেশের লোকেরই জাগিতে পারে। সেদিন একটী চৌদ্দ বৎসরের বালিকাকে এইভাবে অত্যাচার করিয়া তিনটা পাষণ্ড প্রাণে মারিয়াছে। অত্যাচারিতা নারী অবশ্য মরিয়া বাঁচিয়াছে কারণ দুর্বলা সে—অত্যাচারিতা অবস্থায় সমাজে ফিরিয়া আসিলেও সমাজ সেই দুর্বলার উপরই অত্যাচার করিত। অত্যাচারী যাহারা তাহাদের সমাজ শাসন বা গ্রাম্য শাসন করিতে সমাজ ও গ্রামের লোক ভীত হইত! এমন অবস্থা বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ হইতেছে—তবে কি বুঝিব বাংলা দেশের গ্রামগুলি পুরুষশূন্য হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে সমাজ নাই—গ্রাম্য বন্ধন নাই—মানুষ নাই—সবই জানি কিন্তু এই নারীর উপর অত্যাচারে দেশ তবে আজ কাহার শরণাপন্ন হইয়া দাঁড়াইবে। কে দেশের ভীতা ত্রস্তা মায়েদের রক্ষা করিবে?

বাংলার যুবকদের উৎসাহ নাই—দশ বৎসর পূর্বে এমন ঘটনা ঘটিলেও বাংলার গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য সমিতি স্থাপিত হইয়া এ নারী অত্যাচার নিবারণের ব্যবস্থা হইত—কিন্তু আজ গ্রামে গ্রামে এত নারী লাঞ্ছনা চলিলেও তেমন সঙ্ঘ প্রচেষ্টার কথা কোন স্থান হইতেই শোনা যাইতেছে না। বাংলার পুরুষ শক্তি নাই—তাহা পারে শুধু আজ ভয়ে ভীত হইয়া লালসার মুখে সন্ত্রস্ত থাকিতে—আর নারী নিগ্রহের বিধানের মাত্রা বাড়াইতে। বাংলার নারী শক্তিকে আজ সব দিক হইতেই সজাগ হইতে হইবে। দেশে যেমন দিন কাল পড়িয়া আসিতেছে ঘটি-বাটি, গহনাপত্র, টাকা কড়ির মত নারীও যেভাবে চোর ডাকাতের, বদমাইসের

ভক্ষ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে দেশের নেতৃস্থানীয় পুরুষ ও মহিলারা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া যাহাতে দেশের নারীর—মাতার সম্মান রক্ষা হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। ব্রাহ্মণ সভা, কংগ্রেস কর্মী সংগঠন এ দিকে মনোযোগ দিন। সমাজ যদি এ দেশে থাকে—তবে সমাজ ঐ সব কামুকদের সমাজচ্যুত—দেশচ্যুত করুন। এ লোভ এ মোহ নতুবা দেশের ভীষণ অমঙ্গল ঘটাইবে। দেশের লোকের আর মানুষ বলিয়া মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না।

ছেলেদের ভবিষ্যৎ।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

বাঙালী বংশধর যারা, সৃষ্টিধর যারা, বড় হয়ে যারা জাতিকে বাঁচাবে, জাতির সম্পদ বাড়িয়ে তুলবে, জাতির জ্ঞান গরিমা বিশ্বের চারিদিকে যারা ছড়িয়ে দেবে—তারাই আজ দুর্বল সম্বল বিহীন, দেশী বিদেশী সকল লোকের উপহাসের পাত্র।

দেশোদ্ধারের পান্ডা বলছেন, গোলামী বিদ্যা যেমন শিখছে তেমন তার ফল ভোগ কর ; সহরের দৌলতে যাঁরা ইমারত গড়বার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা উপদেশ দিচ্ছেন গাঁয়ে ফিরে চাষ-বাস করে দিন গুজরান কর ; পন্ডিত পাঁতি দিচ্ছেন কেতাবী বিদ্যেয় কিছু হবে না, জাত-ব্যবসায় লেগে যাও। যার যা খুসী তাই বলে যাচ্ছেন আর হাজার পাশকরা ছেলেরা মুখটি বুজে শুনছে। কিন্তু উপহাস করে, উপদেশ দিয়ে, পাঁতিতে পান্ডিত্য দেখিয়ে যারা মোড়লী করছেন, তাঁদের যদি বলি যে, তাঁরা আর তাঁদের পূর্বপুরুষরা যে পাপ অর্জন করেছেন, তারই ফল ভোগ করছে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আজকার এই বংশধররা তাহলে সে কথা মিথ্যে বলবার শক্তি তাদের থাকবে কি ?

সত্যিই কি আজকার ছেলেরা আদৌ অপরাধী ? গোলামী বলে যে বিদ্যার বালাই ঘুচাতে তুমি রাজনীতিক উপদেশ দিচ্ছ, সে বিদ্যার পরিবর্তে কোনো বিদ্যা দান করবার শক্তি তোমার আছে কি ? অতীতে তো সে কেরামতী দেখাবার চেষ্টা করেছ, তাতে কি বোঝনি জাতগোলাম তুমি, এমন শিক্ষা দেবার শক্তি তোমার নেই যাতে করে বংশধরদের 'প্রভু' হবার উপযোগী করে তুলতে পারে ? সহরে বসে তুমি ধনবান, উপদেশ দিচ্ছ ছেলেদের গাঁয়ে ফিরে, লাঙল ঠেলতে, কিন্তু কত ধানে কত চাল হয়, তার খবর কিছু রাখ কি, জান কি গাঁয়ের লোকের অবস্থা ? কিছু জান না বোঝ না বলেই বাঙালীর বংশধরদের তোমরা শ্লেষ করতে পার—কিছু যদি জানতে বুঝতে, তা হলে বুক ঠেলে চোখ ফেটে কান্না বেরুত !

অপরাধ বি-এ, এম-এ, পাশ করা ছেলেদের নয়—তাদের যে পরীক্ষায় পাশ করতে পাঠিয়েছ সে পরীক্ষায় পাশ করে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ তারা তো দিচ্ছেই। তাদের অপরাধী বল কেমন করে ?

অপরাধ করেছ তোমরা, ভুল পথে তাদের ঠেলে নিয়ে চলেছ তোমরা। স্বার্থসিদ্ধ হবে বলে তোমরা তাদের এবার বিপথে নিয়েছিলে আবার স্বার্থ-সিদ্ধির মতলবে তাদের ফিরিয়ে আর এক পথে নিতে চাও। আগে ভেবেছিলে পাশ করলেই পয়সা, আবার এখন ভাবছ গাঁয়ে গেলেই পয়সা। আগে ভেবেছিলে

চাকরীই অর্থের অভাব ঘুচাবে, এখন ভাবছ, লাঙলের ফালে চেরা মাটির বুকে থেকে রত্ন-পেটিকা হাতে নিয়ে সৌভাগ্য লক্ষ্মী উঠে আসবেন, তখন ভাবনি যে আপিসে ঠাঁই নেই, এমন ভাবনা যে দেশে জমি নেই, কৃষিজাত শস্যে তোমার অধিকার নেই—বেণে তা ঠকিয়ে নেয়।

তাই বলছি এই সব ভেবে দেখ, ভেবে দেখে ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি স্থির কর। ছেলেদের বিপদে ঠেলে দিয়ো না।

কৃষি চাই, শিল্প চাই, বাণিজ্য চাই—এসব কথা ঠিক ; কিন্তু এ ঠিক নয় যে ছেলেরা তার সবখানিই করবে। তার অনেকখানি কাজ হবে তোমাদেরই করতে।

রাজনীতিক আন্দোলন তোমরা যারা করছ, তারা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানকে এমনি রূপ দাও যাতে করে পল্লীতে গিয়ে ছেলেরা টিঁকে থাকতে পারে, এমনি ব্যবস্থা কর যার ফলে বেণেরা কৃষিক্ষেত্রের সারটুকু শোষণ করতে না পারে।

তোমরা যারা ধনকুবের আছ, তারা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর—যাতে করে সেই সব ব্যাঙ্কের সাহায্যে ছেলেরা ব্যবসায় সুরু করতে পারে। এসব কাজ আগে তোমাদের করতে হবে—তবে তোমাদের বংশধররা তোমাদের গড়া প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখবে, সেইগুলি বজায় রেখে, তাদের উন্নতি করে জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করবে।

যদি চোখ বুজে না থাক, তাহলে একথা বলতে পার না যে, আমাদের ছেলেরা শ্রম-বিমুখ, বলতে পার না যে অপমান খোয়ই তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের আড়ত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

তোমাদের অলসতায়, তোমাদের কর্তব্য কর্ম করবার শক্তির অভাবে জাতির চলবার পথে যে সব কাঁটার ঝোপ বেড়ে উঠেছে, আজ তোমাদেরই সেগুলি পরিষ্কার করে দিতে হবে। ন্যায়ত, ধর্মত, তাই করতে তোমরা বাধ্য। তা যদি না পার, তাহলে দাঁতখিঁচিয়ে ছেলেদের উপহাস করতে এগিয়ে এসো না। তাদের ভবিষ্যৎ তারাই গড়ে নেবে, তোমাদের উপদেশের অপেক্ষা তাদের করতে হবে না।

বাঙলার মধ্যবিত্ত ছেলেদের শ্রমিক করে যারা গড়ে তুলতে চাও তারা বংশরক্ষা করতে পারবে না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেরা শ্রমিক হবেনা, হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে তাদের শ্রমবিমুখ বলে ভুল করো না। সে ভুল তোমাদেরই, ক্ষতি করবে, জাতির ক্ষতি করবে। শ্রম তারা করতে পারে, মগজের শ্রম-দুনিয়ার সব দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেরা তাই-ই করে আর তাই করেই দেশকে ধন-ধান্যে ভরে ফেলে, আমাদের ছেলেরাও তাই-ই করবে !

বাঙ্গালীর হা-হুতাশ।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

অন্যান্য দেশের নানারকমের লোক বাংলায় আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া অন্ন সংস্থান করিতেছে, কেহ বা ক্রোড়পতি হইতেছে আর দিন দিন অন্নাভাবে শীর্ণ আর চিন্তা স্বরে জীর্ণ হইয়া মরিতেছে বাঙ্গালীই। বাংলার এই ভীষণ সমস্যার

কথা সেদিন বিলাতে লর্ড সিংহের মুখে এই ভাবে ধ্বনিত হইয়াছে—'যে কেহ এ দেশে অন্ন সংস্থান করিতে পারে পারে না শুধু বাঙ্গালীরা। ভারত নানাদিকে উন্নত হইয়াছে কিন্তু ফাঁকও অনেক দিকেই আছে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে। বাংলার অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইতেছে। এ জন্য দায়ী দেশের লোক এবং অন্যান্য কারণ যাহার উপর গবর্ণমেণ্টের কোন হাত নাই। ইংরেজের কর্মশক্তি, ভারতীয়ের মিতব্যয়িতা, শ্রম ও সংযমের সহিত মিলিত হইয়া, এ দেশের আরো উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। দেশের শিক্ষিতদের ইংরেজের উপর যে অবিশ্বাসের ভাব রহিয়াছে, ইংরেজ তাহা দূর করিলে মিলিতভাবে দেশবাসীর উন্নতি করিতে পারেন।' লর্ড সিংহের কথা সত্য—কিন্তু বাংলা দেশের অবস্থা শোচনীয় হয় নাই, শোচনীয় হইয়াছে বাঙ্গালীর নিজস্ব অবস্থা। এই বাংলায় ইংরেজ ছাড়াও ছত্রিশ দেশের নানান্ জাতি নানান্ ব্যবসায় করিয়া অন্ন করিতেছে—আর বাঙ্গালীরা তাহাদেরি দেশে হা-হুতাশ করিয়া মরিতেছে। বাংলায় শোষণ বা লুণ্ঠন বলিয়া যে রাজনীতিক চিৎকার করা হয় তাহার সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন যাত্রার যোগ অতি সামান্য। বাংলার অর্থাগমের ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী ক্রমে দূরে সরিতেছে—অপরে তাহা অধিকার করিতেছে। কুলী মজুরের ব্যবসায় হইতে বড় যে কোন ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর এ অধঃপতনের দৃষ্টান্ত মিলিবে। আজ বাংলার সব চেয়ে বড় সমস্যা—স্বর্ণপ্রসূ দেশের ছেলেরাই অভাবের তাড়নায় হা-হুতাশ করিতেছে,—আর বাংলার অর্থে অন্য সকলেই পুষ্ট হইতেছে। ইংরেজ দেশে অর্থাগমের নানা ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছে কিন্তু সে ক্ষেত্র ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বাঙ্গালীরও যথেষ্ট উন্নত হওয়া এবং অর্থাগমের দ্বারা আয়ত্ত করা প্রয়োজন। বাংলার প্রাকৃতিক ধারা দ্বারা বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা উন্নতি করিতে না পারা পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জীবন ক্রমেই হটিতে থাকিবে, উজান চলা তাহার সম্ভব হইবে না। বাংলার শস্য সম্পদ তাহার বেসাতী করিতেছে অ-বাঙ্গালী, বাংলার খাদ্য সরবরাহ করিতেছে অ-বাঙ্গালী, বাংলার রেল ষ্টেশনে মুটে মজুরী করিতেছে অ-বাঙ্গালী, চাকর খানসামা সেও অ-বাঙ্গালী—আর বাঙ্গালী ভদ্র শিক্ষিত হইয়া সকলেই চাকুরী পাইবার জন্য লালায়িত। ভদ্র বনিবার এই প্রকার বিকৃত শিক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতিকে ক্রমশঃ হীন করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালী আজ নিখিল ভারতের পরিচালকত্ব দূরের কথা বাংলারও পরিচালক হইতে পারিতেছে না। বাংলার আর্থিক সম্পদের যোগ্য অংশ গ্রহণ করাকে বাঙ্গালীর সর্ব প্রথম কর্তব্য মনে করিতে হইবে। বর্তমানে এর চেয়ে আত্মরক্ষা ও জাতীয় কর্তব্যে বড় আর কিছু নাই।

আত্ম-দর্শন।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

সকলেরই মুখে শোনা যায়—আজকালকার মানুষ চেনা দায়। কথার ভাবে এই বুঝায় যে সরল দেলখোলসা মানুষ আজকাল অতি বিরল। সবাই মনে ও মুখে বিভিন্ন ভাবাপন্ন। অন্যকে চেনা যা'ক আর নাই যা'ক, লোকে নিজেকে চিন্‌তে পারলেই যে যথেষ্ট হয়। তা' কি চিনবার চেষ্টা কেউ করে? নিজের

মন আর মুখের পার্থক্য অনুভব ক'রে কখন লজ্জিত হয় কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের দ্বিভাব উপলব্ধি ক'রে বরং নিজেকে খুব বাহাদুর বলে মনে করে। অনেকে আবার "মনসা চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞো বচসা ন প্রকাশয়েৎ" ইত্যাদি প্রমাণ দিয়ে নিজের শয়তানীর পোষকতা করে। নিজে দশজনের মধ্যে একজন হওয়া চাই, জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা কার্য্যে মুলগায়েনী করার প্রবৃত্তি তথাকথিত কর্তাদের হৃদয়ে সদাই জাগরিত। মুলকথা মান্য গণ্য ধন্য হ'য়ে বাহবা ও সেলাম নেবার প্রবৃত্তি এমনভাবে পোষণ করে যে নিজের কোনরূপ ক্ষতি স্বীকার না ক'রে একটা হোমড়া চোমড়া হবার ফন্দী যেন কেউ ধরতে না পারে।

বর্তমানে অনেকগুলি দেশীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পুরোহিতব্রতী বহু কর্তার মুখোস খুলে গেছে। এই সকল ন্যাতার অনেকেই ন্যাতাজোবড়া হ'য়ে পড়েছেন। এমন রত্ন বাংলার জেলায় জেলায় নগরে নগরে খুঁজলে অনেক বেরুবে। তবে ধরা বড় কঠিন। প্রবাদ আছে—আ'লে আ'লে জমি না করলে আর পাশাপাশি বাড়ী না করলে মানুষ চেনা যায় না। প্রায় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে স্বার্থত্যাগী, পরার্থে বিনা বেতনের নোকর, হাকিম-হুকিম-সম্মানিত মহাত্মাগণের মধ্যে শতকরা নব্বই জন এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা দরবারে যেতে পায়, ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনর প্রভৃতি রাজপুরুষগণের কাছে ফোঁপরদালালী করে, দেশের ছোটলোক বদমায়েসদের কার্য্যাদি সমালোচনা ক'রে অন্ততঃ আইনের অব্যর্থ সন্ধান বি, এল বেসে ফেলে দেশশাসনে প্রধান সহায় হ'য়ে দাঁড়ায়, এই সৎকর্ম্মের জন্য সরকারের খেতাব, খেলাৎ পেয়ে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ দিয়ে গোঁপে চাড়া দিয়ে জনসাধারণের তথা রাজশক্তির চক্ষে ধুলি দিয়ে নিজের মতলববাজী ষোল আনা বজায় করে রাখে।

এই সকল মহাপ্রাণদের বলি—মশাই গো! অন্য মানুষ চিনতে আর ক্লেশ করবেন না, নিজেকে বেশ করে চিনুন সব লেঠা চুকে যাবে। যদি সত্যি সত্যি নিরপেক্ষভাবে নিজের ব্যবহার ও কার্য্যাবলী সমালোচনা করেন তবে দেখবেন হাজারে ন' শ' নিরনব্বইটী মেকী চালিয়ে মান্য, গণ্য হয়ে বসে আছেন। আলোচনা করলে দেখতে পাবেন সরকারী সনদের জোরে কত দুর্বল প্রতিবেশীর জমি চাপতে চাপতে ভরিকে ভরি পার করবার উপক্রম করেছেন। ৫ টাকা ধার দিয়ে সুদের সুদ তস্য সুদ হিসেব ক'রে তার যথাসর্বস্ব গ্রাস করেছেন। আবার সেই অপকর্ম্মের বড়াই ক'রে বড় মুখে লোকের কাছে সুবিধায় সম্পত্তি কেনার সুবুদ্ধির স্পর্দ্ধা করতে ছাড়েননি। দীন দুঃখী গ্রামবাসীকে বিপদে ফেলার ভয় দেখিয়ে এক শো একদিন বেগারে হাড়ভাঙ্গা খাটন খাটিয়ে নিয়েছেন। যদি কেউ একটু অবাধ্যতা দেখিয়েছে অমনি গোবদ্যির বিষ বড়ি—হাকিমের কাছে রিপোর্ট প্রয়োগ ক'রে দেব দুর্লভ চৌকীদারী চাকুরিটা খসিয়ে দিয়ে সাধারণের কাছে নিজে অমানুষিক শক্তি ও প্রবল পরাক্রমের পরিচয় দিয়ে সকলের ভীতি সঞ্চার ক'রেছেন। কাক মনে ক'রে—সে ডালে ব'সে '—' তাকে কেউ দেখতে পায় না। একটী পুরান প্রবচন আছে—

দিন পাঁচ ছয় লুকোচুরী,
পরে শোনে শত্রুপুরী।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে উঠে কুবাতাস
অপকর্ম্মের গালে কালি আপনি হয় প্রকাশ।

অন্যকে চিনতে হবে না একবার আত্মদর্শন করুন।

বর্ত্তমান শিক্ষা।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা

ব্রহ্মচর্য্যই সকল শিক্ষার মূল—বিদ্যার্জনের ভিত্তি। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন না হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে প্রকৃত বিদ্যা আয়ত্ত করা খুবই কঠিন; যদিও বা মেধার সাহায্যে বিদ্যা লাভ করা যায়, কিন্তু তাহা কখনও কার্য্যকরী হয় না—অর্জিত বিদ্যা নিষ্ফলা হয়। বিদ্বান্ যদি দেশের ও দশের মঙ্গলসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল ধীসম্পন্ন হইলেই চলিবে না, সংযমী ও চরিত্রবান হইতে হইবে। অসংযমী-ইন্দ্রিয়পরবশ বিদ্বান্ ব্যক্তির অপেক্ষা সংযমী সচ্চরিত্র অজ্ঞকেই লোকে অধিক শ্রদ্ধা করে, তাঁহার কথায় অধিক বিশ্বাস করে, এবং তাঁহাকেই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। কেবল সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যই যে মানুষের সংযমী হওয়া দরকার, তাহা নয়, আত্মসংযম ছাড়া আত্মোন্নতিও অসম্ভব। আত্মসংযমী না হইলে কঠোর জীবন সংগ্রামে মানুষ ক্ষণকালও আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাঁহার অপেক্ষা চরিত্রবল সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা পদে পদে পরাজিত হইবেই হইবে। শিক্ষার্থীকে জীবন সংগ্রামে আত্ম-রক্ষাপটু করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এখন যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে যে ঐ উদ্দেশ্য সফল হয়, একথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না। সুতরাং প্রচলিত শিক্ষায় যে অনেক দোষ আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন শিক্ষার প্রধান দোষ কি? প্রধান দোষ—শিক্ষার্থীকে বিলাসী করিয়া তোলে। এমন খুব কম বিদ্যালয়েই আছে যেখানে প্রকৃত শিক্ষাদান করা হয়, যেখানে কর্তৃপক্ষেরা বাণিজ্য নীতির মূল সূত্রগুলি ভুলিয়া গিয়া, কেবল বিদ্যাদান করিবার জন্য বিদ্যালয়ের পরিচালনা করেন। এই সকল ব্যবসাদারী স্কুলে ছাত্রের চরিত্রগঠনের দিকে কিছুই দৃষ্টি রাখা হয় না, ফলে ছাত্র বাল্যকাল হইতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। ছাত্র প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতেছে কিনা সে বিষয়ে মাথা ঘামান বিদ্যালয়ের পরিচালকেরা কর্তব্য বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারা কোন রকমে মাসিক বেতন হস্তগত করিতে ও বিদ্যালয়ের লাভ লোকসানের খতিয়ান করিতে যত ব্যস্ত শিক্ষার জন্য তত নয়। যাহাতে বালক নিয়মিতরূপে বেতন দেয়, যাহাতে সে কর্তৃপক্ষের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া স্কুল পরিত্যাগ না করে সেইজন্য কর্তৃপক্ষ ছাত্রের মনতুষ্টি করিতেই ব্যস্ত, এবং নিয়মিতরূপে দক্ষিণা পাইলেই আর কোনরূপেই ছাত্রকে ত্যক্ত করিতে রাজি নন। ফলে ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহারা আর বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্ত্তন করিতে চায় না, শিক্ষকের উপর তাহাদের ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই—তাঁহার শাসন মানে না। শিক্ষকও কর্তৃপক্ষের অসন্তুষ্টির ভয়ে ছাত্রকে শাসন করিতে সাহস করেন না।

এদিকে বালকের প্রবল উচ্ছৃঙ্খলতা বাধা না পাইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গৃহেও মাতাপিতা তাঁহাদের "আলালের দুলালকে" শাসন করিতে প্রস্তুত নন, কোনও কঠোর নিয়মে বাল্যকাল হইতে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় ইহাও তাঁহাদের ইচ্ছা নয়। "আহা, আমার অমুক বড়ই দুর্ব্বল সে কেমন করিয়া কঠোর নিয়ম পালন করিবে, তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, হয়'ত কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যাইবে" বাঙ্গালী অভিভাবকেরা প্রায়ই এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন অভিভাবক খুব অল্পই আমাদের দৃষ্টিগোচর

হয়, যিনি বালকের ব্রহ্মচর্য পালনের কথা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া না উঠেন। স্নেহময় পিতা হইয়া কিরূপে তিনি কোমলপ্রাণ দুর্বল শিশুকে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত আচরণ করিতে বলিবেন। অসূর্য্যস্পশ্যা কোমলাঙ্গিনীদের মত অন্তঃপুরে কুসুমপেলব মাতৃক্রোড়ে বাঙ্গালী শিক্ষার্থী লালিতপালিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্য ব্রতের উচ্চ আদর্শ আর আমাদের বেতনভোগী শিক্ষকদের ও উন্মার্গগামী বিলাসিতাপরায়ণ শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করে না। যতদিন না শিক্ষার আদর্শ পরিবর্তিত হইবে, যতদিন জাতীয় ধারার সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন শিক্ষা দেশে প্রবর্তিত থাকিবে, ততদিন জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত।

বর্তমান হিন্দু জাতি ও আমাদের কর্তব্য।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা

হিন্দু সমাজের মধ্যে অনেক গলদই রহিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি গলদ এমন ভয়ঙ্কর যে তাহা অবিলম্বে দূর করিতে না পারিলে হিন্দু সমাজের কল্পনা করাও বৃথা। আজকাল এই গলদ এতদূর প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা আর ধামা চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার উপায় নাই।

এই গলদের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রধান হইতেছে, ছুঁৎ মার্গ পরিহার, বিধবা বিবাহের প্রচলন এবং পণপ্রথা নিবারণ না করা।

আমাদের হিন্দু সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি কি ভাবে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর এতদিন অকথ্য অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, যাহার ফলে দলে দলে তাহারা হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস এতদিন কাহারও হয় নাই। তাহারা শুধু এতদিন ঐ সকল তথাকথিত উচ্চশ্রেণী হিন্দুদের নিকট হইতে অত্যাচারই পাইয়া আসিতেছে এবং যখন অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে তখন তাহারা অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ শুধু স্ব-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া সে এই অত্যাচারের প্রতিবিধানের চেষ্টা করে নাই বা সে সাহস তখন তাহাদের ছিল না। কারণ বরাবরই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের নিকট হইতে সে এই কথা শুনিয়া আসিতেছে যে সে নীচ, সে অস্পৃশ্য, সমাজের সকলের নিম্নে তাহার স্থান। তাহারা কোনদিনই এ কথা ভাবিয়া দেখে নাই যে ভগবানের রাজ্যে ছোট, বড়, উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন সকলেই সমান। তাঁহার কাছে ছোট, বড় নাই। এই ছোট বড়র ভেদাভেদ ভগবানের সৃষ্টি নয়, এ সৃষ্টি নয়, এ সৃষ্টি মানুষের সুতরাং এ সৃষ্টিকে মানুষ কখনই চিরকাল সমান-ভাবে মানিয়া চলিতে পারে না।

আজ উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের এই যে বিরাট অভিযান, তাহা শুধু গত শত শত বৎসরের অত্যাচারের ফল। ইহা শুধু অন্যায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ন্যায়কে, অসত্যকে পদদলিত করিয়া সত্যকে এবং সর্বোপরি সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের ন্যায়সঙ্গত সমান অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই অভিযানের সৃষ্টি। আজ এই অভিযানকে সাফল্য

মণ্ডিত করিয়া তুলিবে তাহারাই যাহারা এতকাল ধরিয়া কেবল অত্যাচারকেই সহ্য করিয়া আসিয়াছে।

তাই আজ হিন্দু এই নব-জাগরণের দিনে, জাতির এই নব অভ্যুদয়ের প্রারম্ভে আমাদের এই কথাটাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে হিন্দু সমাজের প্রকৃত গলদ কোথায় এবং তাহা অবিলম্বে দূর করিবার উপায় কি।

তারপর বিধবা বিবাহের কথা। বিধবা বিবাহের যে প্রয়োজন আছে এ কথা সকলে স্বীকার করিলেও হাতে কলমে অনেকেই ইহার ভার গ্রহণ করিতে চান না সমাজের ভয়ে। তাহারা দূরে থাকিয়া মুখে মুখে বাহবা দেন মাত্র।

সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন যেরূপ নিতান্ত প্রয়োজন বিনাপণে যাহাতে বিবাহ হয় তাহার একটা ব্যবস্থা করাও সেইরূপ দরকার। এই পণ-প্রথার বিরুদ্ধে বড় বড় মিটিং করিয়া বক্তৃতা দিলে কোন ফল ফলিবে না। কাগজে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিলেও এ সমস্যার সমাধান হইবে না। এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করে ছেলের বাপ মায়ের উপর। তাঁহারা যদি একটু ত্যাগ স্বীকার করেন তবেই এই ভীষণ পণপ্রথার সমাধান সম্ভব।

এই সমস্যার সমাধান যে ছেলেদের উপর একেবারেই করে না তাও নয়। তাহারা একটু যদি অবাধ্য (?) হইয়া বিনাপণে বিবাহ করিতে প্রকৃতই ইচ্ছুক হয় তবে পিতামাতার শত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাহা আটকাইতে পারে না।

এই ভীষণ পণ-প্রথার জন্য কত মেয়ের বাপের সংসার যে একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত যুবতী যে পিতামাতাকে এই চিন্তার দায় হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে তাহাও বলিয়া শেষ করা যায় না। আজকাল এমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে মেয়ে প্রসব করিলে আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত প্রসবকারিণীকে হতভাগিনী বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না এবং শুধু তাহাই নয় তাহার জন্য প্রসবকারিণীকে অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনাও ভোগ করিতে হয়।

হায় অভিশপ্ত সমাজ! কবে তোমার চোখ ফুটিবে? কবে তুমি এই জঘন্য প্রথার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিবে, তাহা তুমিই জান। এই সকল সমাজ ধ্বংসকারী প্রথার সমূলে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে হিন্দু সমাজের উন্নতি অসম্ভব।

তাই আজ করজোড়ে বাংলার ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল যুবকদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন তাহারা এই সকল বিষয়ে এখনও একটু চিন্তা করুন। তাহারা এদিকে একটু মন দিলেই এই সকল কু-প্রথার ধ্বংস অনিবার্য্য।

বাঙ্গালা দেশ কাহাকে বলে?

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা

মহা মনীষী মার্শম্যান সাহেব বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষের যে অংশের লোক বাঙ্গালা বলে ও বাঙ্গালা লেখে, তাহার নাম বঙ্গ বা বাঙ্গালা দেশ।"

কিন্তু একথা এখন খাটে কৈ? বাঙ্গালা দেশের লোক এখন ইংরাজী বলে, হিন্দীতে কপ্‌চায়—তথাপি পারৎপক্ষে বাঙ্গালা বলে না। যদিও শিক্ষিতগণ

দয়া করিয়া বাঙ্গালা বলিবার একটু চেষ্টা করেন, সে বাঙ্গালার সঙ্গে পনের আনা ইংরাজী মিশানো থাকে। আর বাঙ্গালা লেখার কথা ছাড়িয়া দাও, বাপকে চিঠি লিখিতে হইলে, উপযুক্ত ছেলে সম্বোধন খুঁজিয়া পান না, লেখেন—"মাই ডিয়ার ফাদার" মনের দুঃখে ভালো লোক বাংলা লেখেন না, শিক্ষিত লোক বাঙ্গালা পড়েন না ; বলেন—"বাঙ্গালা আবার পড়িব কি ? তবে কেহ কেহ বাঙ্গালা লেখে বটে—সে নাটক, নভেল, কাব্য। শুনিয়াছি বাঙ্গালা লেখায় নাকি বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হইয়াছে, সম্প্রতি "দাম্পত্য বিজ্ঞান" "যৌবন বিজ্ঞান" প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ অপূর্ব পুস্তক বাজারে বাহির হইয়াছে। ছোকরা ও ছুকরীর দল—পিনালকোড বাঁচাইয়া উহা মন দিয়া পড়িতেছে। ফলে—পথে পথে "মদনানন্দ মোদকের ফেরি চলিতেছে। খবরের কাগজে দেখিতে পাই তিনটী জিনিষের বিজ্ঞাপন। লালসাময়—হাবাতের লেখা পুস্তকাবলী, পেটেণ্ট ঔষধ, আর কেমিকেল স্বর্ণের অলঙ্কার !

"বাঙ্গালা দেশে যাহারা বাস করে তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলে।" হরি ! হরি ! এমন ডাহা মিথ্যা কথাও লিখিতে আছে ? বাঙ্গালা দেশে—ইংরাজী, পার্শী, মাড়োয়ারী, ভুটিয়া, আরমানী, জাপানী, চীনা, বেহারী, দিল্লীওয়ালা, বোম্বাই-ওয়ালা, আসামী, ভুটানী, নেপালী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, শিখ, গুর্খা প্রভৃতি সকলেই বাস করে,—ইহাদিগকে কি বাঙ্গালী বলা চলে ? কখনই নয়।

অতএব এখন বলা যাইতে পারে—পেটের দায়—বড় দায় ; অর্থাৎ এই যে সামাজিকতা, নীতি, বিদ্যা, বিলাস, শাস্ত্র এমন কি ধর্ম—মানুষের যা'কিছু সমস্তই পেটের দায়ে। এহেন পেটের দায়ে—সকল দেশের লোক, যে দেশে একত্রিত হয়—তাহার নাম বাঙ্গালা দেশ। আর সেই বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়া যাহারা মক্ষিকা হইতে ক্ষুদ্র, মশক হইতে দুর্বল, আরসুলা হইতে নির্বোধ এবং কেন্ন হইতে ঘৃণ্য—তাহারাই প্রকৃত বাঙ্গালী।

অধিবাসিগণ।

বাঙ্গালা দেশে যে সকল মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা দুই জাতিতে বিভক্ত। যথা পুরুষ জাতি ও স্ত্রী জাতি। এই পুরুষ জাতি আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম উত্তম পুরুষ, ২য় মধ্যম পুরুষ, ৩য় অধম পুরুষ। ব্যাকরণ শাস্ত্রেও তিন প্রকার পুরুষের উল্লেখ আছে। আবার দার্শনিক পণ্ডিত-গণও তিন রকম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

যাঁহারা দণ্ড মুণ্ডের কর্তা—হ্যাটকোট পরেন, চতুর্হস্ত পরিমিত দেহ, গৌরবর্ণ—তাঁহারা উত্তম পুরুষ। অসিত চর্মধারীও যদি হ্যাটকোট পরেন, তাঁহার উপরের সাত পুরুষ নীচের সাত পুরুষের মধ্যে কেহ কস্মিন্ কালে সাগর না ডিঙ্গাইলেও—তিনি উত্তম পুরুষ মধ্যে গণ্য। দর্শনশাস্ত্র মতে ইহাদের নাম রাজপুরুষ বা সাকার পুরুষ।

যাঁহারা পত্নীতে নিতান্ত অনুরক্ত, পিতা মাতার প্রতি বিরক্ত, শ্যালক শ্যালিকার সাহায্য শাক্ত, পায়স পিষ্ট ছাড়িয়া চপ কাটলেটের ভক্ত, মুর্গী মটনে আসক্ত,—যাঁহাদের জ্বালায় দেশের লোক উত্যক্ত, তাঁহারাই মধ্যম পুরুষ।

আর যাহারা চাষবাস করে, দোকান পসার চালায়, গাল খায়, টেক্স দেয়,

মরা ফেলে, বারোয়ারী পাণ্ডা হয়, শাক সুক্ত ভক্ষণ করে তাহারা অধম পুরুষ। তাহাদের দার্শনিক নাম কাপুরুষ। ইহারা একরকম নিরাকার।

স্ত্রী জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা ব্রত পূজা করেন, দেব দ্বিজে ভক্তি রাখেন, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেন, ভাত রাঁধেন সেই লজ্জা নিরতা আত্ম বিসর্জিতা, পরার্থপ্রাণা ধর্মেক শরণা নারীগণ "প্রবীণা" অর্থাৎ "অসভ্যা।" আর যাঁহারা আত্মনিরতা, বিভ্রমতৎপরা, রঙ্গ পরায়ণা, বিলাসিনী, বডি গাউন পরেন, সাবান মাখেন পাউডারে অঙ্গরাগ বাড়ান, নাকিসুরে কথা কন তাঁহাদের নাম "নবীনা।" নবীনারা "সভ্যা", পুরুষ জাতি ইঁহাদের অধীন।

বাঙ্গালা দেশের শাসন কর্তা।

বাঙ্গালা দেশ বাবুর দ্বারা শাসিত হয়। যথা আফিসে কেরানী বাবু, ইস্কুলে মাষ্টার বাবু, আদালতে ডেপুটী বাবু মুনসেফ বাবু, উকিল বাবু পেসকার বাবু, পুলিশে দারোগা বাবু কনেষ্টবল বাবু, রেলে তার বাবু টিকিট বাবু মাল বাবু, জমিদারীতে নায়েব বাবু গোমস্তা বাবু সরকার বাবু, সংসারে কর্তা বাবু কাকা বাবু মামা বাবু খোকা বাবু দাদা বাবু দিদি বাবু (বাবু শব্দ সাধু শব্দের উভয় লিঙ্গ) কর্মক্ষেত্রে বড়বাবু ছোটবাবু, পথে ঘাটে হাটে মাঠে অলিতে গলিতে রামবাবু শ্যামবাবু যাদুবাবু মাধুবাবু, তীর্থক্ষেত্রে মহান্তবাবু, আর কত নাম করিব? যেদিকে ফিরাই আঁখি বাবুময় সবই দেখি। বাঙ্গালা দেশে বাবু জন্মায়ও বেশী।

বাঙ্গালা দেশে কি কি হয়?

পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য হয়, দুর্ভিক্ষ হয়, ম্যালেরিয়া হয়, উচ্চ মূল্যে বর বিক্রয় হয়, কন্যাদায়ে ভিটা বেচিতে হয়, বুড়ার সঙ্গে বালিকার বিবাহ হয়, বালবিধবাকে একাদশী করিতে হয়। পুরুষের ডাইবিটিস হয়, স্ত্রী জাতির হিষ্টিরিয়া হয়। গলাবাজিতে দেশ উদ্ধার হয়, অভাগার জন্ম হয়, ভাগ্যবানের মরণ হয়।

বাঙ্গালার ভিখারী।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা

বাঙ্গালায় ভিখারীর অভাব নাই। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্বেই ভোরাই কীর্তন শুনিবে। নাম শুনাইয়া কীর্তনিরা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। অরুণোদয়ের পর মার্তণ্ডদেবের মধ্যগগনে উপস্থিতি পর্য্যন্ত, হাতে পৈঁচে, চুড়ী, কোমরে গোট, কানে দুল, গলায় কণ্টি, নাকে নাকচাবি, নাসায় তিলক, অধরে তাম্বুলরাগ বৈষ্ণবীর দল গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলে জয় রাধে কৃষ্ণ! কথায় বলে ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। কিন্তু ভিক্ষা ভিন্ন ত বাঙ্গালার আর কিছু দেখতে পাই না।

গ্রন্থকার সমালোচনার ভিখারী। নেতা প্রশংসার ভিখারী। দেশভক্ত

চাঁদার ভিখারী সমস্ত দেশ অধিকারের ভিখারী। স্বর্ণ গর্দ্দভ চাটুর ভিখারী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈভবের ভিখারী, নিন্দুক পরগ্লানির ভিখারী, সংস্কারক পুঁজ-রক্তের ভিখারী, গোঁড়া কপটতার ভিখারী রাত ভিখারী, দিন ভিখারী, বড় ভিখারী, ছোট ভিখারী, ভোটের ভিখারী, খোস-নামের ভিখারী, ভিখারীর ত সংখ্যা হয় না।

এই সকল ভিক্ষার মধ্যে রাজদ্বারে ভিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহাই পরম এবং চরম ভিক্ষা। তাহাই ভিক্ষার উচ্চৈশ্রবা, ঐরাবত, পারিজাত। তাহাই ভিক্ষার রত্নমালার মধ্যমণি কৌস্তভ বা ভিক্ষামুকুটের কোহিনুর। তাহাই ভিক্ষার বনস্পতি। তাহাই ভিক্ষা-বিগ্রহের আত্মা। তাহাই ভিক্ষা-চূড়ার উপর ময়ূর পাখা। আর সকল ভিক্ষা এ ভিক্ষার নিকট নিষ্প্রভ। এ ভিক্ষার জুড়ী নাই। এ ভিক্ষার তুলনা এ ভিক্ষা।

অন্য ভিখারীর হাতে এক ক্ষেত্রে পার পাওয়া যায়। কিন্তু এ ছিনে জোঁকের মত নূন বাঙ্গালায় নাই। এ ভিখারী বুনো-ওলের মত বাঘা তেঁতুল দেশে দুর্লভ। "জয় রাধে!" শুনিলেই আনাচে কানাচে খঞ্জনী বাজিলেই তুমি পারো আর না পারো—এক মুষ্টি তণ্ডুল দিতেই হয়। আবার অন্ধ নাচারকে একটী পয়সা দাও বাবা, শুনিলে বুকটা ছাঁত করিয়া উঠে। বিড়ির পয়সাও বাজে খরচ করিতে হয়। নস্যের পয়সাটীও ট্যাঁক হইতে বাহির হইয়া অন্ধ ভিখারীর পূর্ণ গেজের সঞ্চিত পয়সা আনির ঝাঁকে মিশিয়া যায়।

কিন্তু এই অজেয় ও অমেয় ভিখারীর কাছেও সময়ে পার পাওয়া যায়। "অশৌচ" শুনিলেই ইহারা পালায়। শুভাশৌচ ক্ষমা করে; মৃতাশৌচেও রেহাই দিয়া থাকে। ভিক্ষা দিতে নাই শুনিলে এ সব ভিখারী আর দাঁড়ায় না। বাড়ীর সম্মুখে হাঁড়ী খোলা দেখিলে, আপনারাই চলিয়া যায়। ভিখারীরা এ বিবেচনাটুকু বরাবর রাখিয়া আসিতেছে।

কিন্তু রাজনীতির ভিখারীরা এ ধর্ম মানেন না। রাজদ্বারের ভিক্ষায় শৌচার বিচার নাই। কেবল দেহি দেহি রব! কমিশনের আঁতুড়ে দেহি! অধিকারের শ্মশানেও দেহি! তোমার হাজুক, মজুক, তুমি বাঁচো আর মরো, ভিক্ষা দাও! আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আবেদনের খঞ্জনী বাজাইতেছি, তুমি ভিক্ষা দাও। আমার যাহা আছে তাহার একটী কাণাকড়ি পর্য্যন্ত গরীবের পিতৃরক্ত—আমি দিতে পারি না নিতে জানি, আমায় ভিক্ষা দাও! অনেকবার গলাধাক্কা খাইয়া ফিরিয়াছি, এবং হুলোর মত সাত পা চলিয়াই ভুলিয়া গিয়াছি, এবার নূতন মখমলের খাসা ভিক্ষার ঝুলি সেলাই করিয়া আনিয়াছি, করোনা বঞ্চিত দাও কিঞ্চিৎ।

কি বালাই অশৌচেও মুক্তি নাই। এই ধর গত ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে আমাদের রাজা ইংরেজের লক্ষ লক্ষ সন্তান মরিয়াছে, এখনও তাহাদের মৃতাশৌচ যায় নাই, তবু ভিখারী তাড়াইবার যো নাই। তবু ভিক্ষা সমানে সজোরে সটানে সজ্ঞানে চলিতেছে। ইহারা এমন তুখোড় ভিক্ষুক যে বলিতেছে আমরা দেড়শ বছরের অন্ধ, দুশো বছরের খোঁড়া তিনশো বছরের কুঠে বলিয়া জাঁক করিয়া ভিক্ষা দাবী করিতেছে!

আর ত দেখা যায় না। দেহি দেহি রবে অরুচি হইয়া গেল। দোহাই রাজনীতির ভিখারী ব্রিটিশ রাজ্যে এখনও মৃতাশৌচ যায় নাই, এখন ভিক্ষার ঝুলি শিমুল গাছের ডালে তুলিয়া রাখো। আবার সময় হইলে বাহির করিও,

তোমাদের দেহি দেহি রবে গগন পবন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দোহাই তোমাদের !

কন্যাদায়ের প্রতিকার।

১৩৩৪ সাল ১৪শ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা

"দোষ কারু নয় গো মা,
স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

নিজের পাপের ফল আমরা আজ ভোগ করছি, নারীনির্য্যাতনে—তাঁহাদিগকে দাবিয়া রাখার ফলে—যে হলাহল উঠিয়াছে তাহার জ্বালায় আজ আমরা জর্জরিত, সেই হলাহল 'কন্যাদায়'। এই বিষের জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কত দাওয়াইর ব্যবস্থা না করিতেছি, কিন্তু রোগের নিদান অনুযায়ী ঔষধ না হইলে রোগ সারিবে কেন !

আসামে মেয়েরা শিল্প কার্য্য দ্বারা অনেক উপার্জন করেন, সেইজন্য মেয়েদের বিবাহের ভাবনা ভাবিতে হয় না বরং পুরুষের বিবাহের ভাবনাই ভাবা প্রয়োজন। বাংলার মেয়েরা চরকা, তাঁত বা অন্যপ্রকার গৃহশিল্পে নিপুণা হইলে বরের পিতা ভাবী লাভের আশায় কন্যার পিতার শোণিত শোষণ করিবেন না, কাজে কাজেই কন্যাদায়ের প্রতিকার হইবে। কিন্তু বাংলাতে এ উপায়ে কতটুকু কার্য্যসিদ্ধি হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। কারণ উপার্জনশীলা পুত্রবধূ পাইলেও বরের পিতা যে আরও কিঞ্চিত 'ফাউ' মারিবার চেষ্টা করিবেন না সে সম্ভবপর নয়, কারণ মেয়ের উপার্জনরূপ ঔষধ 'কন্যাদায়ের' নিদানানুযায়ী ঔষধ নয়, তবে উহা দ্বারা যে অনেক উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তারপর কন্যার উপার্জন বিচার করিয়া বিবাহ ব্যবসাদারী মাত্র—আজকাল যাহা চলিতেছে তাহারই পরিবর্তিত সংস্করণ। পরিবর্তন ও সংস্কার উদ্ধৃগামী হওয়া চাই। এক দোকানদারীর প্রতিকার অন্য দোকানদারীর দ্বারা হওয়া খুব বাঞ্ছনীয় নয়—যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে মেয়ের গুণপনার দিক দিয়া দেখিলে উহাকে ঠিক দোকানদারী বলা চলে না, কিন্তু কার্য্যতঃ বিষয়টার টাকা আনা পাই এ গিয়া দাঁড়ানো খুবই সম্ভবপর।

আর এক উপায় আছে—তাহা আইন। সামাজিক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন তাহা আমরা পছন্দ করিনা—যদিও বিশেষ বিশেষ স্থলে তাহা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আসল কথা এই যে আইনের দ্বারা পণপ্রথা নিবারিত হইবে না—কারণ রোগের নিদান যাহা তাহার কোন খবরই এতে নাই। রোগের মূল নষ্ট করিবার চেষ্টা করা উচিত। আইন করিলে লাভ হইবে এই যে চুরি করিয়া পণ দেওয়া নেওয়া চলিবে—কারণ বস্তাপচা মাল(!) ঘুস দিয়া চালান দেওয়া চাইত' ! তাহা না হইলে 'জাতিপাত' অনিবার্য্য ! আরও বধূ-নির্য্যাতন প্রবলতর আকার ধারণ করিবে, তজ্জন্য অন্য আইনের প্রয়োজন এবং তস্য দোষ নিবারণের জন্য অন্য আইন ইত্যাদি অর্থাৎ রক্ত দূষিত হইলে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে চর্মরোগ প্রভৃতি সারিলেও যেমন তাহা অধিকতর অনিষ্ট করে, এরূপ আইনও সেরূপ অনিষ্টের হেতু হইবে।

আজকাল আবার আত্মহত্যার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এতদিন মেয়েরাই তাঁহাদের পথ পরিষ্কার করিতেন, এবার পুরুষেরাও তাঁহাদের অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। আচ্ছা, সমস্ত জাতিটা যদি একদিন আফিং খেয়ে বসে তা'হলে কেমন হয়? কোনও ঝঞ্ঝাট থাকে না—সব সমস্যা, সব 'দায়ে'র প্রতিকার হইয়া যায়! আমাদের পক্ষে বোধ হয় উহাই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা।

আত্মহত্যা যাঁহারা করেন তাঁহাদের নিকট আর একটা পথ খোলা আছে এবং আমাদের মনে হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। যে সামাজিক পৈশাচিক ব্যবস্থার জন্য যন্ত্রণা ভোগ সেই ব্যবস্থার যাতে উচ্ছেদ হয়, তাহা করিলে শুধু একের নয় দশের আত্মহত্যা বোধ হয় তাহাতে বন্ধ হইতে পারে।

দেশের অবস্থা।

১৩৩৫ সাল ১৫শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা

কবি বলিয়াছেন—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার,
লাঙ্ঘতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দেশবাসী আজ মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায় কিন্তু দেশের চারিদিকে আজ যে দুস্তর সাগর বাহু বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যে দুর্গম গিরি কান্তার দেশের মুক্তিপথ যাত্রীর পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—দেশবাসী কেমন করিয়া এই সাগর পাড়ী দিবে, কেমন করিয়া ঐ গিরিকান্তার উল্লঙ্ঘন করিবে?

স্বাধীনতার পথ কোন কালেই কুসুমাবৃত নয়। সে পথ চিরকালই অতি পিচ্ছিল কণ্ঠক কঙ্করময়। যে মুক্তির জন্য পাগল হইয়াছে, যাহার অন্তরে বাহিরে মুক্ত স্বাধীন হইবার ঐকান্তিক আগ্রহ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে সে ঐ বাধা বিপত্তি, বিঘ্ন বিপর্য্যয়কে হাস্য মুখেই উপেক্ষা করিয়া প্রচণ্ড শক্তিবলে আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া যায়।

আজ দেখিতে হইবে যাহারা মুক্তি মুক্তি করিয়া দেশের বুকে নাচিয়া বেড়াইতেছে, যাহারা স্বাধীনতার জয়ঢাক পিঠে লইয়া দেশবাসীকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাদের অন্তরে সত্য সত্যই মুক্তির প্রেরণা, বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে কিনা।

মিথ্যা আড়ম্বর, মিথ্যা বাহ্বাস্ফুট করিয়া লোক ভুলাইবার দিন এককালে ছিল বটে কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ মানুষের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, মানুষ মানুষকে আজ অতি সহজেই চিনিতে এবং বুঝিয়া ফেলিতে পারে। কাহার ভিতরে কতটুকু সত্য আন্তরিকতা আছে আর কাহার ভিতরে শুধু স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা লুক্কাইত আছে—কে ফাঁকি দিয়া আত্ম স্বার্থ উদ্ধার করিয়া লইতে গিয়া দেশের সর্বনাশ সাধন করিতেও পরাঙমুখ হয় না, বহু অভিজ্ঞতার ফলে দেশবাসী আজ সেই সকল বর্ণচোর, সিংহচর্মাবৃত মেষের দলকে অনায়াসেই চিনিয়া ফেলিতে শিক্ষা করিয়াছে।

চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না। আজ শুধু চালাকী করিয়াই কি এদেশে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড্ডীন করা সম্ভবপর হইবে? যাঁহারা

নেতা, যাঁহারা কর্মী, যাঁহারা প্যাট্রিয়ট বলিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, দেশের জনসমষ্টির বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কুড়াইয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের আজ আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—তাঁহাদের আদর্শ কি? দেশকে স্বাধীন করিবার প্রকৃষ্ট পথ কি? শক্তি কোথায়? সেই পথ নির্দেশ আজ কে করিয়া দিবে? শক্তি-কেন্দ্রের সন্ধান আজ কে আনিয়া দিবে?

দেশের অগণিত শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় আজ কর্ম্মোন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের ডাক দিয়া পথে বাহির করিবার লোক নাই। সবাই কেবল 'মুখেন মারিতং জগৎ'। চায়ের টেবিলে বসিয়া উজীর নাজীর বধ করিতে সবাই ওস্তাদ। প্রাণের ভিতরে কি কাহারো প্রেরণা আছে দেশের প্রতি ঐকান্তিক দরদে কাহারো বুকের পাঁজর কি ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে? যেখানে যাও, যেখানে দাঁড়াও সেখানেই দেখিবে কেবল দলাদলি, রেষারেষি এবং সাম্প্রদায়িক লড়াই ফল্গু ধারার মত অবিরত চলিয়াছেই।

দেশপ্রীতির চতুঃসীমানার ভিতর স্বার্থের গন্ধ কিম্বা সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বাষ্প প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু আজ আমাদের দেশের আনাচে কানাচে দূষিত বাষ্প জমাট বাঁধিয়া কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রনীতিক, কি ধর্ম-নীতিক সর্ব বিষয়ে দেশটাকে শুধু পঙ্গু করিয়া রাখে নাই, পরন্তু পেছনের দিকে টানিয়া জাহান্নামের দিকেই ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। এ সকল কি দেশের নেতাদের চোখে পড়ে না? যদি চোখেই পড়িবে, তবে তাহার প্রতিকার করা হয় না কেন? আর যাহা কিছু হইতেছে, তাহারই নাম যদি প্রতিকার হয় তবে এ দেশের দুর্দশা যে কবে দূর হইবে তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আসিয়া ও দেশে কমিশন বসাইয়া নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ।

উৎসাহ ও অবসাদ।

১৩৩৫ সাল ১৫শ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা

দেশে উৎসাহ অবসাদ, উত্তেজনা ঘুমন্তভাব অনবরত আসিতেছে যাইতেছে। উৎসাহের সময় দেশবাসী এক ভাবে প্রমত্ত হইয়া ছুটিতেছে আবার অবসাদের সময় নিরাশ চিত্তে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে আর ঝিমাইতেছে। ভাবের মুখে, উৎসাহের স্রোতে দেশবাসীর কাছে আজ যাহা বড় ভাল বলিয়া মনে হইল উৎসাহের অবসানে আবার তাহাই অতি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই ভাব ও অভাবের মধ্য দিয়া দেশবাসী ক্রমে জীবন পথে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। দেশবাসী যে ভাবে চলিতেছে এই ভাবে আরও কিছুকাল চলিলে তাহাদের আর চলিবার সামর্থ্য মোটেই থাকিবে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। মানুষের এবং অন্যান্য সকল প্রাণীরই জীবনে অগ্রসর হইয়া যাওয়াই নাকি অপরিহার্য্য নীতি। এই নীতি বশেই সকলে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু জগতের জন সমাজের অবস্থা বিচারে দেখা যায় জীবন পথে চলার মধ্যেই কেহ উন্নতির স্তরে ক্রমশঃ উঠিতেছে কেহ বা ধ্বংসের মধ্যে বিলয় হইয়া যাইতেছে। আমাদের এই দেশবাসী যে ভাবে

জীবন পথে চলিতেছে তাহাতে এভাবে চলিলে তাহার উন্নতির আশা দূরাশা --চলার মধ্য পথেই অচল হইয়া ধ্বংসের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে। জাতিকে, দেশকে এই ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্যই আজ দেশে বার বার উৎসাহ—আশা ভঙ্গে অবসাদ আসিতেছে। কিন্তু এই উৎসাহ ও অবসাদের ধাক্কা সহিবার মত জীবনী শক্তি দেশবাসীর আর কত দিন থাকিবে তাহাও দেখিতে হইবে।

দেশে উৎসাহ উত্তেজনা অবশ্যই চাই। অবসাদ, ঘুমন্ত ভাব, মৃতের মত সব সহিয়া পড়িয়া থাকিয়া জীবন অন্ত করিয়া দেওয়া কোন মানুষেরই কাম্য হইতে পারে না। কিন্তু উৎসাহ উত্তেজনা মানুষের জীবনে আনিবার যে প্রধান রস, যে রস উৎস হইতে জীবনে সঞ্জীবনী প্রবাহ আসে তাহারই একান্ত অভাব যদি কোন দেশে হয় তবে সাময়িক বাহ্য উত্তেজনা উৎসাহ কত-দিন মানুষের জীবনকে মাতাইয়া রাখিতে পারে? দেশবাসীর খাইবার সংস্থান, পরিবার সংস্থান প্রথমে না করিতে পারিলে, আপনার অভাব আপনি পূরণের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে দেশের উপর অপমানাহত রুদ্ধ মনুষ্যত্বের তেজ বেগই প্রবাহিত হইয়া যাক না কেন অভাবের তাড়নায় তাহা অতি শীঘ্রই আবার প্রশমিত হইয়া যায়। এই দেশে ইহা আমরা নানা ভাবে বার বারই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

উৎসাহের তীব্র মাদকতা দেশে আনিবারও যেমন প্রয়োজন আছে আবার সেই উৎসাহ জাতীয় জীবনে চিরস্থির কার্য্যকরী করিয়া রাখিবার জন্য দেশ-বাসীর বাঁচিবার উপায় গঠনমূলক কার্য্যকে অব্যাহত রাখিবারও তেমনি প্রয়োজন আছে। আপনাদের বাঁচিবার ব্যবস্থা আগে না করিয়া শুধু উৎসাহের মুখে ইন্ধন জোগাইলে সেই উৎসাহই পরে অবসাদে পরিণত হয়।

কি উপায়ে দেশে খাইবার ও পরিবার সংস্থান হইতে পারে কিভাবে দেশ এই দুঃসময়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে তাহার বিধান দেশবাসী পাইয়াছিল। কিন্তু গঠন কার্য্যে যে শ্রম, ধীরতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রয়োজন তাহা দেশবাসী মরিতে বসিয়াও দেখাইতে পারিতেছে না। আজ দেশে আবার বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রস্তাব আসিয়াছে, এ প্রস্তাব পূর্বেও আসিয়াছিল। মোটা ভাত, মোটা কাপড় পাইবার পন্থা যাহাতে বজায় থাকে সেই ব্যবস্থা আজ করিতে হইবে। খুব উৎসাহী হইয়া এই কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে ঘরে ও বাহিরে কোথাও দেশবাসীর শান্তি ও সম্মান মিলিবে না। বাহ্য উৎসাহ ক্রমেই নিবিয়া যাইবে। উৎসাহের মূল যাহা তাহাই আগে বজায় রাখিবার আয়োজন দেশবাসীকে করিতে হইবে। মোটা ভাত মোটা কাপড় দিয়া দেশের অগণিত জনসংঘকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

সাহিত্যের প্রভাব।

১৩৩৫ সাল ১৫শ বর্ষ ৪১শ সংখ্যা

জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব সামান্য নয়। জাত হিসাবে কে কত উন্নত, কে কত সভ্য—এক একটা জাতির সাহিত্যই তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়। সত্য কথা বলিতে কি, সাহিত্যই জাতির সভ্যতা নির্ণয়ের মাপকাঠি। জাতি গঠনে সাহিত্য যতটা সহায়তা করে তেমন আর কিছুতে করিতে পারে

না। সুতরাং যাঁহারা সাহিত্যিক, তাঁহারাই জাতীয় জীবন গঠনের প্রধান পুরোহিত, তাঁহারাই জাতীয় জীবনে নব নব ভাবধারা আনয়ন করিবার অগ্রদূত।

একটা জাতি কেমন করিয়া ভাবে, কেমন করিয়া চিন্তা করে তাহার সাক্ষ্য পাই আমরা তাহাদের সাহিত্যের ভিতরে। সাহিত্যই হইতেছে জাতির সমষ্টিগত চিন্তাধারার বাহ্য প্রকাশ। বঙ্কিম যেদিন লিখিয়াছিলেন—'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে' —সেই দিন বুঝা গিয়াছিল যে বাঙ্গালী জাতি বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহার শক্তিসাধনা করা আবশ্যক। সেই যুগে কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন—জন কত শুধু প্রহরী পাহারা, দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ"—আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী ভীরু বাঙ্গালী জাতির মন হইতে মিথ্যা জুজুর ভয়কে তাড়াইয়া দিবার জন্য ঐ মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত গাহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আরো বলিয়াছেন—

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহী মণ্ডলে—
জগতে যদ্যপি বাঁচিতে চাও।"

বাঙ্গালী জাতি কেমন করিয়া জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে সেই উপায় কবি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া দেশবাসীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

তার পরের যুগে বলা হইয়াছে—"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।" দেশের ভিতরে, জাতির ভিতরে মানুষের মত মানুষ নাই বলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্গতি। কবি অন্তরে অন্তরে ইহা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই অন্য সকল দুঃখকে ভুলিয়া সকলকে 'মানুষ' হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

স্বদেশী যুগে বলা হইয়াছিল—"বাংলার ঘরে যত ভাই বোন এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান !"

বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহার প্রধান সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র জাতিকে নানাদিক দিয়া, নানা কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে জাগ্রত করিয়া, নব ভাবে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে বহু চেষ্টা করিয়াছেন। আজ বাঙ্গালী জাতির ভিতরে যে জীবনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতেছে, দেশপ্রীতি বলিয়া যে জিনিষ বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত ছিল তাহাই আজ সকলের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—ইহা করিয়াছে কে? মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাই কি ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন নাই?

আজ সাহিত্য-কুঞ্জে, মা ভারতীর শ্বেতপদ্মবনে ঐরাবতের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আন্তরিক দুঃখ অনুভব করিতেছি। একদল বলিতেছেন যে সাহিত্যের ভিতরে আজ যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহা যৌবনের লক্ষণ এবং এই যৌবন-চাঞ্চল্যই জীবন-ধর্ম। স্বীকার করি জীবন থাকিলেই সেখানে চঞ্চলতা আসিবে কিন্তু সেই চঞ্চলতার ভিতরে যদি উচ্ছৃঙ্খলতা কিম্বা বিলাসপ্রিয়তা প্রকাশ পায় তবে তাহাকে কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। আজ আমাদের সাহিত্যে

তারুণ্যের দোহাই দিয়া যাহা ঘরে ঘরে বিতরিত হইতেছে তাহা শুধু স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারেরই নামান্তর মাত্র।

মনে রাখিতে হইবে আমরা পরাধীন জাতি। পরাধীন জাতির বিলাস লীলা কি সাহিত্যে, কি শিল্পকলায় কোনখানেই শোভা পায় না। শৃঙ্খল-পায় কয়েদীর জেলখানায় বসিয়া ফুল শয্যা-বিলাস হাস্য রসেরই সৃষ্টি করে।

যে পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আজ এই চপলতা আমাদের সাহিত্যে আমদানী করা হইতেছে তাহারা সবাই স্বাধীন, তাহারা যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত, তেমনি ত্যাগে বীরত্বে আমাদের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যাহা অনুকরণ করিলে জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইবে, পরাধীন মনুষ্যত্বহীন জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় হইয়া জাতিকে প্রকৃত 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবে, আমাদের সাহিত্যিকগণের সেই চেষ্টাই করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

সাহিত্যই জাতিকে গড়িয়া তোলে। সাহিত্যের প্রভাব জাতীয় জীবনে সামান্য আধিপত্য বিস্তার করে না। রুষ সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্যই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা সবুজ সাহিত্যকে উপেক্ষা করিতে চাই না কিন্তু তরুণ সাহিত্যিক-বৃন্দের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা—তাঁহারা দেশের এবং জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভাবিয়া লেখনী চালনা করিতে অগ্রসর হউন—দেশে 'মানুষ' গড়িয়া উঠুক, সাহিত্য সাধনা সার্থক হউক।

কাল প্রভাব।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

যে অনাবিল আনন্দ নির্ঝর ধারায় একদিন এই বঙ্গভূমি সর্বদাই হাস্য প্রমোদিনী হইয়া রহিত, আজ সেই সংসার সংগ্রাম পরিশ্রান্ত পরিশুষ্ক বঙ্গদেশে সুনির্মল সুর তরঙ্গিণীর প্রবাহবৎ সে পবিত্র আনন্দ-প্রবাহ কোথায় লুকায় রে! আজ যে দিকে দেখি, সেই দিকেই যেন বিশুষ্ক জীবন বিলুপ্ত উৎসাহ বিশীর্ণ মানব-কঙ্কাল রাশির অস্থিময় মুখে নিয়তই আর্তনাদের অস্ফুট বিকাশ। দিবানিশি কেবলই অন্নচিন্তা,—আর নিরন্তর কেবলই অর্থ সংগ্রহের অনন্ত আকুলতা। কাজেই এ হেন আনন্দ পরিশূন্য আর্তধ্বনি-সমাকুল বিক্ষীণ বঙ্গের আধুনিক শিল্প সাহিত্য, সঙ্গীত এবং যাত্রা প্রভৃতিও যেন অবসাদ-বিজড়িত এবং প্রাণশক্তি বিসর্জিত হইয়া উঠিতেছে! এখনও যদি কেহ কিঞ্চিৎ প্রাণ-শক্তিমান থাকেন,—তিনি আধুনিক বাঙ্গালীর শিল্পাদি লক্ষ্য করিলে এই মর্মান্তিক পরিবর্তন,—সে কালের সেই আনন্দ করার পরিবর্তে, কেবলই বিষাদ ও অবসাদই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আজ সাহিত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া যাত্রার কথাই বলি। এককালে বঙ্গদেশে যে লোকো ধোবা, মদন মাষ্টার, গোবিন্দ অধিকারী এবং নারাণদাস প্রভৃতির যাত্রার আনন্দ তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইত, আজ সেই বঙ্গে তেমন আনন্দমাখা যাত্রার আনন্দ উৎসব আর কতটা কত স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এক সময় গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের পালায় বঙ্গের সহস্র সহস্র রসিক শ্রোতা কত আনন্দলাভই না করিতেন।

"ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার—ফুলে নাই বাহার"—মালিনী মাসীর সেই রসভরা,—প্রাণভরা—আনন্দ গানে বঙ্গে কি রসভরা,—প্রাণভরা—আনন্দ গানে বঙ্গে কি রস-তরঙ্গই না প্রবাহিত হইত? বিদ্যাসুন্দরের প্রায় প্রত্যেক গানেই বাহিরে এক রস আবার ভিতরে আর এক রস! বিদ্যাসুন্দরের পালাও—শক্তিসেবক পরম ভক্তের নিকট পরাশরের ভক্তবৎসলতার পরিচায়ক মাত্র। আবার পদ্ম-পুরাণের ক্রিয়াযোগসারের পঞ্চম অধ্যায় যাঁহারা মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিয়াছেন,—তাঁহারা বুঝিবেন,—বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান,—এই গ্রন্থে বর্ণিত মাধব-সুলোচনার উপাখ্যানেরই সারাংশ বলা যাইতে পারিবে। এমন কি,—বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসীও এই উপাখ্যানে গন্ধিনী মালিনী নামে বর্ণিত হইয়াছে। মাধব আবার পরম হরিভক্ত। সুতরাং বিদ্যাসুন্দরের পালা প্রকারান্তরে হরিভক্তি-প্রস্রবণও বলা যাইতে পারিবে। একাধারে এমন আনন্দ তরঙ্গময় সঙ্গীত আর এখন কোথানে দেখিতে পাও? বঙ্গের সহস্র সহস্র ব্যক্তি এখন যেমন অন্নচিন্তায় আনন্দহীন হইয়া আসিতেছে তেমনি তাহাদের ভিতর সঙ্গীতাদির উৎসাহও ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে। সেই সব পুরাতন যাত্রার সম্প্রদায়ের ভক্তি-প্রবাহ পরিপূরিত সঙ্গীতাদির পরিবর্তে এক্ষণে বিস্তর পল্লীগ্রামেও হুজুগে থিয়েটারেরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বড় বড় পল্লীগ্রামে আবার একাধিক থিয়েটারও আবির্ভূত হইতেছে। অবশ্য যাত্রায় ভক্তিসঙ্গীত বা ভাবুক যাত্রাকর যে এখন একেবারেই নাই তাহা বলিতেছি না,—তবে এমন সব যাত্রার সংখ্যা ক্রমেই অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে। থিয়েটারী হুল্লোড়ই এখন বহু স্থানে দেখা যাইতেছে। তাহাতে তেমন আনন্দ কই? কালপ্রভাবে বঙ্গে সে আনন্দ আর প্রায় দেখিতে পাই না,—সে আনন্দের যাত্রা প্রভৃতিও বিরল হইয়া পড়িতেছে। আর কি বঙ্গে সে আনন্দ-প্রবাহ বহিবে না? নিরানন্দ বাঙ্গালীর বিশুষ্ক বদনমণ্ডল কি আবার আনন্দরস হইয়া উঠিবে না?

সভ্যতা।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

সভ্যতা শব্দের ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক না, আমরা মোটামুটি কতকগুলি সামাজিক আচার ব্যবহার, আদব কায়দা ও নিয়মের সমষ্টিকেই সভ্যতা বলিয়া বোধ করি, এই সভ্যতা মানবের বড় আদর ও গৌরবের বস্তু। যে জাতি এই সভ্যতালোকে বঞ্চিত অন্যান্য সভ্য জাতিগণ তাহাদের অসভ্য, বর্বর প্রভৃতি কতিপয় বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

পরিবর্তনশীল কালের অপ্রতিহত গতিতে সংসারের যাবতীয় বস্তুরই সময়োচিত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, প্রত্যেক বস্তুই যেন তাহার পুরাতনত্ব ছাড়িয়া নূতনত্ব পাইবার আশায় ব্যস্ত হইয়া কালের অনন্ত স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চায়। তাই আমরাও আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কিছু নূতনত্ব দিবার আশায় ব্যস্ত হইয়া কালের অনন্ত স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চাই। তাই আমরাও আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কিছু নূতনত্ব দিবার আশায় পাশ্চাত্য সভ্যতার শরণ লইয়াছি। অনেক সমাজতত্ত্ববিদের মতে আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছি সন্দেহ নাই। টড, হুয়েনসাং,

মিগাস্থিনিস প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় সভ্যতাকে তৎকালীন সভ্যজগতে অতি উচ্চাসনই দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতবাসীর ন্যায় সরল, ধার্মিক, বিদ্বান, সাহসী, বিশ্বাসী, সদালাপী, পরার্থপর ও সংযমী জাতি পৃথিবীতে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসী আর সেই সভ্যতাকে সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। আমরা এখন পুরাতনের স্থলে নূতনকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে, আমরা আসল নকল বাছাই করিতে পারি নাই, তাই গুণ অপেক্ষা অগুণের ভাগ অধিক লইয়াছি, তাই বিদ্যা উপার্জন করিতে আসিয়া অবিদ্যার ঝুড়ি মাথায় লইয়া যাইতেছি। কপটতার সূক্ষ্মাবরণে আপনাকে আচ্ছাদিত রাখিয়া জন সমাজে আপনার প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে শিখিয়াছি।

প্রাচীন সভ্যতা আমাদিগকে ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্বধর্মে অনুরাগ, দেব দ্বিজে ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেয় কিন্তু আর আমরা পুরাতনের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। আমরা নূতন সভ্যতালোক প্রাপ্ত নব্য ভারতবাসী উপরোক্ত গুণরাশিকে কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, নূতন সভ্যতা আমাদের মনের দুর্বলতা দূর করিয়া দিয়াছি। আমরা এখন পরনিন্দায় তৎপর হইয়াছি, সামান্য দুই শত টাকার ক্ষতি করিতে আর অধর্মের ভয়ে আমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে হয় না, হলপ করিয়া মিথ্যা মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ভগবান মন্দ করিবেন এই তুচ্ছ ভয়ে আর আমরা ভীত হইনা, আমরা দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে আমোদ অনুভব করিয়া থাকি! আমরা নির্গুণ ধনবানের কৃপা-কণা পাইবার জন্য মিথ্যা তোষামোদ করিতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা না করিতে পারি এমন কাজ নাই, ধন্য আধুনিক সভ্যতা! তোমার গুণের কথা লোক সমাজে প্রচার করিবার শক্তি আমার নাই। তোমার অলৌকিক শক্তিতে ভারতবাসী অভিভূত হইয়াছে, যে ভারতবাসী প্রাচীন কালে দান, ধর্ম, ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিজ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত সেই ভারতবাসী আজ তোমার প্রভাবে স্বার্থের দাস হইয়াছে। অনেকে বলেন তোমার এখনও সম্পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ ঘটে নাই। সে দিনে না জানি আরও কত দেখিব।

স্বরাজ ও জাতিভেদ।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

আমরা যে স্বরাজ লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই বিষয়টী প্রমাণ করিবার জন্য অনেকে অনেক রকম যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে একটী প্রধান যুক্তি যে ভারতে নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়, বহু ধর্মাবলম্বী ও নানা-ভাষা-ভাষী লোকের বাস, যেখানে এত ধর্মগত ও জাতিগত পার্থক্য বর্তমান, সেখানে কখনও পরাধীন জাতি কি শৃঙ্খল ছেদন করিয়া স্বাধীন হইতে পারে? আর যদি কখনও স্বাধীন হয়, তাহা হইলে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। আজ যদি বিদেশী শাসকেরা আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা পরস্পরের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি

আরম্ভ করিয়া দিব। দেশের শান্তিরক্ষা দুর্ঘট হইয়া পড়িবে! বহুকালের বাঞ্ছিত সাধের স্বাধীনতার অমল ধবল বস্ত্র গৃহবিবাদের শোণিতপাতে অলক্ত-রঞ্জিত হইবে। এই অভিশপ্ত জাতির আর কোনও উপায় নাই—ইহাকে চির-কালই বিদেশী বিজেতার পক্ষপুটের সুশীতল ছায়ায় পরম সুখে থাকিতেই হইবে। যত দিন ভারতের সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া একটী জাতিতে পরিণত না হয় ততদিন ভারতের স্বরাজ লাভের আর কোনও আশা নাই।

এ সকল বিজ্ঞের দল যখন এই সমস্ত অদ্ভুত হাস্যকর যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন, তখন যে তাঁহারা তাঁহাদের কথা বেশ ওজন করিয়া বলেন তাহা বোধ হয় না। ভারত ছাড়া এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে বহুভাষার ও বহু ধর্মমতের প্রচলন আছে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ঐসব দেশ স্বাধীন।

আমেরিকার লোক সংখ্যা ভারতের এক তৃতীয়াংশ। সেখানে ৭৩টী বিভিন্ন ভাষার প্রচলন আছে এবং প্রায় ৬৫টী জাতির বাস আছে। কেবল সিকাগো সহরের একটীমাত্র পল্লীতেই ৪০ রকম ভাষায় বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসীর মনোভাব প্রকাশ করে। জাতি ও ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমেরিকা আজ স্বাধীনতার লীলাভূমি, সভ্যজাতির আদর্শস্থানীয়, পরাক্রমে জাতি সঙ্ঘের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। যদি সাম্প্রদায়িক ও ভাষাগত বিভিন্নতাই স্বাধীনতা লাভের পরিপন্থী, তবে কোন্ অজ্ঞাত মন্ত্রশক্তি বলে আমেরিকা আজ জাতিসঙ্ঘের উচ্চ-শীর্ষে দণ্ডায়মান?

সুইজারল্যাণ্ড আদর্শ গণতন্ত্র। এই দেশ বিস্তারে বাঙ্গলার একটী জেলার সমান হইবে। লোক সংখ্যা লণ্ডনের চেয়েও কম। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটীতেও—ফরাসী, জার্মান্, ইতালীয় ও রুমানিয়—এই চারিটী ভাষা প্রচলিত। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেও আত্মরক্ষার জন্য তো কই বিদেশী বঁধুয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে না। তাহারাই তাহাদের দেশ শাসন করে—দেশের শান্তি নিজেরাই রক্ষা করে। মাতৃভূমিকে বিদেশীয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

গ্রেট ব্রিটেন—স্বাধীনতার জন্মভূমি—জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি। সেখানে কি একটী ভাষা প্রচলিত? ভাষায়, আচার-ব্যবহারে, চাল-চলনে—ইংরাজ, স্কচ্, ওয়েলস্ ও আইরিশদিগের মধ্যে সৌসাদৃশ্য নাই, তবুও তো গ্রেট ব্রিটেন নিজের দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া অর্দ্ধজগতকে নিজের পতাকাতলে আনিতে সক্ষম হইয়াছে।

রাশিয়া—যে রাশিয়ার নামে আজ জগতের ধনীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে—সেই রাশিয়ায় কি একটী জাতির বাস? অসংখ্য জাতির বাস ও অসংখ্য ভাষার প্রচলন সত্ত্বেও জগতের মধ্যে রাশিয়াই কেবল ধনসমতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে—সেই কেবল ধনীপীড়িত বসুন্ধরার মুক্তির জন্য অগ্রসর হইয়াছে। তাহার পন্থা হয় তো সর্বজনানুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু সে যে যথেচ্ছাচারকে উৎখাত করিয়া প্রকৃত সাম্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে তাহা প্রত্যেক পীড়িত জাতিই স্বীকার করিবে।

জাতি বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও স্বরাজ লাভ করিতে পারে, যদি জাতির চরিত্র থাকে—যদি তাহার নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া না যায়—যদি স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে। কেবল লম্বা

লম্বা বক্তৃতা দিবার ও বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার প্রবৃত্তি থাকিলেই স্বরাজ লাভ করা যায় না। স্বাধীনতার মূল্য—আত্মদান। আবার সেই আত্মদান শ্রীরাম-চরণে বিভীষণের আত্মদানের মত যেন না হয়।

সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

পৃথিবীর এক একটা দেশ এবং জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যায় সেই দেশের যুবক সঙ্ঘ এবং তরুণের দল। যে জাতির তরুণ সম্প্রদায় জাগে নাই কিম্বা জাগিয়াও বুদ্ধির দোষে বিপথে বিচরণ করিতে অগ্রসর হয় সেই জাতির দুর্গতির আর অবধি থাকে না।

আজ বাংলাদেশ জাগে নাই একথা বলিতে পারিনা, বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ভিতরে জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায় নাই এ কথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যে তরুণের প্রচণ্ড শক্তি বিকাশ লক্ষ্য করিয়া দেশ-বাসী আশার পুলকে নাচিয়া উঠিবে সেই তরুণের শক্তি সামর্থ্যের অপব্যবহার দেখিয়া আজ দেশবাসীর মন নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে তরুণ দল আজ একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। মানিয়া লইলাম যে দেশে আজ তেমন উপযুক্ত নেতার অভাব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই তরুণ দল সে পথে নিজেদের শক্তি বিকাশের উপযুক্ত পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহারা আজ যেভাবে শক্তির অপচয় করিতেছে —যে ভাবে তাহারা পাণ্ডিত্যের বড়াই এবং আত্মম্ভরিতার আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে ভাবিলে বাস্তবিকই দুঃখে অনুশোচনায় হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে আজকাল একদল তরুণের আমদানী হইয়াছে। তাহাদের লেখা পড়িয়া বাস্তবিকই মনে হয় যে ভাষার উপর তাহাদের রীতমত দখল আছে কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে তাহাদের ভিতর জনকয়েক তরুণ সাহিত্যিক আজ পাশ্চাত্যের হুবহু নকল করিতে যাইয়া এমন অশ্লীল কুরুচি-পূর্ণ গল্পের আমদানী করিয়া দেশবাসীকে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তাহা বাস্তবিকই অমার্জনীয়। আমরা কিছুতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিনা যে ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভদ্র সমাজে বাস করিয়া, ভদ্রশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরে থাকিয়া শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া উহারা কেমন করিয়া এমন নির্লজ্জ ইতরতার পরিচয় দিতে পারিতেছে? ইহাদের পিতামাতা নাই? ভ্রাতা ভগিনী নাই? পণ্যের দরে দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা সমাজে যাহাদের একমাত্র ব্যবসায়, তাহাদেরও হয়ত যতটুকু চক্ষুলজ্জা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আজ এই আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদলের নিতান্ত ঘৃণিত, কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ গল্প লেখার দুঃসাহস দেখিয়া মনে হয় যেন তাহাদের ভিতর সেটুকুর অস্তিত্বও নাই।

কয়েকজন তরুণ লেখকের ধারণা হয়তো এই যে নরনারীর যৌন সম্বন্ধের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারিলেই সে লেখা বস্তু তান্ত্রিক হইল কিন্তু এই সব তরল সাহিত্যে যাহারা বস্তু তন্ত্রের দোহাই দিয়া ইন্দ্রিয় বিকারের বীভৎস দৃশ্য উলঙ্গ করিয়া দেখাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না, তাহারা যে

নিজেদের কলুষিত জঘন্য চরিত্রেরই পরিচয় দিয়া থাকে তাহা তাহাদেরই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে না।

রুচিবাগীশের দল অবশ্য বলিয়া থাকেন, যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রই আজ বাংলা সাহিত্য কলুষিত করিবার অগ্রদূত। আমরা সেই রুচিবাগীশদের কৃপার চক্ষেই দেখিয়া থাকি। তাঁহাদের নজর ছোট মন সংকীর্ণ—তাই তাহারা অন্তরের দিক লক্ষ্য করিয়া বিচার করিবার ধৈর্য্য রাখিতে পারেন না, দেহের মিলন ঘটিবার আভাস মাত্র দেখিয়াই তাঁহারা নাক সিঁটকাইয়া গলদ-ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রেম যে কত বড়, কত মহীয়ান, মানব মনের পরিসর যে কত বিস্তৃত, অতি সাধারণ বাসনা কামনার সীমা রেখা অতিক্রম করিয়াও যে প্রেম কোন অফুরন্ত অনন্তের পানে আপনার মাহাত্ম্য বিকাশ করিয়া চলিয়া যায় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। একথা আজ যে অস্বীকার করে সে হয় মূর্খ, না হয় বিকৃত মস্তিষ্ক।

কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল অকালপক্ক তরুণ লেখক আজ শরৎ রবীন্দ্রের অনুকরণ করিতেছে বলিয়া মনে মনে গর্বানুভব করে এবং অহরহ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার কলুষিত আবর্জনায় ভরপুর করিয়া তুলিতেছে তাহাদের অসংযত লেখনী আজ সংযত করিয়া দিবার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শুধু সমালোচনায় নয়, শুধু তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়া নয়, ঐ সকল ইতর সাহিত্যস্রষ্টাদের শুধু ভাষার কশাঘাতে সাময়িক পত্র ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলেই চলিবে না। বাছিয়া বাছিয়া উহাদের ধরিয়া আনিয়া, জনসাধারণের পক্ষ হইতে সমগ্র জাতির কল্যাণহেতু প্রশস্ত রাজপথের চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া তাহাদের পশ্চাৎভাগে চাবুক লাগাইয়া রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিতে হইবে—তবে যদি সায়েস্তা হয়—তবে যদি তাহাদের আক্কেল হয়। যেমন ব্যাধি তার তেমনি ঔষধের ব্যবস্থা করা চাই নতুবা বাঙ্গালীর আশা নাই—বাংলা ভাষার অশেষ দুর্গতি অনিবার্য্য।

যে স্বেচ্ছাচারী শয়তানের দল আজ বাণীর শ্বেত পদ্মবনে প্রবেশ করিয়া উচ্ছৃংখলতার চূড়ান্ত করিয়া বেড়াইতেছে—হে ভগবান! তুমি তাহাদের মস্তক আজ বজ্রাঘাতে চূর্ণ করিয়া দাও।

সাপ্তাহিক সাহিত্য।

১৩৩৭ সাল ১৭শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

বর্তমান-সাহিত্য জিনিষটা যে কি তাহা বুঝিলাম না। বিশেষতঃ বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখপত্রগুলি দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমাদের মত অসাহিত্যিকের পক্ষে বিড়ম্বনা।

এক একখানি মাসিকে ভাষার অনেক প্রকার কেরামতি উঠিয়াছে। ভাবের নানা প্রকার বিস্ফোরক তৈয়ারী হইয়াছে। ছবির কথা--তাহা না বলিলেও চলে।

সে একদিন ছিল যখন সাহিত্যে সমাজ উঠিত বসিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কবিকঙ্কণের চণ্ডী. নীলকণ্ঠ, দাশু রায়, নিধুবাবু, মধু কান, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের কবিতায় ও গানে যে সাহিত্য সৃষ্ট

হইয়াছিল তাহা আজ নাই। ইঁহাদের অনেক কাল পরে আসিলেন বিদ্যাসাগর। পুরাতন মালঞ্চে বেল-জুই-চামেলী, জবা-চম্পক-করবীর সঙ্গে তিনি রোপণ করিলেন বিদেশী ফুলের চারা গাছ। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি তাহাতে জলসেচন করিলেন, ফুল ফুটাইলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের সৃষ্ট মালঞ্চে কীট প্রবেশ করিল। স্বদেশী কীটের উৎপাতেই লোকে অতিষ্ঠ, ইহার উপর আসিল বিদেশী কীট। ইহার আমদানী করিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিলাতী প্রেমের কীটে বাঙ্গালা সাহিত্য ভরিয়া গেল। যাহা বাকী ছিল তাহার পূরণ করিলেন শরৎচন্দ্র। ভারতী ইহা দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়াছিলেন কিনা তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

বর্তমান সাহিত্য রিরংসা বা প্রেমকীটময়। সাহিত্য অর্থে যদি কামকে রঞ্জিত করাই বুঝায়, দিকে দিকে রিরংসার আবহাওয়ার সৃষ্টিই বুঝায়, তবে সে সাহিত্য জাহান্নমে যাউক। অনুরাগ বা লভ্ (Love)—গুপ্ত প্রণয়কে পবিত্রতার আবরণ দিবার চেষ্টা আধুনিক সাহিত্যে খুবই হইতেছে। নায়িকাকে ভালবাসিয়া কি কি করিলাম তাহার জন্য অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্ট হয়। ভালবাসিতাম এখন সে বহু দূরে ; তাহার গমনকালে কোন কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হইত তাহার বর্ণনায় মানুষের এমন একটী প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা হয়, যাহা সাহিত্যের পবিত্র কর্তব্যের গণ্ডীর বাহিরে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি লোকের উন্নতি কামনা হয় তবে বর্তমান মাসিক সাহিত্যের তাহাও ভুল। মাসিক আটআনা খরচ করিয়া কয়জন মাসিক কিনিয়া সাহিত্যগুলি ঘরে রাখিতে পারে? মাসিকগুলির দাম কম হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যে দেশকাল। যদি বলেন দামে কুলায় না, বেশী কাগজ দিতে হয়, তবে উত্তর নাই। লোকহিতকর কয়টী প্রবন্ধ বাহির হয়? কবিতাগুলির অর্থ নাই। যাঁহারা ভাল লিখিতে পারেন, তাঁহারা একটী পদে ভাব দিলেন ত ভাষা দিলেন না ; একটী মাত্র নূতন কথা দিলেন ত ভাবের নিতান্ত অভাব রাখিয়া দিলেন। গল্পই ত সব কিন্তু পড়িতে ধৈর্য্য থাকে না, এই যা! উপন্যাস—যাহার সম্পূর্ণ মূল্য আট আনা মাসিকে তাহা পড়িতে যাইয়া দাম পড়িল ৬ টাকা। কবিতাগুলি কিছু কমাইতে পারিল না, গল্পগুলি কিছুমাত্র দাম কমাইল। প্রবন্ধগুলি—অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য নয়—সুতরাং দাম কমিল না। সুতরাং কম করিল সংযুক্ত ছবিগুলি।

আজকাল ছবিগুলিও সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার যদি ছবির অঙ্গ বিশেষে আর্ট ফুটিয়া উঠিল ত কথাই নাই। মডার্ণ মাসিকে প্রথমে যিনি ছবির আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তিনি কি এতদূর হইবে—ভাবিয়াছিলেন? এই ছবিগুলি যদি সাহিত্যের অঙ্গ—তবে কাহাদের জন্য ঐগুলি অঙ্কিত হয়? যদি অঙ্গ নয়, তবে তাহারা প্যারিস পিকচারের এল্বাম সৃষ্ট করুক। সাহিত্যের অঙ্গে ভর করিয়া এরূপ বীভৎসতা ছড়াইবার প্রয়োজন কি?

মাসিকে সাহিত্য চলিতেছে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া। ইহা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে সাহিত্য মরিতে বসিয়াছে। লেখকেরা প্রায় সকলেই নাম কিনিবার জন্য ব্যস্ত। আর এক দোষ মাসিকের সম্পাদকগণের। তাঁহারা কেহই নিজ নিজ পত্রিকায় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত নহেন।

সাহিত্যের ভাষা এখন কথার মত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি

সাহিত্যের ভাষা বুকের ব্যথার মত ! পুরলক্ষ্মীদের তাহা হিষ্টিরিয়া ; প্রবীণদের তাহা শ্বাসকাস। কথায় সাহিত্য কতটুকু আত্মপ্রকাশ করে ? কয়শত কথা প্রত্যেক মানুষে ব্যবহার করিতে পারে—খুব সীমাবদ্ধ সাধারণ কথা যাহাতে মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং বড় ভাব বুঝাইতে হইলে কথা আপনি জড়াইয়া আসে। যেরূপ "মলয়জ শীতল" এ কথাটি চলিত কথায় কিরূপ হইবে ? হয়ত বলিবে 'মলয় যে শীতলতাকে জন্ম দিয়েচে তারই চরশচয়।' কিংবা অন্য কিছু ; 'হয়ত বা এমন কিছু দিয়া বুঝাইবে আমরা তা কল্পনাও করিতে পারিব না। এইরূপ চলিত কথায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি ভাষাকে বড় করা ? একই বঙ্গভাষা, তাহাতে আবার চলিত কথার সাহিত্য আমদানি করিয়া দলাদলি বাঁধিল কেন ?

সাহিত্যের মুখপত্রগুলি দাম একটু কমাইলে এবং স্বাস্থ্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করিলে সমাজের এবং সাহিত্যের উন্নতি হয়। আর একটি বিষয় আছে, সেদিকে সাহিত্যিকগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাহার নাম সাপ্তাহিক সাহিত্য।

সাপ্তাহিক সাহিত্য, আমাদের আর একটি অবলম্বন যাহাতে ভর করিয়া সাহিত্য প্রভাবশালী হইতে পারে।

দাম এক পয়সা। প্রতি সপ্তাহই যদি আধুনিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মধুর স্পর্শে পুষ্পিত হয়—সাধারণে সে আনন্দ অল্প আয়াসেই ভোগ করিতে পারেন। মাসে চারি পয়সা, বৎসরে বার আনা। বুঝিলাম, হয়ত কয়টী গল্প প্রবন্ধ থাকিবে ? বেশী থাকিবার প্রয়োজনই বা কি ? দুটি একটি থাকিলেই হইল। তাহার চেষ্টা না থাকিয়া হইতেছে বেতার আসরের সমালোচনা, থিয়েটারওয়ালাদের বিজ্ঞাপনের অনুকূল্যে বড় বড় তৈল ব্যবসায়ীকে ফেল মারাইবার নামান্তর সমালোচনা ! গালাগালি, কামড়াকামড়িতে সাপ্তাহিক ভর্তি।

হয়ত হইতে পারে কেহ বেতার-বৈঠক-থিয়েটার লইয়া থাকিবেন। কেহ সমাজ লইয়া থাকিবেন। কেহ রাজনীতি, অর্থনীতি লইয়া থাকিবেন। কিন্তু সাহিত্য লইয়া থাকিলেই বা মন্দ হয় কি ?

সাপ্তাহিক সাহিত্যে যদি কোনও দিন পড়িবার মত কিছু থাকে, যদি সাধারণে সাপ্তাহিকে পড়িবার মত কিছু কোনও দিন পায়, সেই দিনই সাহিত্য আবার উঠিবে। এ সম্বন্ধে সাপ্তাহিক সম্পাদকগণ পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ বাদ দিয়া একটু চেষ্টা করিবেন কি ? সাপ্তাহিকে দাম পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু চেষ্টা করিলে সাপ্তাহিকই আদরণীয় হইতে পারে। সাপ্তাহিক সম্পাদকগণ চেষ্টা করিল কি বর্তমান সাহিত্যকে এই নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারেন না ? মাসিক অপেক্ষা সাপ্তাহিক অনেক বেশী স্থায়ী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে।

নিজের সাহিত্য, নিজের ভাষা, যাহা না হইলে মনের কথা বলিতে পারি না, প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারি না, ব্যথা পাইলে কাঁদিতে পারি না, তাহাকে ভাল করিয়া সাজাইতে কাহার না সাধ হয় ? কে ভাল করিয়া হাসিতে চাহে না ? জগতে কে শোকাতুর—ভাল করিয়া কাঁদিতে চাহে না ?

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করুক। বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষপুটেই নিজেকে বসাইয়া বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি করিতে থাকুক।

অন্যান্য কবিতা

পল্লীবাসী কবির ক্ষুদ্র কবিতা।

১৩২২ সাল ১লা আষাঢ় ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা
৬ই জুন ১৯১৫।

কেন এত ভালবাসি, তোমারও মধুর হাসি।
ভাবি তাই দিবানিশি, বসিয়া বিরলে গো॥
আমার এ হৃদি মাঝে, জানি না গো কেন বাজে।
তোমার ও মধুর স্মৃতি আকুলিয়া প্রাণ গো॥
সদা প্রাণ তোর (ই) ভাবে, চায় শুধুর থাকি ডুবে।
কি জানি কিসের তরে, ভাবিয়া না পাই গো॥
পুরিবে কি সব আশা, মিটিবে কি সব তৃষ্ণা।
সংসারের সার যত, তোমারে পাইলে গো॥

কি হলে পাইব তোমা
বলে দাও আমারে,
দেখাও করুণা-আলো
মরি যে গো আঁধারে।
কোথা গেলে পাব তোমা
কোন দূর দেশেতে,
যেতে কি পারিব সেথা
ক্ষুদ্র এই শক্তিতে।
যদি নাহি পারি যেতে
দেখা নাহি পাই হে,
মনে রেখ সেইদিন
প্রাণ যবে যাবে হে।

আমার আমার করি ক্ষুদ্র এই সংসার।
ভাবি নাই তব নাম দিনান্তেও একবার॥
কেটেছে মোহের ঘোর এবে দেখি অন্ধকার।
পাথারে ডুবিল তরি মিলিল না কর্ণধার॥

আর কেন মন আশার আশে
মিছে ভাবনা ভাবছ বসে?
ভাবতে যদি থাকতে সময়
মরতে না এই হা হুতাশে।

এখন যা হবার তা হয়ে গেল
কাজ কি গো আর হেথা বসে,
প্রাণ ভরে মন বল হরি
ঘুরে বেড়াও দেশ বিদেশে।

দয়াল হরি করলে দয়া
কেটে যাবে তোর মোহ মায়া।
নামিয়ে তখন পাপের বোঝা
হাতের পাঁচ নিয়ে পড়বি খসে।

পশ্চিম দেশীয় কবি-বচন-সুধাবলী।

১৩২২ সাল ১৫ই আষাঢ় ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা
ইং ৩০শে জুন ১৯১৫।

বালু জৈসী করককরী উজ্জ্বল জৈসী ধূপ,
ঐসী মিঠি কুছ নেহি, জৈসীমিঠি চুপ।

অস্যার্থ

করকরে পদার্থের মধ্যে যেমন বালুকা ও উজ্জ্বল পদার্থের মধ্যে যেমন রৌদ্র, তেমনি মিষ্ট পদার্থের মধ্যে চুপ করিয়া থাকার মত আর কিছুই নাই।

দুর্বলকো ন সন্তাইয়ে তাকো হরি সহায়।
পাওন পত্তন ছোড় ছাড় ফেকে ক্ষুদ্র তৃণ বাঁচি যায়।

অস্যার্থ

দুর্বল লোককে পীড়ন করিও না। ভগবান তাঁহাদিগের রক্ষাকর্তা। দেখ পবন বড় বড় বৃক্ষকেই পতিত করে কিন্তু ক্ষুদ্র তৃণের কিছুই করিতে পারে না।

তুলসী হায়! গরীবকী হরিসে সহা না যায়,
মুয়ে চামকী ফুঁকতে লোহা ভসম হো যায়।

অস্যার্থ

তুলসীদাস বলিতেছেন যে, গরীবের হায়! নিশ্বাস ভগবানের নিকটও অসহ্য। তাহার দৃষ্টান্ত—মৃত চর্মনির্মিত হাপরের নিশ্বাসে লৌহের মত কঠিন পদার্থও ভস্মে পরিণত হইয়া থাকে।

পশ্চিম দেশীয় কবি-বচন-সুধাবলী।

১৩২২ সাল ২২শে আষাঢ় ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা
ইং ৭ই জুলাই ১৯১৫।

সাধু ভয়া ত কা মালা পহরী চার।
বাহার ভেক বনায়া ভিতর ভরী ভণ্ডার॥

অস্যার্থ

সাধু হইয়াছ, চারি প্রহর ধরিয়া মালা জপিতেছ, বাহিরে বেশ সাধুর বেশ ধরিয়াছ, কিন্তু ভিতর বড়ই ভয়ানক।

মালা জপে শালা, আউর কর জপে ভাই।
যো আপনা মন মন জপে উসকো বলিহারি যাই॥

অস্যার্থ

যে লোক দেখাইয়া মালা জপে আমি তাহাকে শ্যালক বলিয়া গণ্য করি, যে কর জপে উহাকে ভাই বলি, আর যে কেবল মনে মনে ভগবানকে ভজিয়া থাকে তাহার প্রশংসা করি।

সুজন কো দুখ দেকে দুর্জন পুরে আশ।
চন্দনকো খিস্‌নেসে দেত্‌ রহে সুবাস॥

অস্যার্থ

সাধুকে কষ্ট দিয়া দুর্জন লোকের আশা পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত চন্দনকে ঘর্ষণ করিলে সে সুগন্ধ প্রদান করিয়া থাকে।

হরি হরি সব কোই কহে ঠগ, ঠাকুরা, চোর।
ভক্তি আউর প্রেম বিনু না মিলে নন্দকিশোর॥

অস্যার্থ

ঠগ, ঠাকুর ও চোর সকলেই আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হরি হরি বলিয়া থাকে, কিন্তু কেহই ভক্তি ও প্রেম বিনা ভগবানকে প্রাপ্ত হয় না।

নোকরী-ওয়ালা।

চানা-ওয়ালার সুরে।

১৩২২ সাল ৫ই শ্রাবণ ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা
ইং ২১শে জুলাই ১৯১৫।

নোকরী জোর গরম—
পিয়ারে নোকর দৌড় দৌড়কে আও।

নোকরকো জুত্তীমে ডলে, তকি নোকর হুজুর বলে,
নোকর লোক্‌ কো মনয়া ডোলে,
তব্‌ কোমরসে রুপেয়া খোলে,
নোকরী জোর গরম॥

মেরা নোকরী হায় আসমানী, ইসমে কুছ নাহি হয়রানি,
যেৎনা সাকো কর বেইমানী, তেরা চল্‌ যাগা গুজরানী,
আখের গিরেগা আঁখমে পানি,
নোকরী জোর গরম॥

দে দে দো চারশও সেলামী, তৌরি মিল যাগা গোলামী,
শিখলা দেঙ্গে নিমকহারামী, যো রোজ আয়েগা সালতামামী
সো রোজ দেখ মৌরি পাগলামী
নোকরী জোর গরম॥

মেরী নোকরীকা পরভাব, তোমকো বানা দেগা নবাব,
খাওগে পোলাও আর কাবাব, বরষ বাদ হোগা জবাব,
ঐইস্যা হ্যায় মেরি স্বভাব,
নোকরী জোর গরম ॥

নোকরীমে কুছ নাহি হ্যায় জ্বালা, সুখী রহেগা লেড়কা বালা,
মিল্ যায়েগা শাল দুশালা, ঘিও ভাত খাওগে ভর ভর থালা,
বা কি হাম কহেগা শালা,
নোকরী জোর গরম ॥

আগারী লিখ্ দে কবুলতি, শিরমে লাগা দেউঙ্গা জত্তি,
দেখো মেরি কসরৎ কুস্তি, বেচনে হোগা জমিন বস্তি,
যব নেই চলেগা মেরি কিস্তি,
নোকরী জোর গরম ॥
নোকরী ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ গুপ্ চুপ্ ॥

পশ্চিম দেশীয় কবি-বচন-সুধাবলী।

১৩২২ সাল ১২ই শ্রাবণ ২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা
ইং ৩০শে জুলাই ১৯১৫।

বিনা বিচারে যো করে সো পাছে পছতায়।
কাম বিগারে আপনা জগমে হোত হাঁসায়।
জগমে হোয় হাঁসায় চিতমে চৈন না আবে।
ধান পান সম্মান রাগ রঙ্গ মনহি না ভাবে।
কহ গিরধর কবিরায় শুন মেরি পেয়ারে।
খটকতু হৈ জিয় মাহি যো কিয় বিনা বিচারে।

অস্যার্থ

বিনা বিচারে যে কার্য্য করে তাহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হয়। নিজের কার্য্য ক্ষতি করে আর লোকে হাসে, লোকের হাস্যস্পদ হইয়া পান, ভোজন ও আমোদ প্রমোদ কিছুই ভালো লাগে না। এইজন্য কবিবর গিরিধর বলিতেছেন বিনা বিচারে কার্য্য করিলে জীবনে কখনও সুখ পাওয়া যায় না।

কেঁও কিজে এইসি যতন
যাতে কাজ না হোয়।
পর্বত পর খোদে কুঁয়া কৈসে
নিকসে তোয়।

অস্যার্থ

যে কার্য্যে ফল পাওয়া অসম্ভব তাহার অনুষ্ঠান করা বৃথা। পর্বতের উপর কূপ খনন করিলে কি প্রকারে জল পাওয়া যাইবে।

ভলি করত লাগে বিলম বিলম্ব ন
বন্ধুরে বিচার।
ভবন বানাওত দিন লাগে ঢাহত
লাগে ন বার॥

অস্যার্থ

সৎ কার্য্য করিতে বিলম্ব হয় কিন্তু অসৎ কর্ম সহজেই করা যায়। একটি বাটি নির্মাণ করিতে সময় লাগে কিন্তু উহা পোড়াইতে সময় লাগে না।

সাঁচে শাপ ন লাগে সাঁচে কাল ন খায়
সাঁচকো সাঁচা মিলে সাঁচে মাহি সমাই।

অস্যার্থ

সত্য কার্য্যে অভিশাপ লাগে না। সত্য বলিলে যম দণ্ড হয় না। সত্য কথা বলিলে সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্যের পরিণামও সত্যই হয়।

পশ্চিম দেশীয় কবি-বচন-সুধাবলী।

১৩২২ সাল ১৫ই অগ্রহায়ণ ২য় বর্ষ ২৭শ সংখ্যা
১লা ডিসেম্বর ১৯১৫।

(১)

প্রিয়বর ? প্রথম নত শীশ হা শ্রীকৃষ্ণ কী জয় বোলদো।
ফির উস প্রতিধ্বনি কে লিয়ে শ্রুতিদ্বার অপনে খোলদো॥
উস প্রেম পথ কে পান্থকা বহ দিব্যরূপ নিহারলো।
নিশ্রান্ত নির্মল মূর্তিকো সাদর হৃদয় মে ধারলো॥

(২)

ফির দেখলো ঝাঁকি কহো কৈসা মনোহর দৃশ্য হৈ।
সোচো কি ইসমে ছিপরহা কিতনা বিচিত্র রহস্য হৈ॥
বহ পোপ লীলা হৈ লাহী হৈ আপ জিসমে ভুলতে।
উন ভাবুকোঁ কে হৃদয়মে ভগবান সচমুচ ঝুলতে॥

(৩)

সহৃদয় বনো, চাহক বনো, নেহীবনো, প্রেমীবনো।
নিঃস্বার্থ হো, নিস্পক্ষ হোকর ন্যায়কে নেমীবনো॥
ফিরভাব সত্যাসত্য কা মনকী তুলাসে তোলদো।
পাখণ্ড পরদা খোলদো শ্রীকৃষ্ণ কী জয় বোলদো॥

আকাশের চাঁদ ও আমার চাঁদ।

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

কি হাসি হাসিছ কলঙ্কী চন্দ্র!
উঠিয়া উর্দ্ধ গগনে।
অকলঙ্ক চন্দ্র ছিল মোর ঘরে,
পোড়ায়ে ফেলেছি আগুনে।

বরনি আজিও সে চাঁদ আমার
ষোড়শ কলার পূর্ণ।
অকালে গ্রাসিল কালরাহু তারে
অহঙ্কার করি চূর্ণ॥

অমাবস্যাগতে দ্বিতীয়ার দিনে
উঠ তুমি পুনঃ আকাশে
আবার সে চাঁদ উঠিবে কি আর
আলো করি মোর আব সে?

অমানিসা মোর ঘুচিবে না আর
আসিবে না আর দ্বিতীয়া।
আঁধারে থাকিয়া কাটিবে জীবন
নয়নের নীরে তিতিয়া।

সে চাঁদ আমার কহিত যে কথা
কথাগুলি বড় মধুময়।
তারে হারাইয়ে আজও বেঁচে আছি—
উঃ! মানুষের প্রাণে কত সয়!

এই মহা শোক নূতন আমার
আর কভু আমি সহিনি।
ধৈর্য্য ধ'রে ভাবি কাঁদিবনা আর—
(কিন্তু) কাঁদিয়া কাঁদায় গৃহিণী॥

পুরুষ আমরা চেপে রাখি সব
হৃদয়ে পাষাণ বাঁধিয়া।
অবোধ রমণী প্রবোধ মানে না
বুঝাব তাহারে কি দিয়া?

দাঁড়াও হে চাঁদ! যেও না চলিয়া
অভাগারে দেখি হাসিযা
বলিতে কি পার? আমার সে চাঁদ
কোথায় গিয়াছে মিশিয়া?

স্বরগেতে যদি দেখা পাও তার
জিজ্ঞাসা করিও একথা।
কি দোষ পাইয়া ছেড়ে গেল মোরে
কেমনে তুলিল মমতা?

আর এক কথা, বল চন্দ্র দেব!
পার যদি তুমি কহিতে—
কত দিন প'রে আমরা সকলে
মিলিব তাহার সহিতে?

সাবাস্ হিন্দু।

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা

গালে হাত দিয়া কাঁদিছে বিধবা
বসিয়া ভগ্ন কুটীরে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুঝিবা অন্ধ
হইল নয়ন দুটীরে॥

একেত ভাবিছে দিবস রজনী
পেটের ভাতের জন্যে।
তাহার উপরে আছে গৃহে এক
অরক্ষণীয়া কন্যে॥

সে চাহিয়া আছে সমাজের পানে,
সমাজ তাহারে চায়না।
এ সংসার মাঝে তার দুঃখে দুঃখী
খুঁজিয়া কাহারে পায় না॥

আত্মীয় স্বজন স্বজাতি কুটুম্ব
সকলের কাছে গিয়েছে।
"টাকা কিছু আন বিয়ে দিয়ে দেব"
সবে এই মত দিয়েছে॥

পুঁজি মাত্র তার ভাঙ্গা ঘর খানি,
কাটা খানেক এই ভিটে।
তারে "টাকা কিছু নিয়ে এসো" বলা
কাটা ঘায়ে নুন ছিটে॥

বল দেখি এর উপায় কি হবে
সমাজের যত নেতা?
দেখাও তোমরা সভায় দাঁড়ায়ে
বক্তৃতার খুব কেতা!

গলা বাজি আর হাত নেড়ে বলা
হতেছে সকল ব্যর্থ।
তোমাদের মত নেতারাও চান
বেটার বিয়ের অর্থ॥

বেটা বেচা এই ধনের লালসা
তোমাদেরও আর যাবে না

ধনী লোকে পাবে তোমাদের কৃপা
কাঙ্গালে বুঝি তা পাবে না?
মাংস বেচা যত কশাইয়ের দল
দয়া নাই এক বিন্দু
সাবাস্ সাবাস্ হিন্দু সমাজ!
সাবাস্ সাবাস্ হিন্দু ॥

ব্রাহ্মণের চার হাজারের তোড়া

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা

আমার মত কুলীন বামুন
নাই ফুলিয়া মেলে।
কন্যা নাই; সতীশ নামে
একটি মাত্র ছেলে ॥

গত বছর বাছা আমার
পাশ করেছে এম. এ,
ভাবলাম বিয়ে দিব না তার
চার হাজারের কমে ॥

কুলে শীলে বড় আমি,
কিন্তু অর্থ নাই।
সেই কারণে ছিল আমার,
অত টাকার খাঁই ॥

এম, এ, বৃত্তি পে'য়ে সতীশ
পড়েছিল বি, এ,।
এম, এ,র বেলায় পড়ায়েছি
নিজের খরচ দিয়ে ॥

কল্‌কাতাতে পড়্‌ত সতীশ
খরচ দিতে তার।
দুই বছরে হয়েছিল
হাজার টাকা ধার ॥

চার হাজারের হাজার গেলে,
রইবে হাজার তিন।
সেই টাকাতে বিষয় কিনে
ফিরিয়ে নিব দিন ॥

কত শত মেয়ের বাবা
এলো আমার ঘরে।
গণে বর্ণে মিল্‌লো,
কিন্তু বন্‌লো নাক দরে ॥

ফিরে গেল কত বামুন
হইয়া হতাশ।
যাবার সময় ফাঁস্ ক'রে
ফেলিল নিশ্বাস ॥
নিশ্বাসে নিশ্বাসে আমার
কপাল গেল পুড়ে।
রোগে ভুগে ধরাস ক'রে
সতীশ গেল ম'রে ॥

অনুতপ্ত সন্তান ও মুমূর্ষু জননী।

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা

কুপুত্র সদাই হয়।
কুমাতা কখন নয় ॥

(পুত্র)

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার !
এতদিন চিনিতে মা, পারিনি তোমারে।
অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি দুরাচার,
পেয়েছ কতই কষ্ট মোর ব্যবহারে !

(মাতা)

বৃথা দুঃখ করিও না ওরে বাছা ধন !
বেঁচে থাক তুমি মোর চিরজীবী হ'য়ে।
বারেক হেরিয়া তোর ও চাঁদ বদন,
জীবনের যত কষ্ট যেতাম ভুলিয়ে।

(পুত্র)

উচ্চ শিক্ষা লাভ তব ভিক্ষা-লব্ধ-ধনে,
চাকুরীতে বহু অর্থ করেছি অর্জন
সে অর্থ করেছি ব্যয় বিলাস ব্যসনে
পাও নাই তুমি মাগো অশন বসন !

(মাতা)

দুঃখ করিও না বাছা অতীত স্মরিয়া ;
যা খেয়েছি যা পরেছি তোমারি সকলি।
মরণে পাইনু সুখ তোমারে হেরিয়া
মা বলিয়া ডেকে, মুখে দিলে জলাঞ্জলি

(পুত্র)

হবিশূন্য হবিষ্যান্ন অপরাহ্ণ কালে
খাইতে মা কত কষ্ট হ'য়েছে তোমার !
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খেয়েছি সকালে।
মাতৃ-সেবা অপরাধে কি হবে আমার ?

(মাতা)

ষাট্ ষাট্, নাহি তোর কোন অপরাধ ;
যদি কিছু থাকে তাহা করেছ অজ্ঞানে
দুধে ঘিয়ে খাও বৎস,—করি আশীর্বাদ,
তৃপ্ত ক'রো মোরে বাপ, জলপিণ্ড দানে।

(পুত্র)

এইরূপ আধুনিক হিন্দুর তনয়
ঠিক বলিয়াছ মাগো ! স্বভাব হেরিয়া—
মা বাপের সেবা হেতু করিবে না ব্যয়,
ম'রে গেলে করে কিন্তু বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া।

চাষার খেদ।

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা

শুন্‌রে মামু ! কাল গেছিনু
জমিদারের বাড়ী।
কাছারীতে ব'সে বাবু
মস্ত বড় ভুঁড়ি
আমি বুঝু খাজনা দিব
ফসল পানি হ'লে,
খাদ্ বেগরে মর্‌ছি হুজুর
নিয়ে মেয়ে ছেলে।
আমায় দেখে রেগে বাবু
বুল্লে দারোয়ানে।
পচিশ জুত্তা লাগাও ইস্কো
খাজনা দিস্ না কেনে ?
হাতীর মত গতর বাবুর
দয়ামায়া নাই।
হারামজাদা শালা ব'লে
গাল দিলে বেজায়।
মনে মনে বুঝু আমি
বিচার কর খোদা।
মেদের পয়সায় বাবু হয়ে
বল্লে হারামজাদা
মোটা মোটা ঐ বাবু গুলো
কি কাজেই বা লাগে ?
শুধুই করে বাবুগিরি
কেবল খায় আর হাগে।
মেদের মত চাষা যদি

(অসমাপ্ত)

পূজায় কাঙ্গালের কথা।

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ১৯শ সংখ্যা

পাষাণের বেটি পাষাণী দুর্গা
আসিছে আবার বঙ্গে।
ছাড়াছাড়ি নাই এবার ঝগড়া
করিব মায়ের সঙ্গে।

মুখ চেয়ে কথা বলিব না আর
বলিব এবার স্পষ্ট
তোর আগমনে সুখ পাব কি মা—
বেড়ে উঠে আরও কষ্ট ॥

যখন আমার বয়স আছিল
পঞ্চষষ্ঠ বর্ষ।
প্রতিমা গড়িতে কারিকর এলে
হ'ত মনে কত হর্ষ ॥

বিদ্যালয়ে যবে পড়িতাম আমি
তখনও হত আনন্দ;
বেশ মনে আছে হইতাম খুসী
পাঠশালা হ'লে বন্ধ ॥

সংসারের ভার যত দিন হ'তে
দিয়েছ আমার স্কন্ধে।
আনন্দময়ীর আগমনে আমি
ডুবে থাকি নিরানন্দে ॥

কোন্ অপরাধে আমার উপর
হলি মা এমন ক্রুদ্ধ ?
আর কত দিন করিব মা! বল্
দরিদ্রতা সনে যুদ্ধ ?

বৃক্ষ আছে ফল ধরে নাক তাতে
ভূমি আছে নাই শস্য।
কিন্তু আমারে দিয়েছ জুটায়ে
অনেকগুলিন পোষ্য ॥

তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরাইতে আমি
হয়ে থাকি সদা জব্দ।
আমার অভাব বুঝে না তাহারা—
করে দেহি দেহি শব্দ ॥

ধনীদের দেখে পত্নী পুত্র মোর
হ'তে যায় সবে সভ্য।
কাঙ্গাল যে আমি, কেমনে জুটাব
তাদের বিলাস দ্রব্য।

কৈলাসেতে থাক গায়ে ছাই মাখ
পরণে বাঘের চর্ম্ম।
আসিয়া মাতাও বিলাসের ঢেউ
বুঝি না ইহার মর্ম্ম।
তোর আগমনে জীবনে বোধ হয়
পাবনা কখন স্বস্তি।
সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এস তুমি
রাজার আশিন কিস্তি॥
আনন্দের দিনে নিরানন্দ, যারা
আমার মত নিঃস্ব।
বোধ হয়, তুমি সুখ পাও দেখে
দুঃখীর দুখের দৃশ্য।
তুই মা দুর্গে! ধনীর জননী
বৃথা তোর সনে তর্ক।
কাঙ্গালের সনে আর বুঝি তোর
থাকিবে না সম্পর্ক॥
মা! মা! বলিয়া ডাকিব না আর।
আড়ি দিনু তোর সঙ্গে।
বলিব "দেহান্তে দুখান্ত কর মা
পতিত পাবনী গঙ্গে!"

দীনের আঁখি জল।

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ২০শ সংখ্যা

রাজার বাড়ী পূজার ধূমে
এলেন দশভূজা।
প্রবৃত্তি হ'লনা কিন্তু
নিতে রাজার পূজা॥
রাজার পূজার আয়োজন
ভারী চমৎকার।
পূজার খরচা আছে সব
প্রজার উপর বার॥
প্রজার বাড়ীর কুমড়ো শশা
প্রজার বাড়ীর কলা
ঘৃত, দধি, দুগ্ধ সব
গোয়ালপাড়ার তোলা॥
মা বল্লেন এ পূজাতে
নাইক কোন ফল।

রাজবাড়ীতে সব জিনিসেই
দীনের আঁখি-জল ॥

সেখান হ'তে গেলেন মাতা
দেওয়ান বাবুর বাড়ী।
এখানেও দেখ্‌তে পেলেন
পূজার জমক ভারী ॥

গরীব প্রজা গরীব কোটাল
মরছে খেটে খেটে।
সমস্ত দিন উপোশ আছে
আগুণ জ্বল্‌ছে পেটে ॥

কাঙ্গালের দশা দেখে
উঠ্‌লো কেঁদে প্রাণ।
বাবুরা সব গরু মেরে
করছে জুতো দান ॥

বায়োস্কোপ খেমটা নাচ
থিয়েটারের দল।
সবের মধ্যেই দেখ্‌তে পেলেন
দীনের আঁখি-জল ॥

ঘর নাই, বাড়ী নাই,
বৃক্ষ তলে বসি।
দীন ভিখারী কর্‌ছে পূজা
নয়ন জলে ভাসি।

বনের ফুল বনের ফল
গঙ্গাজল তুলে।
সাজিয়েছে নৈবিদ্য সে
ভিক্ষার তণ্ডুলে ॥

পূজা শেষ করি
যখন দিল পূর্ণাহুতি।
সদয় হয়ে উদয় তথা
হলেন ভগবতী।

বলে "বাছা ভক্ত তুমি
তোমার পূজাই ঠিক।
রাজ রাজরার জাঁক জমকে
ধিক্ শত ধিক্।"

সেই ভক্ত, তারই পূজা,
তারই মোক্ষফল।
যার পূজাতে করে নাক
দীনের আঁখি-জল ॥

হোলী হ্যায়।

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ৪১শ সংখ্যা

বোলো হোলী হ্যায়

মগজ হামারা বিগড় যাতা হ্যায় দেখ্ কলিকা ঢং।
যো কুচ্ মেরা আঁখমে সুজহে সবই হোলীকা সং॥
বোলো হোলী হ্যায়।

আপনা সুখ আওর সম্পদ বাস্তে পরায়াকা চিজ্ লুটা।
লুট্‌নেবালা সাচ্চা আদ্‌মী বলনেবালা ঝুটা॥
বোলো হোলী হ্যায়।

যিস্‌কো কহে ঠগ্ বাটোয়ার, যিস্‌কো কহে চোর।
কেঁও লোক ফির জান শুনকে পাকড়ে উস্‌কা গোড়॥
বোলো হোলী হ্যায়।

বেটা হুয়া হ্যায় রায় বাহাদুর চালাওয়ে ঘোড়াগাড়ী।
এক মুঠি সাত্তু বাস্তে ভিক্ মাঙ্গে মাহাতারি॥
বোলো হোলী হ্যায়।

ব্রাহ্মণ হোকে দারু পিতা হ্যায়, কসাই কয়ে বেদ পাঠ।
বিষ্ণু মন্দির তোড়কে উঁহা বানাওয়ে মছ্‌লী হাট॥
বোলো হোলী হ্যায়।

নোকর লোক খুব দেমাক্ করে কামায় রুপেয়া মোটা।
তাবেদারকা ক্যা কিম্মত উ কুত্তাসে ভি ছোটা॥
বোলো হোলী হ্যায়।

নির্মতিতা কা ঢাল।

১৩২৪ সাল ৪র্থ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

ধুয়া—তোম্ লোগ্ ঝট্‌পট্ আওনা ভেইয়া
শুন নির্মতিতাকা মজা।

Preface.

নির্মতিতাকা নয়া টিশন্‌সে পাঁয়দল থোড়া দূর,—
জিম্‌দার লোগ্‌কা কোঠিকা নজ্‌দীগ তামাসা ভরপূর।
হর বরিষ হোরিমে হিঁয়া ধূম হোতা হৈ ভাই,
অব্ লাগায়া বাবুলোগ সব ফুডবলকা লড়াই।
দেশ দেশমে ছাপা কার্‌কে ভেজা ইস্তাহার,—
“লড়াই জিত্তো ঢাল লে যাও জবরদস্ত্ খেলোয়াড়।”
(লেকেন) “আপন তাগদ্‌সে খেলনে হোগা” লিখা এহি খবর
“কেরায়া কার্‌কে আদমী লানেসে হো যাগা গরবর।

পাঁচো আদমী বৈঠ্ বৈঠ্কে কানুন কিয়া মঞ্জুর—
"দলকো দল সব ভগাই দেগা যব্ দেখেগা কসুর।"
সব্সে বঢ়িয়াঁ খেলোয়াড় দলকো ঢাল-তক্মা বকসিস,
"আ যাও খেলোয়াড় নাম লিখা দেও তিন তিন রূপেয়া ফিস
খেল জিৎকে চাঁদীকা ঢাল লে যাও আপনা ডেরা ;
সিন্কো ঢাল উন্কোই রহেগা, তিন মাহিনা তেরা।"
এহি লালচ্ সে দেশ দেশসে জুট্ গিয়া বাঙ্গালী,
বে-তলোয়ারসে বন যায়েগা তিন মাহিনাকা ঢালী!
লনসুখ আয়া, আহিরণ আয়া, আয়া ধুলিয়ান,
জঙ্গিপুরকা দোঠো আয়া, আন্ত্পুরা পহলয়ান।
বাহারকা দল এহি ছেঠো আউর কোই ন আয়া,
খালি এক নিমতিতা মোকান্মে ছেঠো দল বানায়া।

FIRST ROUND.

Y.M.A.C. (5) vs. Lessor Corpus (1).

পহেলি পাল্লা শুনহো ভেইয়া, ক্যা তাজ্জব কি বাৎ,
বাচ্চা বাচ্চা লেড়কা খেলা, বড়ে জোয়ানকি সাথ!
বকরী কভি শেরকা সাথ লঢ়াই জিৎনে সেকে,
বাচ্চা লোক পাঁচ দফে হারা, একঠো পালটি দেকে।
বাচ্চা লোক এক পাহাড় জিৎকে হুয়া বড়ী দিল খোস,
পাঁচ পাঁচ দফে জিতা, তভি জোয়ানকা আপশোষ!
ছোটা ছোটা বাচ্চা লোগসে মৎ লঢ়ো জোয়ান,
জিৎনা মে কুছ্ নাম নেহি ভাই, হঠনা মরণ সমান।

J.A.M.U. Club (0) vs. Nimtita School A (2).

জেহেলিনগর একট্ঠা হুয়া আহিরণকা সাথ,
জে. এ, এম, ইউ কহতা উস্কো, ক্যা আংরেজী বাৎ।
নিমতিতাকা "এ" মার্খা ইস্কুলকা পঢ়ুয়া,
আহিরণ বালাকা সাথ উনকো পাল্লা হুয়া।
আহিরণবালা ছেঠে খেলোয়াড় কেরায়া কারকে রাখা,
চুটকী সাফ্সে খেল গয়া কোই পাকাড়্নে নেহি সাকা।
বেধরম্কা কাম কারকে পাপ হুয়া সাধিৎ,
দো পাট্কান খাকে উস্কো হো গয়া প্রা'চিৎ।
হারনেওয়ালা খেলোয়াড়কা দুখ ক্যা কহেগা ভাই,
রোতে রোতে খানে লাগা কচৌড়ী মিঠাই।

Jangipur Young Team (0)
vs.
Nimtita School B. (2).

জঙ্গিপুরকা ছোট্কা দলসে নিমতিতাকী "বী",
ভাতুয়া জঙ্গিপুরবালা, ক্যা লড়েগা জী।

চাল জিতেগা এহি লালচ্‌সে, বজ্‌রা লেকে আয়া,
হিলকা মৎলব দিলমে রহা, দো দো পাট্‌কান খায়া।
ক্যা কহেগা জঙ্গিপর্‌রকা কপাল বড়ী বুরা,
একঠো আদমী লায়া উন্‌কো মোকাম বঢ়মপুরা।
বেচারাকা উপর দেখে গররাজী ভগবান,
পহেলা দফে খেল কার্‌কে হো গয়া হালকান।

III-Feeling of the Ganges.

হিন্দুস্হানমে বিলাইতী খেল্‌ কৌন লে আয়া ভায়ি,
এহি খেলকা বাদী হুয়া আপ্‌নে গঙ্গামায়ী।
জোর বরখা লাগা দিয়া হ্যায়, ভেজ দিয়া হ্যায় বান,
দহসৎ হুয়া মারীকা কোপসে, বুড় যাগা ময়দান।
আখড়া উঠাকে দোস্‌রা জাগা লে গিয়া মালিক,
উসি বাস্তে এহি খেলকা উলট্‌ গিয়া তারিখ।
কলি যুগমে দেব লোগ্‌সে আদমী বুধিমান,
অপ্‌মানকা শংকা কার্‌কে হঠা লিয়া হ্যায় বান।

Nimtita Town (0) vs. Dhuliyan Town (1)

ধুলিয়ান টৌন্‌ আ গয়া হ্যায়, চঢ়কে ডিঙ্গি নাও,
নিমতিতা টৌনসে পাল্লা কৌন দেখেগা আও।
বড়ী জোরসে নিমতিতাসে খেল কিয়া ধুলিয়ান,
(মগর) কোই না হারা কোই না জিতা দোনো হুয়া সমান।
দুসরে রোজ ফিন ময়দানমে নিমতিতা টৌন্‌ আয়া,
আধা ঘন্টা দের করকে ধুলিয়ান পোঁছায়া।
ডিসমিস হুয়া ধুলিয়ানওয়ালা হোকে গরহাজির,
ফিন খেল খেলনেকে ওয়াস্তে কিয়া হ্যায় তদ্‌বীর।
পর রোজ সাবেরে খেল করণে মিল গিয়া হুকুম,
নিমতিতাসে ধুলিয়ানকো ফিন লাগা খেলকা ধুম।
নিমতিতাকো টৌনওয়ালা খারাপ কিয়া এক কাম,
বঢ়মপুরসে এক খেলোয়াড় লায়া, পছান্তে উনকো হাম।
সাচ বরাবর পুপ নেহি ন্যায়, ঝুট বরাবর পাপ,
পাপ করনেসে উস্কি নাশ হোগা আপসে আপ্‌।
নিমতিতা টৌন্‌ ধুলিয়ান টৌনসে এক বাজীমে হারা,
খেলৎ খেলৎ উবান্ত কিয়া এক খেলোয়াড় বেচারা।
অব্‌ দেখতে হেঁ মুক্‌সুদাবাদমে বহুত হুয়া হ্যায় টৌন,
বিল্‌কুল্‌ বস্তী টৌন্‌ হোনে সে গাঁও রহেগা কৌন্‌?

কালের নৃত্য।

১৩২৫ সাল ৫ম বর্ষ ২৬শ সংখ্যা

হায়কি করাল কালে ধরেছে ভীষণ,
দুরন্ত কৃতান্ত মূর্ত্তি মানব-অশন।
চতুর্দ্দিকে মহামারী কল্পনা অতীত,
শুনিতে রসনা রুদ্ধ—হৃদয় স্তম্ভিত।
দেশে দেশে, ঘরে ঘরে বালবৃদ্ধ যুবা,
মরিয়া পচিছে হায় যেন শ্বান শিবা।
জানি না কি দোষে বিধি রুষিয়া এমন,
মানব করিছ গ্রাস বিস্তারি বদন।
ছুটেছে উল্লাসে তাঁর ভীম দৈত্য দল,
জ্বর, কফ আদি ব্যাধি করিতে কবল।
ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে,
ফিরিতেছে তারা মত্ত ভীম হুহুঙ্কারে
লইছে টানিয়া বলে, গৃহ শূন্য করি
কিবা শিশু, কিবা যুবা, কিবা নর নারী।
কেবল মরিছে নর, পথে ঘাটে ঘরে,
রয়েছে পড়িয়া শব পচি স্তরে স্তরে।
সাড়া শূন্য শব দেহ লটিতেছে পড়ে,
কে লয় শ্মশান ঘাটে, কে লয় কবরে?
দিশময় পূতিগন্ধ—পথে চলা ভার,
এমনতো কভু কর্ণে শুনি নাই আর।
কি আশ্চর্য্য ঘরে ঘরে নিত্য মরে নর,
নাই তবু হাহাধ্বনি, নাই আর্ত্তস্বর।
সকলে নীরব কণ্ঠ মৃত্যুর কবলে;
যে পারে পলাইতেছে, অন্য সব ফেলে।
হেন কি কখনো কেহ শুনেছে শ্রবণে
কভু কি এসেছে হেন কবির কল্পনে।
কেন হেন হলো হায় বুঝিতে না পারি
হয়েছে দুঃসহ পাপে ধরা বুঝি ভারী।
কি পাপে মজিল আজি ধরণী এমন,
যাতে হেন নর-নাশ হৃদয় কম্পন।
বুঝেছি চিন্তিয়া, মোরা কোন পাপ ফলে,
পড়িয়াছি হেন ভীম্ বিধি কোপানলে।
আমরা আমরা নাই, হইয়াছি জড়,
মানবত্ব হীন, মিথ্যা বেশধারী নর।
মানবের মহাপ্রাণ নাই দেহ মাঝে,
বড়াই কেবল, ছল ছদ্ম সাজে।
যদিরে মানুষ মোরা হইতাম সত্য,
তবে কি মরিত নর অ ঔষধ-পথ্য।

ঘরেতে ধরিলে অগ্নি জ্বলিবে নিশ্চয় ;
যদি কেহ জলসহ অগ্রসর হয়।
মরিতেছে নর নারী জল বায়ু দোষে,
কি উপায় করি মোরা বিদূরিতে বিষে।
কি উপায় করি মোরা প্রশমিতে রোগ,
যাহারা করিতে পারি মত্ত লয়ে ভোগ।
কথায় বিলাপ করি, হায় একি হলো,
গ্রামগুলি একেবারে শূন্য হয়ে গেল।
কিন্তু কেহ কটি আঁটি নেমেছি কি কাজে,
তাই বিভূ হ'য়ে রুষ্ট, নিজকর্ম লাজে,
অশনি হেনেছ হেন ধরণী উপরে,
বুঝিবে প্রলয় এবে ঘটিবে সংসারে।
মানবে করিয়া সৃষ্টি দিয়ে জ্ঞান প্রাণ,
দিলেন তাদের করে জগত-কল্যাণ ;
দেখিয়া অন্যথা তার, বুঝিলাম শেষে.
বিধাতা সেজেছে কাল, মানব বিনাশে ॥
ব্যথিত।

মজার দেশ।

১৩২৫ সাল ৫ম বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা

তোমরা দেখ্‌বে মজার দেশ,
হেথায় নিজের স্বার্থ—পরমার্থ
উঠবার চেষ্টা সকল ব্যর্থ
কেবল টাকা কেবল অর্থ
আত্মসম্মান নাইক লেশ।
যখন জগৎ জুড়ে ডঙ্কা বাজে
জাতি সকল দেশের কাজে
বীরের মত উঠ্‌ছে সেজে
পরে নিত্য নূতন বেশ,
তাদের বুকের মাঝে বিরাট আশা
ঘুচাবে যে দেশের দশা
বিশাল বিশ্বে বাঁধবে বাসা
জানবে না সে দুখের শেষ।
তারা নয়ক ব্যস্ত মানের তরে
নিন্দাকে ত' নাহি ডরে
ত্যাগের পাত্র নিয়ে করে
আপনারে কর্‌ছে শেষ।
তাদের সকল কাজে উচ্চ লক্ষ্য
নীচের সনে নয় ক' সখ্য

তারা সবায় দেখে সমান চক্ষে
দূরে রেখে হিংসা দ্বেষ।

তারা দেয় বিসর্জন আপনারে
দেশের স্বার্থ রক্ষা তরে
অপমানকে নেয় যে ব'রে
গ্রাহ্য নাহি দুঃখ ক্লেশ।

আর এই মজার দেশে মজার কথা
দেশের জন্য নাইক' ব্যথা
হিংসা দ্বেষে জর্জরিত
হেথা পশু পক্ষী মেষ।

এরা নিজের স্বার্থ উদ্ধারিতে
দেশকে পারে বলি দিতে
বিবেক বুদ্ধি নাইক চিতে
কাঁপে না তার মাথার কেশ।

ভাবে চিরদিনই এমনি যাবে
দায়িত্ব আর নাইক' ভবে
মানের মাল্য কণ্ঠে দেবে
যাদের বুদ্ধির নাহি লেশ।

ও ভাই চিতা ভস্মে তোমার যে দিন
নশ্বর দেহ হবে যে লীন
জবাবদিহি করবে কি দীন!
যবে জিজ্ঞাসিবে পরমেশ।

কেহ মরে বিল ছিঁচে কেহ খায় কৈ।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৮শ সংখ্যা

নিত্য নিত্য অবিচার,
সহ্য করা হ'ল ভার
কাঙ্গালের পোষায় না আর থাকা।
যারা হচ্ছে অত্যাচারী
তাদেরই সম্মান ভারী
থাকে যদি পাপ বিনাশক টাকা॥
গণ্ডমূর্খ চাষাগুলো
ঘেঁটে মাটি কাদা ধুলো
জন্মাইল নানাবিধ শস্য।
দেশের যত ধনীর দল
এমনি করিয়াছে কল—
সুদের সুদ আবার সুদ তস্য॥
একবার যে নিলে দাদন,
দাদন নয় এ বিষম গাদন

এই গাদনে গ্রাস করে ফসলে'
করতে বাবু স্বার্থ সিদ্ধি
হিসেব করে চক্রবৃদ্ধি
উশুল কভু পড়ে না আসলে ॥
চাষা মাটী সুদে সুদে
বাবুখান ঘিয়ে দুধে
যত ফসল ঢুকে বাবুর ঘরে।
একি বিচার হায় বিধাতা !
খাদ্যের যারা জন্মদাতা—
দিন কাটিছে কেবল উপোস করে !
চাষার দশা এই প্রকার
শিল্পীরও দিন চল ভার,
খাও মা পরার কষ্ট তাদের ভারী।
সেকরা খাটে দিনে রেতে,
তারা কিন্তু পায় না খেতে,
পোদ্দাদেরা করছে পাকা বাড়ী।
তাঁতি, কামার, কুমোর যত,
তাদের দশা বল্‌ব কত
পেট ভরে কেউ পায় না দুটো দানা !
গোয়ালার ঘরে গরু নাই,
সে বেটা জল বয়ে খায়
দুগ্ধ বিনে গোয়ালা রাতকাণা ।
কৃষি শিল্প প্রদর্শনী
হচ্ছে চারিদিকে শুনি
এগুলিরও মধ্যে চল্‌ছে ভেল।
কাপড় বুনলে গরীব তাঁতি,
পাঠিয়ে দিলে রাজার নাতি
রাজপৌত্রের গলাতে মেডেল।
কাঙ্গালেরা খেটে দিবে
ধনী লোকে বাহবা নিবে
কি ভয়ঙ্কর এই যে কলিকাল।
দুনিয়াতে ধনী থাক্‌
কাঙ্গালগুলো ম'রে যাক্‌
ঘুচে যাক্‌ পৃথিবীর জঞ্জাল।

বছর গেল।

১৩২৬ সাল ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা

এ বছর ত গেল
আবার নূতন বছর আস্‌বে।
কত লোক যে কাঁদবে
আবার কত লোক যে হাসবে।

হাসি কান্নার জন্য
কিন্তু নহে কেহ দায়ী।
হাসি কান্নাও চিরদিন
হয়না কভু স্থায়ী।
হাসতে সবাই চান
আর কাঁদতে কেহ চান না।
পেটে হ'তে পড়েই কিন্তু
সুরু করেন কান্না।
পেটের জ্বালা সঙ্গে সঙ্গে
এসেছে সেইক্ষণে
ভাগ্যে আগে রসদ আসে
মায়ের দুটি স্তনে।
সেই রসদে তুষ্ট ছিলাম
পুষ্ট হলাম তাতে
এখন কিন্তু পেট ভরে না
একটী থালা ভাতে।
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসেছিলাম
কান্না চাই না আর:
হাসি খুঁজে বেড়াই সদা
পাইনা দেখা তার।
সুখ দুঃখ দুটো জিনিস
একই জনের গড়া
দুঃখটা খুব সস্তা
আর সুখটা ভারী চড়া।
সচরাচর মোরা যেটা
সুখ বলিয়া দেখি
দুঃখের উপর গিলটী সেটা
আসল নহে মেকী।
সুখী হতে পারি যদি
আসল সুখটা পাই।
তা' না হ'লে দুঃখ করে কি
দুখ ঘুচান যায়?
দুখ তাড়াতে গিয়া মোরা
পড়্‌ছি আর দুখো
ছুটছুটি কর্‌ছি সদা
আকাঙ্ক্ষার চাবুকে।
মাংস হল ঢিলা আর
শিথিল হল স্নায়ু।
এমনি ক'রে বছর বছর
যাচ্ছে কমে আয়ু।

আষাঢ়ে চাষার খেদ।

১৩২৭ সাল ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

গেলরে বৈশাখ জ্যোষ্ঠি
আজও দেশে অনাবৃষ্টি
নয় বুঝি হয় সৃষ্টি
শনির প্রবল দৃষ্টি
পড়িল এবার বুঝি মোদের উপর।
আছে রাজা মহাজন,
পুত্র কন্যা পরিজন,
এদের যা প্রয়োজন
অন্ন বস্ত্র আয়োজন
কেমনে করিব প্রাণ কাঁপে থর থর।
কি করিলে ভগবান
না করিলে জলদান
হবে না জমিতে ধান
রবে না চাষার প্রাণ
না খেয়ে এবার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।
মহাজন জাঁকাইবে,
জমিদার হাঁকাইবে,
ছেলে পিলে কি খাইবে
ভিটে মাটী বিকাইবে.
ধনে প্রাণে যাব মোরা এই শুধু ভাবি!

'ধূমকেতু'র প্রতি ঢোঁড়ার অযাচিত আশীর্বাদ।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

'ধূমকেতুতে' শওয়ার হ'য়ে—
আসরে আজ নাম্‌লো কাজী।
আয় চ'লে ভাই কাজের কাজী!
তোর সাচ্চা কথার আচ্ছা দাওয়াই
পাবে যারা বেইমান পাজি।
আয় চ'লে ভাই কাজের কাজী!
'হাবিলদার'! আজ আবিলতার
কল্‌জে বিঁধে এপার ওপার
চালিয়ে বুলির গোলা গুলি
জাহির কর্‌ তোর গোলন্দাজী।
আয় চ'লে ভাই কাজের কাজী!
কোন্‌টা বদি কোন্‌টা নেকী.
কোন্‌টা খাঁটি, কোন্‌টা মেকী--

দেশের লোককে দেখা দেখি রে—
'নজরুলের' তীক্ষ্ণ নজর
খাক্ করে দে'ক দাগাবাজী।
আয় চ'লে ভাই কাজের কাজী!
ধরিয়ে দে সব অত্যাচারী,
পাকড়া যত হত্যাকারী,
জোচ্চোরেদের দোকানদারী রে—
চোকে আঙুল দিয়ে লোকের
দেখিয়ে দে সব ধাপ্পা বাজী।
আয় চ'লে ভাই কাজের কাজী!
জানিস্—কানের বামুন মোরা—
কেউটে নই যে আস্ত ঢোঁড়া,
কাজেই আশীষ ফলে থোড়া রে—
মোদের হরি, তোদের খোদা,
তোর উপরে হউন রাজি।
আয় চ'লে ভাই কাজের কাজী!

হতভাগার ভয়।

১৩২৯ সাল ৯ম বর্ষ ৩২।৩৩ সংখ্যা

বার বছর বয়স কালে,
বিদেশে হইয়া পিতৃ-হীন,
বহুদিন পরে বহু দেশ
ঘুরে, বাড়ী আসিল এ দীন।
এর মধ্যে বন্দোবস্ত সব
মুরুব্বিরা ক'রেছেন ঠিক,
বাকী করে গিয়াছে তালুক
রায়তি জমি বেচাও ঠিক।
ধান খান তাঁরা, আমি শুধু
জমি বেচে খাজনা যোগাই,
এইরূপে ক্রমে মোর, আর
বাস্তু-ভিটা ছাড়া, কিছু নাই।
নবীন ভূস্বামী বড় খুড়ো
ধনে জনে বড় ভাগ্যবন্ত,
আদর করেন, খেতে দেন,
ভালবাসার নাই অন্ত।
বাড়ীর পাশে ঠাকুর কাকা,
নিরীহ, সৎ, দয়াপ্রবণ,
বাড়ীখানি রক্ষা-ভার তিনি,
ইচ্ছা করে করেন গ্রহণ;

ফল খেয়ে খাজনা দিবেন,
আমার বাড়ী রবে আমার।
এই কথা ঠিক্ করে আমি
বাঙ্গলা দেশ হলাম পার।
মাঝে মাঝে যবে দেশে যাই
কাকা খুড়া ভালবেসে কয়
বাড়ীতে তোমার ঘর কর
চিরকাল কি বিদেশে রয় ?
ঘর করা ঠিক হ'ল, কিন্তু
সেই কাল অসময় বলে,
সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে,
আবার আমি এলাম চলে।
ঘর করিবার কালে 'কাকা'
বাধা দেন বলে পাত্র পাই ;
কি করি উপায় পুনরায়
বহু অর্থব্যয়ে দেশে যাই।
কাকা কন "বাড়ী ছাড়া একে
মোর পক্ষে বড় কণ্টকর।
প্রবাসেই থাক বাবা, হেথা
কি করিবে ক'রে বাড়ী ঘর ?
তালুকদার খুড়া তোমার
টাকা দিয়ে খুসী করে তাঁয়,
খারিজ করে লয়েছে বাড়ী
আর কি এখন ছাড়া যায় ?"
আইনের ধারার আশ্রয়
নিবার, সাধ্য নাই যে মোর,
এইনা বুঝে কাকা খুড়োরা
করেন এত জুলুম জোর।
নয়নের ধারা রোধিবার,
শক্তিও আমার যে নাই
সেই জন্য হা নিশ্বাস অশ্রু
পড়ে, সদা ভাবি তাই।
বাপের ভিটায় সন্ধ্যা জ্বালা
আমার কাছে বড়ই সাধ,
অকারণ ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ
হয়ে, সাধছেন যাঁরা বাদ।
মনে প্রাণে সদা সর্বক্ষণ
আমার এ ভয়টাই হয় ;
"তাঁদের ভিটায় বাতি দিতে
আর কেহই বা নাহি রয়।"

মুচির টিটকারী।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

মুচি আমি সমাজেতে
বড় ছোট জাতরে।
পয়জার সেলাই করি
করি দুটো ভাতরে।
ধনী মানী বিদ্বান্
ঘৃণা করে আমারে,
তখনই করিবে স্নান
ছুলে এই চামারে
অপকর্ম্ম তাহাদের
মত আমি পারি না,
যশ মান সুখ্যাতির
ধার কিছু ধারি না।
ভদ্রলোক তোমরাহে
মোটা টাকা ঘুষ খাও,
ঘুষ খেয়ে দুস্‌মনে
স্বদেশ ছাড়িয়া দাও।
আমারি ত জাত ভাই
শুনিয়াছি আর বার,
শত্রু সনে যুদ্ধ করি
গিয়েছিল দরবার।
তোমাদের মূলমন্ত্র
টাকা কড়ি খোঁজারে,
জল না দেখেই সবে
খুলে দিলে মোজারে।
বেচে ফেল জমিদারী
ছিঁড়ে ফেল খদ্দর,
শু'খেয়ে মরেনাকো
ঘুষখোর ভুদ্দর।
স্বদেশের জন্য কি
করিলেহে ফয়দা,
টাকা ধর্ম্ম টাকা স্বর্গ
টাকাতেই পয়দা।

আগমনী।

১৩৩০ সাল ১০ম বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

কাতরে মা তোরে বলি
হর-মনোমোহিনী।

দুর্গতি বাড়াতে মোদের
এলি দুর্গতিনাশিনী।
কৈলাসেতে থাক গায়ে ছাই মাখ
লোকমুখে শুনি কাহিনী।
এসে মোদের আবাসে বাড়াও বিলাসে
একি মা সিংহ বাহিনী।
বছরে বছরে দেহি দেহি ক'রে
কত চাই তোরে জননি,
তুমি দাও না তাতে কাণ, এ কেমন বিধান
সুখ শান্তি বিধায়িনী।
পুত্র কন্যা সবে, দেহি দেহি রবে,
ব্যস্ত করে দিবা রজনী।
মোরে মায়াজালে, বাঁধিয়া মজা'লে
নিজে কিন্তু মাগো মজনি।

শোকাশ্রু।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ৬'ঠ সংখ্যা

অস্ত গেল দেশের রবি আঁধারে ছেয়েছে ধরা,
কাঁদ অভাগা দেশের অভাগা ছেলেরা,
কাঁদ অভাগিনী ভারতমাতা।
যে আলোক তুমি বয়ে এনেছিলে,
ছড়াতে বিশ্ব-ভুবনে,
সে আলোক আজি নিভে গেল
সহসা মধ্য গগনে।
আঁধারে ভরিল সবার হৃদয়,
আঁধারে ছাইল ধরা ;
কাঁদ অভাগা দেশের অভাগা ছেলেরা,
কাঁদ অভাগিনী ভারতমাতা।
যে মন্ত্র শিখাতে হে 'চিত্তরঞ্জন'
করেছিলে তুমি জীবন পণ,
সে শিক্ষা মোদের হয় নিক
আজি হয় নিক সমাপন।
মনে রেখো তুমি "দেশবন্ধু"
ব্যর্থ হবে না তার,
ত্যাগের চরম, ত্যাগের ধরম
ত্যাগই সর্ব সার।
যদিও অকালে বিশ্বগগনে
খসিল উজ্জ্বল তারা,
ভরিয়া উঠিল সে মহা জ্যোতিতে
বিশ্ব-ভুবন সারা।

দীপ্ত করিল মানব চিত্ত
রঞ্জিত করিল ধরা,
কাঁদ অভাগা দেশের অভাগা ছেলেরা,
কাঁদ অভাগিনী ভারতমাতা

সেটেলমেণ্টে আমার স্বত্ব।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

ভগবানের তৈরী জমি মানুষ দখল করে,
আমার আমার করে শুধু মামলা করে মরে।
রোদ জ্যোস্না জল বাতাসে সবার সমান দাবি,
মানুষগুলোর কাণ্ড দেখে মনে মনে ভাবি।
নেবো খাব দেবো নাকো সবার একই ভাব,
মানুষে আছে অনেক কিন্তু মানুষের অভাব।
জবর স্বত্ব করতে বাহাল ছুটোছুটিয়ে মরে,
স্বত্বের দফা রফা কিন্তু শ্মশানে কবরে।
কেও করছেন নাখেরাজ মোকররী মৌরসী,
আমি কিন্তু দেখছি মজা উঁচু ডালে বসি।
ভগবান সবার দানাপানি দিতে দায়ী,
এই নজিরে জলে ফলে আমার দখল স্থায়ী।
মানুষ যখন পায়না খেতে চলে পরের দ্বারে,
পেটের জ্বালায় কোথাও যেতে হয় নাকো আমারে,
যাহার দেওয়া খাবার জিনিস তারই দেওয়া ক্ষিদে,
ক্ষিদে পেলেই খাব আমি এইটে বুঝি সিধে।
ফল, মূল, পাতা, ফুল জানিনাকো কার,
আমার কিন্তু সব জিনিসে সমান অধিকার।
সেটেলমেণ্টে হচ্ছে বিচার স্বত্ব কিবা কার,
আমার দখল দেখে হুজুর করুন সুবিচার।
ফলকর স্বত্ব মোর রয়েছে সব ঠাঁই,
দখল দেখে আমার নামটা রেকর্ড করা চায়।
সাগর বেঁধে রাবণ বধে উদ্ধারিনু সীতা,
রাম রাজারই ছাড় রয়েছে জানেন নাকো কি তা।
ত্রেতা যুগে ভারতভূমি কাঁপত আমার তেজে,
লঙ্কা পোড়ার চিহ্ন আছে হাতে মুখে লেজে।
ছিঁড়ব পাতা ভাঙ্গব ডাল কামড়াব সব ফল,
কোন আইন আর কোন নজিরে দেখব কত বল।
তিন ধারাতে হেরে আমি করবো নাকো চুপ,
জবর দখল রাখব বজায় হুপ, হুপ, হুপ।

বিজয়ার কোলাকুলি।

১৩৩২ সাল ১২শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

এস গুরুজন আছ যত,
হই সবাকার পদে নত,
লই শিরে তুলি পদ-ধূলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এস সমসাময়িক যারা,
এ যে ভারতের চিরধারা
এস মতভেদ আজ ভুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এস স্নেহের বাছারা যত,
সব ছুটে এস অবিরত,
স্নেহে বুকে ধরি সবে তুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এস লাট হ'তে চৌকীদার,
চাই আলিঙ্গন সবাকার,
এস কেরাণী! ঝাঁকা কুলি!
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এস সৌখিন! এস শিকারী!
এস ধনবান! এস ভিকারী!
কাঁধে ল'য়ে ভিক্ষার ঝুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এস সাহেব! এস শাসক!
এস কোতয়াল—মহাত্রাসক,
এস ফাঁসিয়ারা! এস শূলী!
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এস ডাকাইত! এস তস্কর!
এস বিপ্লববাদী বর্ব্বর!
যারা খাও মদ, গাঁজা, গুলি
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

এস কয়েদী! এস পাহারা!
এস যেখানে আছ যাহারা;
আজ দোষ গুণ গিয়ে ভুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।
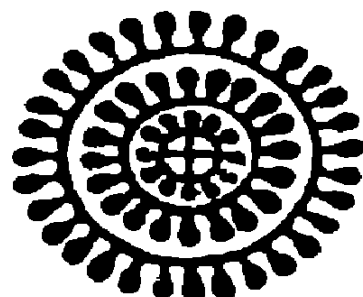
সাংবাদিকতা

ব্যাঘ্র বধ।

১৩২২ সাল ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ৩য় সংখ্যা

মির্জাপুর থানার অন্তর্গত নূতনগঞ্জ গ্রামে এবং তন্নিকটবর্তী অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে বিগত শীতকাল হইতে ব্যাঘ্রের উৎপাত পরিলক্ষিত হইতেছিল। জেলার পুলিশ সাহেব বাহাদুর ইহা শুনিয়া রাজানগর ও বৃন্দাবনপুরের জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাঘ্রের অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান। সম্প্রতি নূতনগঞ্জ গ্রাম নিবাসীগণ ব্যাঘ্র ধৃত করিবার জন্য বাঁশের পিঁজরা কল প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ছাগল বাঁধিয়া রাখে। ব্যাঘ্র ছাগলের প্রলোভনে পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবদ্ধ হয়। গ্রামবাসী এইরূপ কৌশলে ব্যাঘ্রকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া খোঁচাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। ব্যাঘ্রটি লম্বায় প্রায় সাড়ে চারি হাত। আমাদের দেশে পল্লী গ্রামবাসীগণের যখন বন্দুক নাই তখন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর অত্যাচারের সময় নূতনগঞ্জবাসীর পন্থা অবলম্বন করাই উচিৎ।

শূকর বধ।

রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীনস্থ দফরপুর গ্রামবাসীগণ কিছুদিন হইতে বন্য শূকরের উৎপাতে বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিল। সাঁওতালেরা উক্ত গ্রামের জঙ্গল অন্বেষণ করিয়া বরাহ মহাশয়ের গাত্রে কয়েকটি শর বিদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হয় নাই ; বেগে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করায় অদৃষ্ট হইয়া পড়ে। কয়েকদিন হইল উক্ত গ্রামবাসী কতিপয় কৃষকবৃন্দ লগুড়াঘাতে ও বাঁশের খোঁচায় শূকরের প্রাণবধ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কলেরা ও বসন্ত।

জঙ্গীপুরের অতি সন্নিকটস্থ সেকন্দরা গ্রামে কলেরা রোগের আতিশয্য দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি মহাপ্রাণী ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। জঙ্গীপুরে বসন্তের রোগীও বিরল নহে। একে এই দুর্ভিক্ষ তাহার উপর এইরূপ সাংঘাতিক ব্যাধি। গরীবের যে কি কষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত।

একটি কৌতূহলোদ্দীপক মামলা।

রঘুনাথগঞ্জের জনৈক সদগোপ জাতীয়া রমণী নাম মাতঙ্গিনী তাহার এক আত্মীয় ভগ্নী পুত্র মহেন্দ্র নারায়ণ ঘোষের নামে মুন্সেফী আদালতে এক নালিশ করিয়াছিল। নালিশের মর্ম এই যে কয়েক বৎসর পূর্বে মাতঙ্গিনী কয়েকজন লোককে টাকা ধার দিয়াছিল। টাকা আদায় না হইলে নালিশ করিতে হইবে এবং মেয়েমানুষকে আদালতে জবানবন্দী দিতে হইবে এই ভয়ে সে ঘাতকগণের নিকট ভগ্নী পুত্র মহেন্দ্রের নামে দলিল সম্পাদন করিয়া লইয়াছিল। মহেন্দ্র ঘাতকের নিকট টাকা আদায় করিয়া মাতঙ্গিনীকে উসুল

দেয় নাই। দলিলগুলি কিন্তু মাতঙ্গিনীর কাছে আছে। মহেন্দ্র বলে যে টাকা তাহার নিজের। কিছুদিন পূর্বে তাহার দলিল চুরি যায়। সুতরাং সে ঘাতকের টাকা আদায় করিয়া দলিলে উসুল দিতে পারে নাই। জঙ্গিপুরের সুযোগ্য ১ম মুন্সেফ বাহাদুর বহু সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণান্তর মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে মাতঙ্গিনীকে ডিক্রী দিয়াছেন।

প্রিন্সিপ্যালের পরলোক।

১৩২২ সাল ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল রেভারেণ্ড ই. এম. হুইলার গত শনিবার বেলা ৬টার সময় কলিকাতা নগরীতে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার ছাত্রবৃন্দ ও আপামর সাধারণ লোকেই নিতান্ত মর্মাহত হইয়াছেন। হুইলার সাহেব যে কেবল একজন উচ্চদরের অধ্যাপক ছিলেন, তাহা নহে ; তাহার হৃদয় ও সাতিশয় উচ্চ ছিল। তিনি কোনও উপকার প্রার্থীর উপকার করিতে কখনও পশ্চাৎ পদ হন নাই। তিনি অনেক গরীব ছাত্রের বিনা ব্যয়ে কলেজে পড়িবার ও বোর্ডিং এ আহারের ব্যবস্হা করিয়া দিতেন। অনেক ছাত্রের চাকরীর জন্য সুপারীশ করিয়া যাহাতে সে চাকরী পায় তাহার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। মোট কথা তাঁহার এই পরলোক প্রাপ্তিতে বহরমপুর বাসীগণ একজন হিতৈষী বন্ধু হারাইলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমের বাজার।

এবৎসর জঙ্গীপুরে আম নেহাৎ মন্দ জন্মে নাই। মধ্যম রকমের আম ৷৷৹ আনা শতকরাও বিক্রয় হইতেছে। বালুচর আজিমগঞ্জে এবার আম খুব সস্তা। ।৹ আনা শতকরায় আম বিক্রয় হইতেছে। এতদঞ্চলে আম কাঁঠালের ব্যবসা করিয়াও অনেক লোক প্রতিপালিত হইতেছে। ধুলিয়ানে আম জন্মে নাই বলিলেই হয়। ধুলিয়ান আমের জন্য চির বিখ্যাত কিন্তু এবার ধুলিয়ান-বাসীগণকে আমের জন্য পর মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে।

অর্থ দাহ!

সম্প্রতি হাইকোর্টের দেউলিয়া আদালতে চার্লস নন্দী নামক এক ব্যক্তি দেউলিয়া দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন প্রার্থনা করে। লোকটি ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানীর আফিসে কার্য্য করিত। দেনার দায়ে দেউলিয়া হইয়াছে। সেদিন আদালতে প্রকাশ পাইয়াছে যে এই ব্যক্তি সিগারেট খাইয়াই ২৫০ টাকা দেনা করিয়াছে।

মৃতব্যক্তির উপস্থিতি।

পূর্ণিয়ায় হিতবাদীর সংবাদ দাতা সংবাদ দিয়াছেন যে, সেখানে দায়রা আদালতের এক ব্যক্তি প্রাণহানির অপরাধে পূর্ণিয়ায় জমিদার মিঃ বি. সি.

লালের কয়েকজন পিয়ন ও একজন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪, ৩৫৪, ৩৪৭ ও ৩৫২ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা চলিতেছে।

মোকদ্দমার বিবরণ এই যে, আসামীরা পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে তাহার বাড়ী হইতে জমিদারী কাছারীতে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। পথিমধ্যে তাহাকে গুরুতররূপে প্রহারও করে ; শেষে রাস্তার ধারে তাহাকে অচেতন অবস্থায় ফেলিয়া যায়। তদবধি সেই লোকটির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পুলিশ যথারীতি এই ঘটনার তদন্ত করে। তাহাদের অনুসন্ধান ব্যর্থ হইবার নহে। তাহারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আকাশ পাতাল খুঁজিয়া একটি নরকঙ্কাল হাজির করিয়া দিল পোষ্টমর্টেম পরীক্ষা ও হইল। পরীক্ষার ফলে স্থিরিকৃত হইল যে, এই কঙ্কাল কোন পুরুষের হইবে ; যে ব্যক্তির কঙ্কাল সে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়—কঙ্কালটি জলে ভাসিতেছিল, মাংসগুলি শকুনি ও কাক প্রভৃতি খাইয়া ফেলিয়াছে।

পোষ্ট মর্টেম পরীক্ষায় ফল দেখিয়া তদন্তকারী পুলিশ অবশ্যই ভাবিল যে একটা মস্ত কাজই করা গিয়াছে "বাহবা" অবশ্যই মিলিবে। তখন আনন্দে দিশাহারা হইয়া নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির পিতাকে আহ্বান করা হইল। সে আসিয়া বলিল, উপর পাটির দাঁত দেখিয়া বোধ হইতেছে এ আমারই সন্তান।

সকলদিকে যখন মিলিয়া গেল তখন স্হিরীকৃত হইল যে লোকটিকে মৃত অথবা জীবিত অবস্হায় নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় সাড়ে তিন মাস যখন সে গৃহে ফিরিল না তখন আসামীদিগের উপর সন্দেহ ষোল আনা বাড়িল।

গত ২৪শে মে সোমবারে এই মোকদ্দমার শুনানির দিন ছিল। ঐ দিন মোকদ্দমা দেখিবার জন্য বহুলোক আদালতে উপস্হিত হয়। যথা সময়ে সেসন জজ মিঃ আর এল দত্ত আদালত গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলের নজর তাঁহার উপর পতিত হইল।

কিন্তু একি ! যাহার প্রাণ গিয়াছে বলিয়া ; তিনটি লোকের গুরুতর দণ্ড হইবে, লোকে এইরূপ ভাবিতেছিল—স্পষ্ট দিবালোকে সেই সমবেত জনবৃন্দ দেখিল যে সেই ব্যক্তিই একজন উকিলের সহিত আদালতে প্রবেশ করিল। বিচারক মহাশয়কে উকিলবাবু বলিলেন, "মৃত ব্যক্তি আদালতে হাজির"। সকলে বিস্ময়াভিভূত হইল। সৌভাগ্যের বিষয় প্রেতাত্মার আবির্ভাব মনে করিয়া আদালতে কেহ গোলযোগ করে নাই।

এখন কঙ্কালের উপায় কি হইবে ? পুলিশ মুখে কিছু বলিল না—মনে মনে কিছু ভাবিল কিনা কে জানে ? আর, এই নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির পিতা এখন দেখিল যে "উপর পাটির দাঁত, এই লোকটির ও রহিয়াছে, সুতরাং এখন আর সে কঙ্কালকে পুত্র বলিয়া সনাক্ত করিল না ; এই লোকটিকেই পুত্র বলিয়া সনাক্ত করিল।

লোকটি সকলের বিস্ময়াপনোদনের জন্য বলিল যে, খাজনা মিটাইবার জন্য সে কয়েকজন পিয়নের সঙ্গে জমিদারী কাছারীতে যাইতেছিল—পথিমধ্যে তাহাদিগের সহিত তাহার বিবাদ হয় ফলে মারামারি হয়। অন্যপক্ষ বলবান বলিয়া সে পলায়ন করে এবং নেপালের সীমান্ত প্রদেশে "জাতভাইদিগের" সহিত বাস করিতে থাকে। সেখানে চাকরীও যোগাড় করে।

"সব ভালো, যার শেষ ভালো" সুতরাং বিচারক সরকারী উকিলকে

জিজ্ঞাসা করিলেন ; আদালতে সমস্ত রহস্যই তো প্রকাশ পাইল, এখন আপনি মোকদ্দমা চালাইবেন না তুলিয়া লইবেন?" উকিল মহাশয় হাতের জিনিস ফেলিয়া দিতে চাহিলেন না—তিনি বলিলেন মোকদ্দমা চালাইব। কাজেই বিচারক ৪ঠা জুন মোকদ্দমার দিন ধার্য করিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী উকিলকে বলিলেন,—"মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হউক", তখন উকিল মহাশয় ২৫শে মে এই ছেঁড়া ল্যাঠা মিটাইয়া ফেলিয়াছেন।

যত্র আয় তত্র ব্যয়।

১৩২২ সাল ৮ই আষাঢ় ৬ষ্ঠ সংখ্যা
২৩শে জুন ১৯১৫।

বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার এলাকাস্থিত দক্ষিণ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার মেলেটি কাঁদরার জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্র গোঁসাই দাস বন্দোপাধ্যায়ের শুভ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। বরপণ ও অলঙ্কার দেড় হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যথা সময়ে শুভ কর্ম (কন্যা কর্তার পক্ষে শুভ কি অশুভ ভগবানই জানেন) সম্পন্ন হইল। গত রবিবার রাত্রিতে বরযাত্রীগণসহ গোঁসাই দাস সস্ত্রীক সালার ষ্টেশনে ট্রেণে সোয়ার হইয়া মল্লারপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে পেঁাছিয়া বর দেখিলেন তাঁহার শ্বশুর প্রদত্ত গহণার বাক্সটি নাই, অমনি চক্ষু স্থির। হায়, হায়, স্বোপার্জিত ধন নষ্ট হইলে সকলেরই এইরূপ হইয়া থাকে, তারপর বরযাত্রীগণ সকলে একত্রে সমবেত হইয়া স্থির করিলেন কোন্ বেটা চোর ট্রেণ হইতে বেমালুম বাক্স সরাইয়া ফেলিয়াছে। বাক্স চুরি যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। চোর বেটার কি ব্রহ্ম শাপের ও ভয় নাই? ব্রাহ্মণের রক্ত জল করা ধন কি এরূপ ভাবে না বলিয়া লওয়া উচিৎ? গোঁসাই দাস বাবুর এই বিবাহ একরকম বিনা পণেই করা হইল। বরকর্তাগণ! এখন হইতে পুত্রের মূল্য ও অলঙ্কারাদি একটু সাবধানে লইয়া আসিবেন।

মুসলমান দুহিতার উপাধি লাভ।

সে বৎসর নদীয়া জেলার সেখ জমিরুদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান ভদ্র-লোক "বিদ্যা বিনোদ" উপাধি পাইয়া ছিলেন, এবার তাঁহার কন্যা "আর্য্য-সাহিত্য-সভা" হইতে সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "সরস্বতী" উপাধি লাভ করিয়াছেন। এখন তাঁহার নাম হইল বিবি দুরজাঁহা খাঁ সরস্বতী। বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ কন্যাগণ একবার নিমীলিত আঁখিউন্মীলিত করিবেন কি?

বঙ্গমাতার সুসন্তান।

দেবী সরস্বতীর বর-পুত্র-সিদ্ধ সেবক সহৃদয় ডাক্তার পি, সি, রায় পঞ্চনদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া যে অর্থলাভ করিয়াছেন তাহা রসায়ন শাস্ত্রের নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার কল্পে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। আদর্শ স্বার্থ ত্যাগী!

বিনাপণে বিবাহ।

১৩২২ সাল ১১শ সংখ্যা
২৮শে জুলাই ১৯১৫।

গত ২৪শে আষাঢ় বহরমপুরের উকীলবাবু অম্বীকাচরণ রায় এম. এ. বি. এল মহাশয়ের কন্যার সহিত বিখ্যাত উকীল তারা প্রসাদ বিশ্বাস মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র প্রসাদ বিশ্বাসের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। সত্যেন্দ্র প্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। তাহার পিতা তারা প্রসাদ বাবু এই বিবাহে পণ গয়না ও যৌতুকাদির জন্য কিছুই দাবি করেন নাই। মাইনর পাশ ছেলে বেচা বাবারা ভাবিতেছেন "তারা প্রসাদ বাবুর বুদ্ধি নাই। অমন বি. এ. পড়া ছেলে যদি তাদের থাক্‌তো টাকায় ঘর ভরিয়া ফেলিত।"

নরপশু !

সমসেরগঞ্জ থানা এলাকার দিগরী গ্রামের তুজার সেখ নামক একজন মুসলমান তাহার দূর সম্পর্কীয়া ১০/১১ বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়াছে। বালিকাটি সাংঘাতিক ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। জঙ্গীপুর সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করিয়া আঘাত চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন। গ্রামবাসীগণ এই নৃশংস ব্যাপারে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তুজারকে প্রহার ও দিয়াছে। আসামী প্রথমে পলাতক হয় পরে সমসেরগঞ্জের সুযোগ্য দারোগাবাবু সুরেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের চেষ্টায় ধৃত হইয়া বিচারার্থ জঙ্গীপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আসামী এখন হাজতে। ইনি একজন সি ক্লাস দাগী। ইতিপূর্বে শ্রীঘর বাসের অভিজ্ঞতাও ইহার আছে।

কুলরক্ষা।

বিক্রমপুরের জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ স্বীয় তিনটি অতিক্রান্ত যৌবনা কন্যাকে এক বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিয়া কুল রক্ষা করিয়াছিলেন। পত্নীত্রয়ের মধ্যে যিনি সর্ব জ্যেষ্ঠা তিনি নাকি পতি অপেক্ষাও বয়সে বড়। শ্রীমান জামাতা বাবাজি বিবাহের কয়েকদিন পরেই ফুলশয্যার পরিবর্তে চিতাশয্যায় শয়ন করিয়া পত্নীত্রয়ের একাদশীর সুব্যবস্থা পাকা করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক কুলীনের কুলতো অক্ষুণ্ণ রহিল।

সংবাদ।

১৩২২ সাল ২২শে ভাদ্র ১৬শ সংখ্যা
৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫।

সন ১২২২ সালে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সুতরাং গত ১৩২২ সালে ইহার শতবর্ষ পূর্ণ হইল। ইহার শত বার্ষিকী জন্ম তিথির উৎসবের আয়োজন হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয় ইহার

প্রধান উদ্যোগী। এতদ্‌পলক্ষে প্রচলিত ও লুপ্ত সকল প্রকার বাঙালা মাসিক পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সমূহের একটি প্রদর্শনীও হইবে। বঙ্গের সমস্ত বাঙালা সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদকগণের নিমন্ত্রণ হইবে। সম্পাদকগণের একত্রিত হইবার একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এই উৎসবে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

আমরা পরস্পর শুনিলাম যে জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য পদ প্রার্থী হইয়া জনৈক মুচি জাতীয় করদাতা আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে কানাঘুসা করিতেছেন এতদঞ্চলে প্রসূতির আঁতুড়ে মুচি জাতীয়া স্ত্রীলোকেই ধাত্রীর কার্য্য করিয়া থাকে। যদি সপ্ত মাতার মধ্যে ধাত্রীকে গণনা করা হয়, নীচ জাতীয়া বলিয়া বাদ দেওয়া হয় না। তখন ধাত্রী নন্দন যে সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইবার অযোগ্য তাহা কি প্রকারে বলিব? উপযুক্ত করদাতাগণ সকলেই সমান অধিকারী।

সংবাদ।

১৩২২ সাল ২৯শে ভাদ্র ১৭শ সংখ্যা
১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫।

এতদঞ্চলে চাউলের দর টাকায় পৌনে সাতসের হইয়াছিল আজকাল টাকায় সাত সের এক পোয়া পাওয়া যাইতেছে। ভাদুই ধান্য উঠিলে চাউল সস্তা হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল কিন্তু কই চাউল ত সস্তা হইল না? ভাদুই চাউল পৌনে নয় সের বিক্রয় হইতেছে। এবার দেশের লোক অন্ন কষ্টের আশঙ্কা করিতেছে।

গাছে না উঠ্‌তে এক কাঁদি।

আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্বাচনের দিন স্থির হইয়াছে। তাহা আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি। গত ৫ই সেপ্টেম্বর সভ্য-পদ প্রার্থীগণের আবেদন করিবার শেষ দিন বলিয়া সাধারণে জানিতেন, কিন্তু সেইদিন রবিবার বলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি আফিস বন্ধ ছিল। কয়েক জন সভ্য-পদ-প্রার্থী পরদিন অর্থাৎ ৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার তাঁহাদের আবেদন পত্র আফিসে দেন। অসময়ে প্রদত্ত বলিয়া তাঁহাদের আবেদন না মঞ্জুর হয়। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন জঙ্গিপুরের সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আগামী শুক্রবার বিচার শেষ হইবে। ফলাফল পরে প্রকাশিত হইবে। অবৈতনিক পদের জন্য প্রথম স্বস্তি বাচনেই মামলা মোকদ্দমা! অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি?

দোলায়াং মরকং ভবেৎ!

১৩২২ সাল ২৬শে আশ্বিন ২১শ সংখ্যা
১৩ই অক্টোবর ১৯১৫।

মা এবার দোলায় আসিতেছেন। দোলায় আগমনের ফল মরক। আমাদের জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সামিল জেলে পাড়ায় কলেরা আরম্ভ হইয়াছে

দুই একটি লোক মারা গিয়াছে। কয়েকজন আক্রান্ত হইয়াছে। আমাদের যেমন অদৃষ্ট তাহাতে পঞ্জিকার লিখিত সুফলগুলি ফলুক আর নাই ফলুক কুফলগুলি অবশ্যই ফলিবে।

শ্বেতাঙ্গের দয়া।

কলিকাতার পশ্চিম ধারে ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানীর দোকানের পাশে রাস্তার উপর সে দিবস একজন বৃদ্ধ লোক মর মর হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধের চতুর্দিকে অনেক লোকের ভিড় হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহাকে সাহায্য করিতে কাহাকেও দেখা যায় নাই। ভবানীপুরের শাঁখারী টোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম ব্যানার্জী হঠাৎ ঐ সময় ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, বৃদ্ধের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বিট কনষ্টেবলদিগকে উহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলেন। কনষ্টেবলেরা বলরাম বাবুর কথায় কর্ণপাত করিল না। দেখিতে দেখিতে ইয়ুরোপীয়ান সার্জেণ্টের দল তথায় উপস্থিত হইল, কিন্তু ভিড় সরান ছাড়া তাঁহারা আর কিছু করিলেন না। বলরাম বাবু সার্জেণ্ট-দিগকেও বলিলেন "আপনারা বৃদ্ধটিকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিন।" কার্যরথী সার্জেণ্টগণ বলরাম বাবুর কথার উত্তরে নাকি বলিয়াছিলেন—মরণোম্মুখ ব্যক্তি নেটিভ, সে ইয়ুরোপীয়ান নহে, সুতরাং আমরা উহার কিছু করিতে পারি না।" বলরামবাবু যুক্তিতর্কে পরাঙমুখ না হইয়া উহাদিগকে বলিলেন আপনারা সার্জেণ্ট পাহারায় রহিয়াছেন—আপনারা উহার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। উভয়ের মধ্যে এইরূপ বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছে এমন সময় সার্জেণ্ট বেরিংটন একখানা টামকার হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল ; তাঁহার তখন ডিউটি না থাকিলেও তিনি একখানা গাড়ী ডাকাইয়া বলরামবাবুর সাহায্যে বৃদ্ধকে গাড়ীর ভিতর তুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লইয়া গেলেন, হাসপাতালে উপস্থিত হইয়া তথাকার ডাক্তারদিগকে বলিয়া দিলেন—যাহাতে বৃদ্ধ রোগমুক্ত হয়, তজ্জন্য আপনারা যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন। বৃদ্ধ এখন হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে।

সম্রাট জর্জের দুর্ঘটনা।

সম্রাট জর্জ ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া লক্ষ লক্ষ সৈন্য আনন্দে উম্মত্ত হইয়া সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। সেই লক্ষ কণ্ঠের সমবেত সিংহনাদ শ্রবণে সম্রাটের অশ্ব ভয় পাইয়া অসংযত হইয়া উঠে এবং সামনের পা দুটি তুলিয়া লাফাইতে থাকে। ফলে সে নিজেও পড়িয়া যায় এবং সম্রাটও সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যান। তাহাতে সম্রাটের নানা স্থান ছড়িয়া যায়। সুখের বিষয় সম্রাট জর্জ ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। প্রার্থনা করি, তিনি শীঘ্র নিরাময় হইয়া প্রজাবর্গের আনন্দ বিধান করুন।

এক ইলিশে ২৫ টাকা ভাগ্যে ভাগ্যে রহিল পরাণ।

১৩২২ সাল ১লা অগ্রহায়ণ ২৫শ সংখ্যা
১৭ই নভেম্বর ১৯১৫।

গত সেপ্টেম্বর মাসে একদিন আমাদের সুযোগ্য সাবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বি. এ. রেলে জঙ্গীপুর হইতে কোথায় যাইতেছিলেন। সেই ট্রেনেই জনৈক গরীব মুসলমান মৎস ব্যবসায়ী (পাঝরা) মৎস লইয়া বিক্রয় করিতে আসিতেছিল। জঙ্গিপুর ষ্টেশনে ট্রেনের গার্ড সাহেব (বাঙালী) তাহার নিকট একটি বা দুইটি ইলিশ আদায় করে। মৎস্য ব্যবসায়ী দিতে রাজী না হওয়ায় একটু গোলমালও হয়। ক্রমে এই গোলমাল অমল-বাবুর গোচরে আইসে। মৎস্য ব্যবসায়ী মহলদার এই ব্যাপার লইয়া ফৌজদারী আদালত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল আমরা গার্ডবাবুকেও এইজন্য বহুবার জঙ্গিপুর আদালতে আগমনও করিতে দেখিয়াছি। ট্রেনে স্বয়ং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় ছিলেন বলিয়া গার্ডসাহেবকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল নচেৎ গরীব পাঝরা কি করিত? অবশেষে এর খোষামোদ তার খোষামোদ এমন কি তাঁহাকে পাঝরারও সাধ্য সাধনা করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি শুনিতেছি পাঝরাকে ২৫ টাকা দিয়া মোকদ্দমা মিটমাট হইয়াছে। বাদী মোকদ্দমা চালায় নাই।

কথায় বলে—জ্ঞানী শিখে দেখে।
আর মূর্খ শেখে ঠেকে॥

রেলের কর্মচারীগণের অনেকেরই এই রোগ আছে বলিয়া শুনা যায় তাহারা দেখিয়া একটু জ্ঞান লাভ করিলে ভাল হয় রেল কর্তৃপক্ষ এই প্রকার জুলুম প্রশমন করিবার কোনও উপায় করিতে পারেন না কি?

অসাধারণ আয়।

ধনকুবের মিঃ জন, ডি, রকফেলারের নাম বোধ হয় সকলেই জানেন। তাঁহার বার্ষিক আয় ৩০ কোটি টাকা; অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ৫৮,২৯,২২৫ টাকা। আরও সোজা ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে প্রতি মিনিটে তাঁহার আয় ৫৭০ টাকা।

কলিকাতায় ডাকাইতি!

১৩২২ সাল ৮ই অগ্রহায়ণ ২৬শ সংখ্যা
২৪শে নভেম্বর ১৯১৫।

সন্ধ্যার পরে দোকান লুঠ। বড় রাস্তায় মোটর—দস্যুতা। কলিকাতা শ্যামবাজারে কর্ণওয়ালিষ ষ্ট্রীটে এল. এম. রক্ষিত ব্রাদার্সের দোকানে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে; তাহার বিশেষতঃ এই যে, বড় রাস্তার উপর বাজারের মধ্যে সন্ধ্যার পরই ডাকাইতি হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রক্ষিত লালমোহন রক্ষিত, চন্দ্রমোহন রক্ষিত, শ্যামমোহন রক্ষিত ও মোহিনীমোহন রক্ষিত এই দোকানের

মালিক। তাঁহাদের বাড়ী দোকানের কাছেই—বড়তলা থানার পশ্চাতে। বুধবার রাত্রি নয়টার পর সাড়ে নয়টার পূর্বে দোকানের কর্মচারীরা হিসাব মিলাইয়া টাকা গণিতেছিল। তখন দোকানের আর কয়টি দ্বার বন্ধ হইয়াছে, কেবল একটি দ্বার মুক্ত। আর পশ্চাতে বাজারের দিকে যে দ্বার দিয়া তাহারা বাহির হইয়া যাইবে, দ্বারবান সেই দ্বারটি খুলিতেছে। এমন সময় দুই জন যুবক দোকানে ঢুকিয়া কাপড় দেখিতে চাহে। খাজাঞ্চী আর একজনকে কাপড় দেখাইতে বলিল। কাপড় দেখিতে দেখিতে যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন চলিয়া গেল ও আর চারিজনকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। তখন যে কাপড় দেখিতেছিল সে খাজাঞ্চীর কাছে যাইতে উদ্যত হইলে যে কাপড় দেখাইতেছিল সে, বলিল "ওদিকে যাইতেছেন কেন?" কাজ আছে বলিয়া যুবক অগ্রসর হইলে দোকানের লোক জুতা পায় দিয়া সেদিকে যাইতে নিষেধ করিল। খাজাঞ্চী বারণ করিলে যুবক "চোপ রহ শালা" বলিয়া তাহার মুখের কাছে পিস্তল ধরিল। আর একজন অপর ব্যক্তির সামনে পিস্তল ধরিল। তাহার সঙ্গীরা টাকা লইতে লাগিল। দোকানের আর একজন বাহির হইবার চেষ্টা করায় দুইজন যুবক তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল সে আলমারীর উপর পড়িয়া গেল—আলমারীর একখানা কাঁচ ভাঙ্গিয়া গেল। একজন একটা ফাঁকা টোটা ছুড়িলে সকলেই ভয়ে নিশ্চল হইল। যুবকগণ টাকা গুছাইয়া লইতে লাগিল। বাক্‌সের ভিতরের ট্রেতে যদি কিছু লুকানো থাকে বলিয়া তাহারা সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা আবার দোকানের লোককে অভয় দিয়াছিল, "কাগজপত্রে তাহাদের প্রয়োজন নাই তাহারা কাগজ লইবে না!" রাস্তায় একখানা মোটর ছিল—তাহাতে আলো ছিল না। টাকা লইয়া যুবকগণ সেই মোটরে উঠিয়া মোটর চালাইয়া দিল।

পচুইয়ে সর্বনাশ। একসঙ্গে এক কুড়ির দেহত্যাগ বিষম দুর্ঘটনা।

বিগত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার থানার অধীন ভেজিনার পচুই মদের দোকানে প্রায় শতাধিক লোক কয়েক দলে বিভক্ত হইয়া মদ্যপান করিতে গমন করে। উক্ত দোকানের গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেণ্ডার শ্রীমান হৃষিকেশ সাহা ও তাহার অনুচরগণ এ সময়ে মদ্য বিতরণ ও পয়সা আদায়ে ব্যস্ত ছিল। প্রথম দলের লোক যখন পানাদি সমাপন করিয়া একটু রঙ্গরস করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল তখন তাহাদের দুইজন মাতাল বেজায় নেশার চোটে ঢলিয়া পড়ে ও চক্ষু উলটাইয়া প্রাণ হারায়। দোকানদার হৃষিকেশ সেদিন অতিরিক্ত খদ্দেরের নিকট পয়সা এবং ধান চাউল আদায় করিয়া যেমন একটু সন্তুষ্ট হইতেছিল অমনি এ সাংঘাতিক ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গে। সে তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া থানায় সংবাদ দেয়। এদিকে দেখিতে দেখিতে আরও অনেক মাতালের প্রাণ পাখী উড়িয়া যায়। দোকানে একটি বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। ক্রমেই গ্রামের অন্যান্য লোকজনও আবগারী বিভাগের লোক সমবেত হয়। তারপর শুনা যায় প্রায় এককুড়ি লোক এই মদ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও এককুড়ি লোক মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে কেহ কেহ বা পূর্ব জন্মের পুণ্যফলে এযাত্রা রক্ষাও পাইয়াছে।

কি জন্য এরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল পুলিশ তাহার তদন্ত করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন অশিক্ষিত দোকানদার তাহার মদ উৎকৃষ্ট করিয়া অতিরিক্ত মাদাত জুটাইবার আশায় হয়তো মদে কোন বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত করিয়া থাকিবে আবার কেহ মদ্যের পাত্র কোনরূপে বিষাক্ত হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমান করিতেছেন। মূল কথা কি এখনও তাহা জানা যায় নাই।

সম্রাট জর্জ সংবাদ।

১৩২২ সাল ২৯শে অগ্রহায়ণ ২৯শ সংখ্যা
১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৫।

অশ্ব হইতে পতনের ফলে আহত হইবার পর হইতে এতদিন সম্রাট জর্জ শয্যাগত ছিলেন। সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। ক্রমে তিনি প্রথমে দুইটি যষ্টির সাহায্যে পরে এক গাছি যষ্টি লইয়া চলিয়া বেড়াইতে পারিতেছেন। রাণী আলেকজান্দ্রার জন্মতিথি উপলক্ষে সম্রাট জর্জ মহারাণী মেরীর সহিত জননী-সন্দর্শনে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্র জলযোগ করিয়াছিলেন। সম্রাটের আরোগ্য সমাচারে ভারতবাসী যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছে। শ্রী ভগবান সম্রাটের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখুন।

ভবানীপুরে ডাকাতি।

(৮০০ টাকা অপহৃত)

১৩২২ সাল ২০শে পৌষ ৩১শ সংখ্যা
৫ই জানুয়ারি ১৯১৫।

গত সোমবার সন্ধ্যাকালে ভবানীপুর অঞ্চলে আবার একটা ডাকাতি হইয়াছে। এই ডাকাতদের হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, তখন সন্ধ্যা ছয়টা। ভবানীপুর চাউল পট্টি লেনে দুইজন রিভলভারধারী বাঙালী যুবক তিনজন ভদ্রলোককে আক্রমণ করিয়া তাহাদের কাছে যাহা কিছু ছিল সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছে। তাঁহারা তিন ভাই ঘোড় দৌড়ে বাজির টিকিট বেচিয়া কিছু লাভ করিয়াছিলেন। লাভের গুড়টুকু সমস্ত পিঁপড়ায় খাইয়া গেল।

সতীশ চন্দ্র ঘোষ ও তাহার দুই ভাই যোগেশ ও ক্ষিতিশ ৫১নং চাউল পট্টি লেনে বাস করেন। ঘোড় দৌড়ের মাঠ হইতে তিন ভায়ে বাড়ী ফিরিবা-মাত্র যুবক ডাকাতদ্বয় বাড়ীতে ঢুকিয়া সদরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। ক্ষিতীশ অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছিল। ডাকাতদের একজন যোগেশের এবং অপর জন সতীশের হাত ধরিয়া রিভলভার বাহির করে এবং টাকা চাহে। সতীশ তৎক্ষণাৎ তাঁহার কাছে যাহা কিছু ছিল বাহির করিয়াছেন। যোগেশ কিন্তু একটু ইতস্ততঃ করেন। তাহাতে তাহারা গুলি করিবার ভয় দেখাইলে যোগেশ ও টাকা বাহির করিয়া দেন। মোট ৭/৮ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া ডাকাতরা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া দেখিতে পাইল সতীশ ও যোগেশ তাঁহাদের পিছু লইয়াছেন। একজন ডাকাত অমনি গুলি করিল। গুলিটা প্রথমে যোগেশের বাম হস্তের অঙ্গুলীতে লাগে ; পরে সেটা তাঁহার উদর ও

উরু স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়। তখন তাঁহারা ফিরিলেন। তাঁহাদের ও ডাকাতদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের বাড়ীর হিন্দুস্থানী ভৃত্য ডাকাতদের পিছু পিছু গিয়া একজন ডাকাতকে ধরিয়া ফেলে। অপর ডাকাতটা কিছু অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। পিছনের লোকটি ধরা পড়িয়া সাহায্যার্থ তাহার সঙ্গীকে আহ্বান করে। সে ফিরিয়া আসিয়া গুলি করে ; কিন্তু গুলি ফসকাইয়া যায়। চাকরটি তখন ডাকাতকে ছাড়িয়া তাহাদের পিছু পিছু যায়। কিন্তু কাঁসারী পাড়া পর্য্যন্ত যাইবার পর ডাকাতরা ভিড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়। যোগেশ এখন হাসপাতালে, তাহার আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

উঁইয়ে সর্বনাশ।

শ্রীযুক্ত সাহুজী লাল সিং দেও মানভুমের এক বড় জমিদার। ইনি একটা লোহার সিন্ধুকে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকার কারেন্সী নোট রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সিন্ধুক খুলিয়া তিনি দেখিতে পান যে উহার মধ্যে কিরূপে উঁই প্রবেশ করিয়া সমস্ত নোটগুলি খাইয়া ফেলিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতার পরলোক গমন।

কলিকাতার স্টার থিয়েটারের সুবিখ্যাত অভিনেতা বাবু অমরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় কয়েকদিন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে স্টার রঙ্গমঞ্চ শ্রীভ্রষ্ট হইল তাহার সন্দেহ নাই। অমর বাবু একাধারে লেখক ও অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার অভিনয় যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন।

সংবাদ।

৩৪শ সংখ্যা

আজিমগঞ্জের ধনকুবের রায় বুধ সিং দুধেরিয়া বাহাদুরের বাটিতে গত কয়েক দিবস ধরিয়া মহা ধূমধাম হইয়া গিয়াছে। নিমতিতার সুবিখ্যাত জমিদারবাবু মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের অবৈতনিক থিয়েটার সম্প্রদায় এই উপলক্ষে অভিনয় দেখাইয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ইহা ছাড়া বায়স্কোপ, নাচ, ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের ও আয়োজন হইয়াছিল। কেহ কেহ এই উৎসবকে রায় বাহাদুরের জুবিলি বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

হাজি সাহেব চলিয়া গেলেন।

জঙ্গিপুর মহকুমার বিখ্যাত রেশম কুঠীওয়ালা হাজিমানিক মন্ডল পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। হাজি সাহেব অতি সামান্য অবস্থা হইতে বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে বিশেষ সঙ্গতিপন্ন রেশম নির্মাতাগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। সর্ব দুঃখপ্রশমনকারী মৃত্যু তাঁহাকে সকল প্রকার অশান্তির হস্ত হইতে নিস্তার করিয়াছে। বিবাদের মূল ধনসম্পত্তি সবই থাকিল, হাজি সাহেব কিছু লইয়া গেলেন না।

ক্যা লেকে তোম্ আয়া পিয়ারে
ক্যা লেকে তোম্ যাগা।

মুট্ঠী ধানকে আয়া পিয়ারে
হাত পসারে যাগা ॥

স্বর্ণময়ী কলেজ।

পত্রান্তরে প্রকাশ কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কলিকাতায় "মহারাণী স্বর্ণময়ী" নামে এক কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই কলেজের বার্ষিক ব্যয় নাকি লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

সি. আই. ডি. দারোগা ও বিপ্লববাদী দল।

ষ্টেটশম্যানে প্রকাশ,—সেদিন এক সি আই, ডি, দারোগা তাহার আর্দ্দালীকে সঙ্গে করিয়া শ্যামবাজারের ট্রামে আরোহণ-পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাইতে ছিলেন। কয়েকজন বিপ্লববাদীও বোধ হয় দারোগার অনুসরণার্থই ঐ গাড়ীতে উঠিয়া-ছিল। দারোগা কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের কাছে আর্দ্দালীসহ গাড়ী হইতে অবতরণ করেন এবং মাণিকতলা রাস্তা ধরিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিতে থাকেন। দারোগাকে অবতরণ করিতে দেখিয়া বিপ্লববাদীগণ ও গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল এবং দারোগাকে পেছনে পেছনে তাড়া করিল ইহা দেখিয়া আর্দ্দালী চীৎকার করিয়া দারোগাকে সতর্ক করিয়া দেয়। তখন বিপ্লববাদীরাও গতিক সুবিধাজনক নহে দেখিয়া সরিয়া পড়ে। ঐ বিপ্লববাদীর দুইজনকে নাকি দারোগা ও আর্দ্দালী চিনিতে পারিয়াছে।

কলির গুরু দক্ষিণা।

(১)

মালদহ হইতে একটি শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ কতকগুলি ছেলে মালদহ জেলা স্কুলের হেড মাষ্টারকে ছোরা মারিয়া খুন করিয়াছে। আততায়ীরা এখনও গ্রেপ্তার হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই। গত শুক্রবার বৈকালে হেড মাষ্টার যখন স্কুল হইতে বাটীতে আসিতেছিলেন তখন পথে তিনি আক্রান্ত হন। স্থানীয় হাসপাতালে নীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এক বৎসর পূর্ব্বে কুমিল্লা জিলা স্কুলের হেড মাষ্টার শরৎবাবু বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। তিনিও কিছুকাল কালিদহ জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন।

(২)

পাটনা কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী হেডমাষ্টার গতপূর্ব শনিবার রাত্রিকালে বাঁকি পুরের বিহার ইয়ং মেন্স ইনষ্টিটিউটের সম্মুখবর্তী গলির ভিতর দিয়া যাইবার সময় প্রহৃত হন। যে মাষ্টার মহাশয়কে প্রহার করিয়াছে সে তাঁহারই ছাত্র। এই মর্কট নাকি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দান বিষয়ে অনুমতি না পাইয়া শিক্ষককে লাঠির আস্বাদ প্রদান করিয়াছে। শিক্ষকমহাশয় লগুড়াঘাতে জর্জরিত হইলেও ছাত্রকে চিনিতে পারিয়াছেন। এই গুরুদক্ষিণা লাভের পর শিক্ষক মহাশয় পুলিশে সংবাদ দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ঃ শিক্ষা কমিশনার মান্যবর সার্পসাহেব শীঘ্রই বাঁকি পুর যাইবেন শুনিতেছি, সুতরাং ব্যাপারটি অনেকদূর গড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

দিবালোকে ব্যাঘ্র।

৩৬ সংখ্যা ৪ঠা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৬

গত শুক্রবার রঘুনাথগঞ্জের দরবেশ পাড়ার নিকটবর্ত্তী উলু খড়ের জমিতে প্রাতে সাতটার সময় একটি ব্যাঘ্র দেখা গিয়াছিল। বাঘটি তিনজন লোককে অল্প বিস্তর জখম করিয়া দিবালোকে অবাধে ছুটাছুটি করিতে থাকে। অনেক লোক বাঙালীর একমাত্র অস্ত্র লাঠি লইয়া ব্যাঘ্রের পশ্চাৎধাবন করে। গৃহস্থের বাটিতে আজকাল মাছকোটা বঁটি ও তামাককাটা দা ভিন্ন অন্য কোনও অস্ত্র পাওয়া যায় না। মিউনিসিপালিটীর মেথরের জমাদার ভুন্দু মেথরের একটি বন্দুক আছে। সেও বন্দুকটি লইয়া বাঘের অনুসরণ করে। বাঘটি প্রথমে মস্তক ও পার্শ্বদেশ ভেদ করায় সে অচিরে ব্যাঘ্রলীলা সংবরণ করিয়াছে। ভুন্দু বাঘটি না মারিলে সে বোধ হয় আরও লোকজন জখম করিত। স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ কেহ কেহ ভুন্দুকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বখসিস দিয়াছেন। কিন্তু তাহা খুব সামান্য। তাহার সাহসের উপযুক্ত পুরস্কার হয় নাই। সরকার হইতে তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কার দিলে ভাল হয়।

নাটক।

আমরা সরস্বতী পূজার সময় নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের থিয়েটারে "আহেরিয়া" অভিনয় দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। "আহেরিয়া" নাটক প্রণেতা ক্ষীরোদবাবু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

হরির লুটে নরহত্যা।

ফরিদপুর জেলায় ধরাইকান্দি গ্রামে মদন মণ্ডলের বাড়ীতে হরির লুট হইতেছিল। গ্রামের অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, কিন্তু মদনের ভাইপো রাজেন ও তার পাঁচ ভাইএর নিমন্ত্রণ হয় নাই। তাহারা মদনেরই বাড়ীর এক অংশে বাস করিত। রাজেন হরির লুটের জায়গায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে তাহাদের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইবার কারণ কি? সুধন্বা নামক এক ব্যক্তি বলে যে, গ্রামের পঞ্চায়েতের আদেশে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ভোজ না দেওয়ায় তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ইহাতে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া ও অবশেষে দাঙ্গা উপস্থিত হয়। ফলে সুধন্বা হত ও অপর চার ব্যক্তি আহত হয়। পুলিশ রাজেন ও তাহার দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে। সেসন জজের বিচারে তিন জন আসামীর প্রত্যেকের দশ বৎসর করিয়া জেল হইয়াছে।

শুল্ক বৃদ্ধি।

এবার ভারতের সরকারী বাজেটে যে সকল দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। চিনি ব্যতীত অপরাপর আমদানি দ্রব্যের শুল্ক শতকরা সাড়ে সাত টাকা।

২। চিনির শুল্ক শতকরা দশ টাকা।

৩। রবিখন্দ চারি বাক্স, জালানি কাঠ ছাপাখানা ও লিথো-গ্রাফের

সরঞ্জাম, রেলের সরঞ্জাম, জাহাজের সরঞ্জাম প্রভৃতি জিনিসের শুল্ক শতকরা আড়াই টাকা।

৪। পোড়া কয়লা টন প্রতি আট আনা।

৫। তাজা ফল, শাকসব্জি, বাঁশ, শিং, পাট, খইল, মূল্যবান প্রস্তর ও জহরাদি মোটর গাড়ির সরঞ্জাম, মাট, বালি প্রভৃতি জিনিসের শুল্ক শতকরা সাড়ে সাত টাকা।

৬। লোহা ও ইস্পাতের শুল্ক শতকরা আড়াই টাকা।

৭। অন্যান্য ধাতব পদার্থের শুল্ক শতকরা সাড়ে সাত টাকা।

৮। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদের শুল্ক কুড়ি টাকা।

৯। এল বিয়ার ও আপেল জাত মদ্যের শুল্ক গ্যালন প্রতি সাড়ে চারি আনা, দেশীয় মদের শুল্কও ঐরূপ বর্দ্ধিত হারে।

১০। সুগন্ধযুক্ত মদের শুল্ক গ্যালন প্রতি ১৮৷৷ হারে।

১১। অপরীক্ষিত উত্তেজক মদ্য গ্যালন প্রতি ১৪৷৷৵ হারে এবং পরীক্ষিত মদ্য গ্যালন প্রতি ১১% হারে।

১২ পানের অযোগ্য স্পিরিটের শুল্ক শতকরা ৭৷৷৹ টাকা হারে।

১৩ চুরুট ও সিগারেটের শতকরা ৫০ টাকা হারে।

১৪ তৈয়ারী তামাকের শুল্ক পাউণ্ড প্রতি ১৵ হইতে ১৷৷ হারে।

১৫ কতকগুলি রূপালি জিনিসের শুল্ক শতকরা ১৫ টাকা হারে।

১৬ রপ্তানি পাটের গাইট প্রতি ২% হারে।

১৭ চারি শুল্ক প্রতি একশত পাউণ্ডে ১৷৷ হারে।

১৮ লবণের শুল্ক মণকরা ১ টাকা হারে ১৮৭০ আয়কর।

(ক) ৪০০০ টা. হইতে ৯৯৯৯ টা. পর্য্যন্ত টাকা প্রতি দুই পয়সা হারে।

(খ) ১০,০০০ টা. হইতে ২৪৯৯৯ টা. পর্য্যন্ত টাকা প্রতি তিন পয়সা হারে।

(গ) ২৫,০০০ টা. হইতে তদূর্দ্ধ প্রতি টাকায় এক আনা হারে।

১৯। ব্যবসাদার কোম্পানি সমূহের আয়ের উপর টাকা প্রতি এক আনা হারে।

জেলের কয়েদীর আবার জেল।

(স্বরাজ সম্পাদকের ছয়মাস)

২রা চৈত্র বুধবার ৪০শ সংখ্যা

ইং ১৫ই মার্চ ১৯১৬।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রলাল নাগপুর "স্বরাজ" পত্রের সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু রাজদ্রোহ প্রচারাপরাধে ইহার জেল হয়। ইনি জেলের মধ্যে কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় জেল আইনের ২৫ ধারা মতে নাগপুরের সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাকবিলডের এজলাসে অভিযুক্ত হন। বিচার কালে ইনি অপরাধ স্বীকার করিয়া বলেন যে তাঁহাকে যে কার্য্য করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অতিশয় শ্রমসাধ্য ঐ কাজ করা তাহার দৈহিক ক্ষমতার অতীত। তিনি উহা করিতে না পারায় তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। এই বলিয়া আসামী

ম্যাজিস্ট্রেটকে বেত্রাঘাতের চিহ্ন সকল দেখাইয়া ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি আরও ছয়মাস কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলাবাহুল্য পূর্বের দণ্ডকাল অতীত হইলে এই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আসামী এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় জজের কাছে আপীল করিবেন।

ঠিকই বটে ইলেকসন !

১৩২২ সাল ১৬ই চৈত্র ৪২ সংখ্যা
ইং ২৯শে মার্চ ১৯১৬।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির আবার ইলেকসন হইবে। ইহা দিন ঠিক। এতদিন চাপা ছিল বটে কিন্তু আর থাকিল না। কমিশনার সাহেব চেয়ারম্যান রায়বাহাদুরের নিকট যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন তাহা প্রথমতঃ মিটিংএ কমিশনার-গণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। পরে সমস্তই মিটিংএ হাজির করা হইয়াছিল। যাহা প্রকাশ না করিলেই নয় তাহা প্রথমতঃ জানানই ঠিক ছিল। তবে অনেক ব্যাপার আছে যাহা Confidential গোপন রাখা উচিৎ যেমন বৃন্দাবন লীলার কৃষ্ণপ্রেম। বৃন্দা শ্রীমতীকে বলিয়াছিলেন—

যদি যাইবি দক্ষিণে বলিবি পশ্চিমে
দাঁড়াবি পূরব মুখে।
গোপনের প্রেম গোপনে রাখিলে
থাকিবি মনের সুখে॥

রাধিকা না হয় শ্বাশুরী ননদের ভয়ে, কলঙ্কের ভয়ে গোপনে রাখিবার কথা কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারেও শ্বাশুরী ননদের ভয় আছে নাকি ?

অদ্ভুত জনরব।

কলিকাতায় জনরবে প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বার্লিনে থাকিয়া বৃটিশকে কিরূপে হয়রাণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কাইসরকে পরামর্শ দিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিদ্রোহী দলের সাহায্য লইতে নাকি তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অরবিন্দবাবু পণ্ডীচেরীতেই আছেন।

রম্য রচনা
ও
চুটকিলা

১৩২৩ সাল ৩য় বর্ষ ২৫শ সংখ্যা

৪র্থ অভিনয়-রজনী।

আত্ম-শাসন রঙ্গমঞ্চে শোচনীয় নাটক

"আয়ব-লোকসান।"

(Tragedy)

কুশীলব।

হামবড়া....সর্দার।

মৎলব
খোসামোদ
জবরদস্তী
নিমকহারামী
গোলামী
জবলবমী
বে-অকুফী
বে-ইমানী } মোসাহেবগণ

প্রভৃতি।

আক্কেল....খবরদার।

আক্কেলের গীত।

ছি ছি এত্তা গোলমাল
এৎনা জারা কোঠী ইস্‌মে এত্তা গোলমাল,
হরদম্ লাগতেঁ চাবক তব্বি এইসা হাল।
হাম্ বড়া সর্দারকো এইসা দেমাক্,
কোঠীকো জবালায়কে করতা হ্যায় খাক্,
মৎলববান্দা
বড়ি মৎলব বান্দা,
খোসামোদ্ কর্‌তা হ্যায় মেজাজ বেচাল
উসী বাস্তে কোঠী হুয়া পয়মাল।
হিঁয়া হোগা নেহি মেরি বস্তি,
হরঘড়ি জবলবম আউর জবরদস্তী,
সবি গোলাম,
বড়ি নিমকহারাম,
বেইমানী বে'কুফী হুয়া বাহাল,
মালিক তু আপানা কোঠী সামাল।

গমনে বহু দুঃখানি নিগমে প্রাণ সংশয়ঃ।

কর্তা গিন্নী সংবাদ

কর্তা—আর এক্সটেন্‌সন্‌ মিল্‌লো না। বিশ টাকা পেন্‌সন্‌ নিয়ে রিটায়ার কর্‌তে হলো।

গিন্নী—কি হলো গো! তবে কি হবে গো! পুরো মাইনেতেই চল্‌তো না উপরিও গেল গো!

কর্তা—দেখি সাহেবের কাছে যাই। যদি দু একটা অনাহারী কাজ পাই। তা হ'লে পোষিয়ে যাবে। পরচুলাটা দাও তো। সাহেব যেন টাক না দেখতে পায়। হুঁকাটা দিও।

গিন্নী—তাই যাও গো। ভগবান যেন মুখ তুলে তাকান। আমি সত্যিনারায়ণ মানসা করি।

মিথ্যার জন্য সত্যনারায়ণ।

গিন্নী—ঠাকুর মশা'ই! মনস্কামনা পূর্ণ হবে তো? আশীর্বাদ করুন। যে আশায় গিয়েছেন তা যেন হয়। বাবা সত্যনারায়ণ! সাহেবের সুমতি দাও বাবা। যেন একটা কাজ দেয়।

ঠাকুর—মা! এক টাকা দক্ষিণা দেও মা! আধুলিতে অর্ধেক ফল হবে।

কর্তা ও সাহেব।

কর্তা—হুজুর! তাবেদার না খেয়ে মরে। দু' একটা অনাহারী কাজ না দিলে হেল্‌থ ঠিক থাক্‌বে না। চুপ ক'রে থাকতে পারবো না। দেশের কাজে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিব।

সাহেব—তুমি বুড়ো কাজ পারবে তো?

কর্তা—হুজুর আমার জোয়ান থেকে 'এনার্জি' বেশী। একটা কেন? যতগুলি কাজ দিবেন তত পারবো। তুমিও 'এরিয়ান' আমিও তাই। দেখে নিও। না পারি রিজাইন দিব।

সাহেব—আচ্ছা বুড়া। আগামী সপ্তাহে তোমাকে একবার আস্‌তে হবে। আমি কটা 'প্ল্যান' করেছি। হয়তো তোমাকেই সবগুলি দেবো।

কর্তা—যো হুকুম। (স্বগতঃ) প্ল্যান কর, আমিও 'প্ল্যান্‌টেন সো' করতে বাহাদুর।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

গমনে বহু সুখানি নিগমে প্রাণ সংশয়ঃ

এক মুখে খেতাম যা'
পেতাম বেতন।
এইবার উড়ায়েছি
বিজয় কেতন।
ছয় মুখ পাইয়াছি
বিধির কৃপায়।
তিন মুখে তিন বোর্ড
অবাধে চালাই।
এক মুখে শিক্ষা আর
এক মুখে কৃষি,
চালাই লাঙ্গল ফাল,
চালাই A.B.C.
বাকী এক মুখ আছে
মুখাগ্নির তরে,
"রিভার-ব্যাঙ্কেতে" মুখ
পিন্ডে যদি ভরে
আর চারি মুখ পেলে
হই দশানন,
বেঁধে আনি ইন্দ্র, শনি
বরুণ সমন।
পাহাড় আহার করি
আমি অনাহারী,
সাধি স্বদেশের (শবদেশ) কাজ
যতটুকু পারি?

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

গমনে বহু সুখানি নিগমে প্রাণ সংশয়ঃ

"ফার্টাইল ব্রেন"।
লক্ষ্য মোর লক্ষ দিকে
বক্ষে বহু প্ল্যান,
চক্ষে নাহি লাজ কিছু
'ডিউটিফুল ম্যান।'
উর্বর মস্তকে মোর
বুনিয়াছি বীজ,
ফলিবে ইহাতে এক
'বিউটিফুল' চীজ।

ফুল (fool) হলো, (fall) হবে
বল যাবে বেড়ে।
'প্রোফিটের বেনিফিট'
খেতে হবে কেড়ে।
দিবানিশি বুদ্ধি করি
যেই চাল চালি,
আমার শস্যের ভাগ
তোদের বিচালি।
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
খেটে খুটে লুটে পুটে
করিলাম তৈরী।
হিংসায় ফেটে মরে
যত সব বৈরী।
এতো ক'রে চালালাম
রুল্ গুতো ডাণ্ডা,
তবুও বেহায়া বেটা
হলো নাকো ঠাণ্ডা।
ঘুলিয়ে দিলে যে মাথা
ভুলিয়ে যে যাইরে।
মুণ্ডপাত করি যদি।
কায়দায় পাইরে।
ধিকি ধিকি জ্বলাইছে
তুষের আগুনটা
দুৎ তোরি! শাক মূলো
কুমড়ো বেগুনটা।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

গমনে বহু সুখানি নিগমে প্রাণ সংশয়ঃ

বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।

সাহেব—ক্যা বাবু! তোম্ তো খুব ভন্দর বন্ গিয়ো। বহুৎ নাফা করতা হ্যায়।

বাবু—(স্বগতঃ) এই রে বুঝতে পেরেছে। পারবে না? ওরা মানুষ চড়াচ্ছে। ভরি-কে ভরি পার ক'রেছি ওদের দোষ কি: (প্রকাশ্যে) হুজুর ধর্মাবতার!

সাহেব—হাঁ! হাঁ! মিটি বাৎসে নাই হোগা। যো খায়া নিকালো।

বাবু—হুজুর! গোরক্ত গোহাড়। যে খেয়েছে ভগবান্ আছে। এখন বামন হইয়া যদি বলী ছল্তে পারি।

সাহেব—নিকালো! পেট ফার্কে বাহার হোগা। যো খায়া জল্দী বোলাও। সাত রোজ টাইম।

বাবু—(স্বগত) বামন হয়ে ত্রিপাদ ভূমি নেবই।

কি করিতে কি করিনু।

উচল বলিয়া অচল সেবিনু

পড়িনু অগাধ জলে।

আমায় সকল রকমে

কাঙ্গাল করিয়ে দর্প করিলে চুর।

"আমরা ঘুচাব তোমার দুঃখ

মানুষ আমরা নহিতো মেষ।"

অকূল কাণ্ডারী মোরা সব পারি,

নাহি এতে কোন পাপের লেশ।

ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং।

মাথায় বরফ লাগাও কেহ

কেহ কেহ কর পাংখা।

অতি লোভে ন কর্ত্তব্যঃ

ভাল নয় দুরকাংখা।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

গাধার 'ফিউচার প্রস্পেক্ট' (ভবিষ্যৎ উন্নতি)।

একদা এক ধোপার গাধা কাপড়ের মোট বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক সার্কাসের গাধার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয় গাধার মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইতে লাগিলঃ—

ধোপার গাধা—ভাই! তুমি তো সার্কাসের দলে থাক, কিন্তু তোমার শরীর কত কৃশ কেন? আমি যদিও ধোপার গাধা, মান সম্মান তোমার চেয়ে ঢের কম, তবুও ধোপা যেমন খাটায় তার উপযুক্ত খাবারও দেয়। তুমি কি খেতে পাওনা ভাই?

সার্কাসের গাধা—খেতে পাই। তবে খাবার জিনিস—ঘাস বিচালী বা দানা অপেক্ষা প্রভুর চাবুকই বেশী খাই। তাই ভাই, শরীর ভাল হয় না।

ধোপার গাধা—তবে, মর্‌তে সার্কাসের দলে থাক কেন? কোন ধোপার বাড়ীতে থেকে আমারই মত মোট বইবে, আরে পেট ভরে না খেয়ে কি মারা যাবে? আর সার্কাসের দলে থেকো না।

সার্কাসের গাধা—দাদা, সাধে কি আর মার খেয়ে পড়ে থাকি? 'ফিউচার প্রস্পেক্ট' আছে ব'লেই তো।

ধোপার গাধা—'ফিউচার প্রস্পেক্ট' কি আছে ভাই?

সার্কাসের গাধা—সাধে কি দাদা, না খেয়ে বেঁচে আছি, কেবল ঐ আশা-টুকু আছে বলে। তবে শোন—আমার প্রভু তাঁহার এক তের বৎসরের কন্যাকে দিয়ে তারের উপর নাচ করান। প্রথমে হাতে ছাতা নিয়ে ভার কেন্দ্র ঠিক রাখে। তারপর ছাতা না নিয়ে নাচে। তারপর তার বাবা হুকুম করে—এক পায়ে তারের উপর নাচ কর্‌তে হবে। কন্যাটী তখন বলে—"বাবা এক পায়েমে কেইসে নাচেঙ্গী গির্‌ যায়েঙ্গী বাবুজী।" তখন তার বাবা ক্রোধের সঙ্গে বলে

—"দেখো বেটী গির পড়োগী তো এহি গান্ধাকা সাথ তেরী সাদি দে দেগা।" ভাই যদি কখনও পা ফস্‌কে সেই সুন্দরী মেয়েটী নাচতে নাচতে একবারটী পড়ে তবে আমার সঙ্গে সাদি হবে এই আশায় না খেয়ে পড়ে থাকা। "ফিউচার প্রস্পেক্ট" শুনলে ?

যাঁহারা "ফিউচার প্রস্পেক্টের" লোভে এখন হইতে না খেয়ে না খেয়ে প্রভুর চাকরী করচেন তাঁদেরও আশা প্রভুর সর্বোচ্চ কর্মচারীর পদ পাবেন। তাদের 'ফিউচার প্রস্পেক্ট' এই গাধার মত নয় কি ?

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা

বিজয়া প্রভাতে।
মান যাচাই।

ফিরিওয়ালা—হররকিসিম চিজ, খোসবো, দাওয়াই, মনিহারী মাল সস্তা দর।

বাবু—(মুখ ফিরাইয়া সদর্পে) হারে বেটা, তোর সব জিনিসের ক্যাটালগ আছে ?

ফিরি—ও তুমি বাবু ? রাম। রাম !! সাইতের দিনে প্রাতঃকালে খ্যাঁচ্‌ খ্যাঁচ্‌ লাগালে দেখছি। আজ গর-সাইত ! না বাবু, ছোট বেবসাদার—ওসব থাকে না। নগদা কিনি নগদা বেচি।

বাবু—কি রকম ব্যবসাদার তুই। অশিক্ষিত দেশ।

ফিরি—তোমাকে জানি। তুমি যাকে ধর তেলে ভাজা কর। তোমাকে জিনিস বেচা পাপ। আজ বছরকার দিন তোমার পাল্লায় পড়লাম ভাগ্যে কি আছে।

বাবু—মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বি ব্যাটা। জানিস্‌ কার সঙ্গে কথা বল্‌চিস্‌।

ফিরি—(বোঝা ফেলিয়া) তোমারই একখান, কি আমারই একখান। বড়লোক হলে তো কি হলো ? তোমার খাই না পরি' যে মোটা মোটা বাৎ শুন্‌বো।

বাবু—(বীরদর্পে পৃষ্ঠ প্রদর্শন) কাণ মলে দিবি নাকি ? মারবি নাকি ? ভারী অসভ্য। জানোয়ার। দৌড় দৌড়।

* * *

বাবু (বাড়ীতে) ঢক্‌। ঢক্‌!! ঢক্‌ !!! না পালিয়ে এলে বেটা সেরেছিল আর কি। যাক্‌, বড় বেশী লোকে দেখেনি। ঐ এক বেটা দেখেছে সেই বেটাই ঢাক বাজাবে। যাক্‌, গালাগালি দিয়েছে, অপমান তো করতে পারেনি।

১৩৩৬ সাল ১৬শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা

প্রেতের বাণী।

একদিন একভাবে গদগদ লেখক এক নবপ্রসূতা পত্রিকার জন্মদিনে পত্রিকার উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য লিখেছিলেন—

"কঠিন কর্তব্যের কণ্টকময় পথে তুমি রিক্তহস্তে ধাবমান হইতে কুণ্ঠিত

হইও না। ....মহত্ত্বের গৌরবে ইহার সকল দৈন্য সকল অভাব উদ্ভাসিত হইয়া পরিপূর্ণতার পথে যাত্রা করিবে।"

আমরা ভাবলাম বাঃ বেশ কথা তো! আজকাল কাগজ চালানো কঠিন ব্যাপার। অভাব দৈন্য কিছু থাকবে না, পরিপূর্ণতার পথে যাত্রা করবে। লেখকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তো বেশ আছে! শুভ বৈশাখ মাসটাতে ভাবুক লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল। সম্পাদক মশায় সত্যি সত্যি "রিক্তহস্তে ধাবমান হইতে কুণ্ঠিত হইলেন না।" কাগজ বেরুলো না। Lame excuse দেখান হলো। তারপর ২রা শ্রাবণ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণতার পথে যাত্রা ক'রে হঠাৎ অদর্শন। ভাবুক লেখকেরও দেখা নাই। কাগজেরও দেখা নাই। পূর্ণ ১১ সপ্তাহ পর গত ২৪শে আশ্বিন প্রেতাত্মার ক্রন্দনধ্বনি নিয়ে আগমনী সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

"নহুষের প্রেতাত্মা কাঁদিছে" শীর্ষক লেখাটী প'ড়ে কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর আক্রমণ ব'লে বোঝা যায় বটে কিন্তু লেখকের স্বভাবসিদ্ধ মাথামুণ্ডবিহীন প্রবন্ধে (একে প্রবন্ধ না ব'লে কবন্ধ বল্লেই এর ঠিক নাম দেওয়া হয়) কিছু ঠাওর করা যায় না। তবে উক্ত কবন্ধের শেষাংশে আমাদের একটী ব্যঙ্গচিত্রের চারিটী লাইন উদ্ধৃত ক'রে ওটা যে আমাদেরই বল্‌ছেন এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পত্রিকার জন্মাবধি এতে কতকগুলি অমার্জনীয় ভ্রান্তি ছিল, আমরা সেগুলি সংশোধন করে নেবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করার কয়েক সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে বাদানুবাদ হয়েছিল। ভ্রম সংশোধন করার পর আর কোন কথা-কাটাকাটি হয়নি। এতদিন অদর্শনের পর এই আক্রমণের কারণ কি? আর ভাবুক লেখকের আবার এভাব হলো কেন? এতদিন একদম নির্বাক থেকে হঠাৎ ঝগড়ার প্রবৃত্তি উদয়ের কারণ কি? অনুসন্ধান ক'রে জান্‌তে পারলাম। লেখক ম'শায় রীতিমত মাশুল দিয়ে প্রেতলোকে গমন ক'রেছিলেন। জনৈক নরদেহধারী প্রেতের পরামর্শে এই প্রবন্ধ লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। যদি কেহ বলেন—যে এই বিনামা লেখকই যে সেই ভাবুক মশায় তা' কি করে আমরা জান্‌লাম? পত্রিকা বাহির হবার দিন কয় আগে ইনি কার্য্যালয়ে বসে proof সংশোধন কর্‌ছিলেন। খুব নিবিষ্টচিত্ত হ'য়ে সংশোধনের পরও তাহার অগাধ বিদ্যার পরিচায়ক "মনিশ্রেষ্ঠ, অগস্ত্য, বিন্ধ্য, হারহৈতেও, সরকরী, লবন, দার্জ্জিলিং, সেলগুপ্ত, দৈবেরবসে, বাড়িয়া উঠিল, আশাকাঙখা" ইত্যাদি শব্দের অস্তিত্বই তাঁকে সনাক্ত কর্‌ছে। অতএব এইবার আমরা তাঁকে আর তাঁর মুরুব্বি—হোঁদল কুঁৎকুঁতে সেই ফাগুন মাসের "গোঁরায় গলদ" শীর্ষক কবন্ধের লেখক মহাশয় যাঁকে আমরা গোভূত বলে পরিচয় দিয়েছিলাম তাঁকে কিঞ্চিৎ প্রতিদান দিবার ব্যবস্থা করি। এই পূজোর সময়ের তত্ত্ব হজম ক'রে থাকা আর তার পাল্‌টা তত্ত্ব না করা লোকাচার বিরুদ্ধ।

ভাবধারার ভাবুক! আর তার ওস্তাদজী শীতলার বাহন! তোমরা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। পাঠকগণও একটু এই পাল্লা উপভোগ করুন। একদিন আমরা জোর গলায় বলেছিলাম তোমাদের ক্ল্যাস ফ্রেন্ড, গ্ল্যাস ফ্রেন্ড, টিচিং ফ্রেন্ড, চিটিং ফ্রেন্ড, গ্রীণরুম ফ্রেন্ড, যে যেখানে আছ লেগে পড় আমরা পাল্‌টা কর্‌তে কখনও পশ্চাৎপদ হব না।

বলি—বৎস ভাবধারা! কি দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলে বাপ! "চরিত্রে যার

বাঁধাবাধি নাই তাকে নাহুঁস বা বেঁহুস বলে।" কোন্ মুলুককে? তোমার 'মেট্যাল' মুলুককে, না তোমার মুরুব্বির 'দিয়্যার' মুলুককে? বোধ হয় নহুঁষের সঙ্গে punning করবার জন্য চরিত্র আর হুঁস একই জিনিস ব'লে চালা'তে চেষ্টা করেছ। Pun চালাতে গিয়ে যে পানাধিক্য হয়ে পড়েছে। পড়ে শুনিয়েছ নিশ্চয়। যেমন তোমার উনোনমুখো দেবতা তুমিও তার মনের মত ঘুঁটের নৈবিদ্য চালিয়েছ। রুচি হইবেই তো। তোমাদের মিলেছে বেশ। তুমিও কবিরাজ তোমার দেবতাটীও মৃগরাজ। বেশ রাজযোটক হ'য়েছে। যখন দুটীতে বসে কথাবার্তা কও তখন কি মধুর দৃশ্যই সৃষ্টিকর। তুমি ভাবুক —চক্ষু মুদ্রিত ক'রে মুখটী ছুঁচ্লো করে সরু সুতো কাট আর তোমার প্রভুটী হাত নেড়ে, মুখ বিকৃত ক'রে, গতর দুলিয়ে উত্তর দেন; তাঁর আবার কায়মনোবাক্য ভিন্ন অন্তরের ভাব প্রকাশ করা হয় না। কতক হস্ত সঞ্চালনে, কতক মুখভঙ্গীতে, আর কতক বা অর্থবিহীন চেঁচানীতে তার বক্তব্য বুঝ্তে হয়। এই উভয়ের সুতহিবুক যোগে মিলন না হ'লে কি প্রেতলোকের বার্তা বহন কর্তে পার। রামদেব শর্মাকে যেভাবে বর্ণন করেছ আর তার অত অহঙ্কার সইলো না। সব রকম ক'রে দেখলো কিছুতেই কিছু হলো না, সরকারী খানা হাড়িয়ে নহুষের মত কাঁদছে। বেশতো হ'য়েছে। সাধের প্যাণ্টালুন্ খুল্তে খুল্তে কাঁদছে। কবে তার পান্তানুন পর্য্যন্ত জুট্বে না। যার এত বড় অহঙ্কার "হাম্ কোওন হ্যায়, তোম্ কোউন হ্যায়" কর্তো আজ কেঁদে মর্ছে। ঠিক হ'য়েছে। এমন লোকের অমনি হওয়া উচিত। নিরীহের প্রতি আক্রমণ একি সয়। তোমরাও খুসি হ'য়েছ আমরাও খুসি হ'য়েছি। বেচারা নিরীহ লোকটীর উপর তোমরা দয়া করছো তো? তাকে একটু দেখো। আহা বেচারীরে!

বাপ ভাবধারা! তোমার কবন্ধের একটী স্থান বুঝতে পারলাম না— 'কল্পতরু কারবারটীতে' এক দোষীকে কামড়াতে কোন নিরীহ বেচারার অসাক্ষাতে নিজের ভাবধারাকে আর একদিকে চালিয়ে কিম্মৎ জাহির ক'রে বল্বে আমরা কারো খাতির করিনি। তাকেও বলেছি একেও বলেছি। দ্ব্যর্থবোধক লেখার মা-বাপ তুমি। চরিত্রকে হুঁসে নিয়ে এসো। আবার কল্পতরুর পরেই চাল, ডাল, তেল, নুন, সরঞ্জামের উল্লেখ করেছ। কোন্ চাল? দুর্ভিক্ষের সময়ের? কোন্ কাঠ? আমাদের ঘরের কাছে যে কাঠ আছে সেই কাঠের কাঠ নয় তো? তেলের কথাও বলেছ—ভেজাল তেল নয় তো? তা যদি লিখে থাক জিত্তা রহো বাপ! জিত্তা রহো! এক লাঠিতে ক'সাপ মেরেছ তার ঠিক নাই।

রামদেব শর্মাকে আবার পঞ্চমুন্ড শিবের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছ। শিব যদি যোগ হয় তবে শিবরাম দেব শর্মা হ'য়ে যায় যে। ছি ছি! এটা ভাল হয়নি। এযে তোমার ওস্তাদের ভীতি সঞ্চার কর্বে।

১৩৪৫ সাল ২৫শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা

চাটনি।

"আমাদের আপিসের বড় সাহেবটা—হাজরী নিয়ে বেজায়...."

"আমাদের আপিসটা কিন্তু ভাই বেশ! দশটার আগে যখন খুসী

পেঁীছলেই হোলো ; আর ছ'টার পর যখন খুসী চলে গেলেই হোলো—বলুনেওয়ালা কেউ নেই।"

দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের একজন বলিল আচ্ছা অনার্স বল্ দেখি ঐ ভেড়ার পালে কতগুলি ভেড়া আছে ?

গোটা পঞ্চাশেক হবে।

পঞ্চাশটা ? আচ্ছা দেখছি, ওহে ও ভেড়াওয়ালা শোনো—তোমার পালে কতগুলি ভেড়া আছে ?

সাড়ে বার গণ্ডা বাবু।

জবাব শুনে অনার্স নেওয়া ছেলেটার হাত দুটো ধরে তার বন্ধু বল্লে—

আরে এর মধ্যে বলাবলির কি আছে—এতো খুব সিম্পল ডিভিসন. সমস্ত 'ওয়াণ্ডারফুল' কি করে জানলি বল্‌না ভাই ?

ভেড়ার পা গুলো গুণে নিয়ে তাকে চার দিয়ে ভাগ করলুম।

গুরু মহাশয়—নীরু ! দিদি বানান কর ত ?
নীরু—গুরু মহাশয়, দিদি ত শ্বশুর বাড়ী।

স্ত্রী থার্মোমিটার ভাল ক'রে দেখতে জানতো না তবুও তাকে বাধ্য হ'য়ে তার স্বামীর টেম্পারেচার নিতে হলো। দেখেই স্ত্রী উত্তেজিত হ'য়ে ডাক্তারকে টেলিফোন করলে 'ডাক্তারবাবু এক্ষুনি আসুন, আমার স্বামীর টেম্পারেচার ১৩৬°।' ডাক্তার জবাব দিলে 'আমার কিছু করবার নেই, দমকলের অফিসে টেলিফোন করুন।'

স্বামী—যে দিনকাল পড়েছে, যাতে সস্তায় সংসার চলে সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

স্ত্রী—সেই জন্যেই তো আমি সব জিনিষ ধারে কিনছি।

দার্শনিক বক্তা—দানে অসীম পুণ্য, আপনি যা দান ক'রবেন তা দ্বিগুণ হয়ে আপনার কাছে ফিরে আসবে, নিশ্চয় জানবেন।

শ্রোতা—ঠিক ব'লেছেন, গেল আষাঢ় মাসে আমি মেয়েকে দান ক'রেছিলুম, এখন সে আর তার স্বামী দু'জনেই আমার বাড়ীতে স্থায়ী হ'য়েছে।

মাষ্টার—তোমার রচনা খুব ভালো হয়েছে কিন্তু রাখালের রচনার সঙ্গে তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। এ থেকে আমি কি বুঝবো ?

গোপাল—বুঝবেন যে রাখালেরটাও খুব ভালো হ'য়েছে।

এক—বাজারে গিয়ে জিনিষপত্র কিনতে মেয়েরা যেমন পারে, পুরুষরা তেমন পারে না।

দুই—পারবেই না তো, পুরুষদের সব সময়ে মনে থাকে যে তারা নিজেদের পয়সা খরচ ক'রছে।

দুজন ছোকরা নগ্ন হ'য়ে দীঘিতে স্নান ক'রছিল। একজন মহিলা, তা

দেখে তাদের প্রশ্ন করলেন, এই দীঘিতে মগ্ন হ'য়ে স্নান করার বিরুদ্ধে আইন আছে ; নয় কি? একজন ছোকরা বল্‌লে, হ্যাঁ—কিন্তু আমার বাবা এখানকার পুলিশের দারোগা—আপনি ওবিষয়ে কোনো ভয় না রেখে জলে নাম্‌তে পারেন।

বাক্যের মালিক আর ভাতের মালিক।

১৩৪৫ সাল ২৫শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে বাড়ী নাই, ঘর নাই, খাবার নাই। ঐ সব অঞ্চলের লোকজন যারা "পেটে খিদে মুখে লাজ" এই দোটানায় পড়ে এখনও ইজ্জতের ভয় করছে, ১০ টাকার জিনিষ ২ টাকায় বাঁধা দিয়ে কিম্বা বিক্রী ক'রে ছেলে-পিলের মুখে এক মুষ্ট দিচ্ছে। যারা এই দুর্দিনে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এই তিনই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তারা অন্যের দ্বারস্থ হ'য়ে যাচ্ঞাকেই একমাত্র দিনপাতের পন্থারূপে গ্রহণ করেছে। যে যাকে মুরুব্বি ব'লে জানে তার কাছে গিয়ে দুঃখ দৈন্যের কথা জানিয়ে কি করবে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করছে। মুরুব্বি মশায়রা আবার দুরকমের। এক দল নিজের ক্ষমতা গোপন না রেখে "আমি কি করতে পারি" এই সরল সাফ জবাব দিচ্ছে ; আর একদল নিজেদের কিম্মত ও হিম্মত প্রকাশ্যে না জান্‌তে দিয়ে কেউ লাট সাহেবকে জানিয়েছি, কেউ মন্ত্রীকে জানিয়েছি, কেউ ম্যাজিস্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করেছি বলে নিজেদের সর্ব শক্তিমত্তার একটুও খাটো না হ'তে দিয়ে ফাঁকা স্তোক বাক্যে এই সব অৰ্দ্ধ-মৃত সর্বহারাদের নেতৃত্বের দাবি এখন ত্যাগ করতে রাজি না হ'য়ে কথার জোচ্চোরি ও দোকানদারী দ্বারা টাল বাহানা করে কেবল দিনের পর দিন মানুষকে আশার ফাঁকা আশা দিয়ে মুরুব্বিয়ানার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে।

বিপন্নের দলের দাবি এদের কাছে এইটুকু—যখন যা বলেছেন তাই তারা করেছে, যাকে ভোট দিতে বলেছে তাকেই দিয়েছে। আবার যখন যা বল্‌বে তাই করবে, যাকে ভোট দিতে বল্‌বে তাকেই দিবে।

হায়রে! এই যে কথার সওদাগরেরা মানুষকে কথার ফাঁকা চটকে ভুলিয়ে রাখে তারা ভেল্কীওয়ালা চেয়েও সেয়ানা। এদের মূল মন্ত্রই হচ্ছে—

নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি না,
বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না।

একটা গল্প আছে—এক সময়ে এক ধনীর বাড়ীতে এক বাইজীর নাচ হচ্ছিল। বাইজী একটী দুটি ক'রে ১৪টি গান গাইলে। গানগুলি বড়-লোকটীর খুব ভাল লাগায়, প্রত্যেক গানের শেষে ১০০০্ হাজার রুপেয়া বকশিস্ হুকুম করেন। পরদিন প্রাতে বাইজী যখন হুজুরের কাছে ১৪০০০্ চৌদ্দ হাজার টাকার দাবি জানালো, তখন হুজুর ও বাইজীতে নীচের লিখিত কথোপকথন হ'য়েছিল।

হুজুর—ক্যা বাইজী ক্যা বাস্তে?

বাইজী—চৌদেঠো গাওনাকে বাস্তে চৌদে হাজার বখশিস্ কে লিয়ে আয়ী থী।

হু—গাওনা কৌন্ চিজ বাইজী?

বা—মন কা বাৎ—সুর সে তাল সে বোলনা।

হু—হাম, তোমারা মন কা বাৎ সে খুসী হুয়ে থে'। যব এক এক গাওনাকা বাস্তে হাজার হাজার রূপেয়া বক্‌শিস্‌ শুনায়া তব তুমহারী দিল খুস নাই হুয়া?

বা—বেসক্‌।

হু—তোম্‌ হামকো বাৎসে খুসি কিয়া—হাম তোমকো বাৎসে খুসি কিয়া—লেনা দেনা ক্যা হায়।

হে দুঃখী নিরন্নের দল! তোমরা এটা জেনে রেখো যে তোমাদের ভোটও যেমন মুখের কথা ওদের স্তোক বাক্যও তেমনি মুখের কথা। তোমরাও বাক্যের দ্বারা ওদের খুসী করেছ, ওরাও বাক্যের দ্বারা তোমাদের ভুলিয়ে রাখছে। ওরা বাতের কর্তা ভাতের কর্তা নয়।

রঙ্গ-কণা।

১৩৪৬ সাল ২৬শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা

স্বামী—"দেখ এবার যে চাকরটাকে রাখা হয়েছে সেটা তত সুবিধার নয়; আমার সিল্কের জামাটাকে সে চুরি করেছে। ও রকম অসৎ লোকটাকে রাখা ঠিক নয়।"

স্ত্রী—"ঠিকই ত! তোমার কোন্‌ জামাটা সে চুরি করেছে।"

স্বামী—"সেই যে গো—সেই জামাটা,—যেটা সেদিন আমি দোকান থেকে চুরি করে এনেছিলুম।"

* * *

শলীপদ—তুমি যে দিন দিন কুপোর মত মোটা হচ্ছ—বন্ধু!

স্থূলকায়—কিন্তু তোমার ভিৎ পত্তন যা দেখছি—সেই মত ইমারত উঠলে তোমার কাছে আমি কোথায় তলিয়ে যাব!

ভোটাভিনন্দন।

১৩৩৮ সাল ১৮শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

হে স্বায়ত্তশাসনের বাহন, হে ভোট, হে অঘটন ঘটন পটিয়ান্‌ তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

জমিদারকে তুমি দীনের দুয়ারে লইয়া যাও; শক্তিমানকে দুর্বলের করতলগত করাও, সুব্রাহ্মণকে শূদ্রযবনের আস্তাকুঁড়ে বসাও। হে ভোট তুমি অনন্তশক্তিধর তোমাকে নমস্কার।

বন্ধুতে বন্ধুতে তুমি বিচ্ছেদ ঘটাও; বলহীনের পীড়নে তুমি উদ্যোক্তা হও; চিরমনোবিবাদের খনি তুমি রচনা কর। হে নারদের মানসপুত্র তোমাকে নমস্কার।